ভারত-কাহিনী।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত

প্রণীত।

---

৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট্ বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কলিকাতা

২১০/১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীভুবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৮৩।

ভারত-হিতৈষী শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ
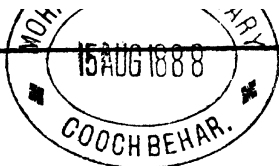
শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহোদয়ের

স্মরণীয় নামে

ভারত-কাহিনী

উৎসর্গীকৃত হইল।

বিজ্ঞাপন।

ভারত-কাহিনী প্রচারিত হইল। বঙ্গদর্শন, বান্ধব, কল্পদ্রুম প্রভৃতি সাময়িক পত্রে সময় বিশেষে ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহার অধিকাংশ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মৎপ্রণীত ঐতিহাসিক পাঠ হইতেও কয়েকটী প্রবন্ধ উপযুক্ত বোধে গ্রহণ করা গিয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধই স্থানবিশেষে আবশ্যকমত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

১৮৭৮ অব্দে লর্ড লীটন কর্ত্তৃক মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে যখন তুমুল গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, তখন ভারত সভার অনুরোধে আমি ভারতে মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থার সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করি। উপস্থিত গ্রন্থের "ভারতে মুদ্রণ-স্বাধীনতা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের অধিকাংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কৃতজ্ঞতাসহকারে স্বীকার করিতেছি, ভারতসভা এবিষয়ে সম্মতি দিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন।

যাঁহারা ভারতবর্ষকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসেন, ভারতের ইতিহাস-ঘটিত কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন, ভারত-কাহিনী যদি তাঁহাদের আমোদ বর্দ্ধনে সমর্থ হয়, তাহাহইলেই চরিতার্থ হইব।

কলিকাতা,
১২ই শ্রাবণ, ১২৯০।

শ্রীরজনী কান্ত গুপ্ত।

সূচী।

ভারত-কাহিনী।

ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন।

ভারতবর্ষ এক সময়ে কোন বিষয়েই নির্ধন ছিল না। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি অনেক বিষয়েই ভারতের জ্ঞান, ভারতের গাম্ভীর্য্য, এক দিন পৃথিবীব্যাপ্ত হইয়া ভারতের মহিমা শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। যে দিন আর্য্য মহাপুরুষগণ মধ্যএশিয়ার বিস্তৃত ক্ষেত্র হইতে গোধন সঙ্গে হিন্দুকুশ পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক পঞ্চনদে প্রথম পদার্পণ করেন, সেই দিন হইতেই ভারতের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়, সেই দিন হইতেই ভারত-ভূমি বিদ্যা ও সভ্যতার জননী হইয়া উঠে। "যে উজ্জয়িনী-জনিতা কবিতাবল্লীর মধুময় কুসুম বিকশিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত পৃথিবী আমোদিত করিতেছে, সেই দিনেই তাহার বীজ ভারতভূমিতে রোপিত হয়; যে প্রভাববতী চিকিৎসা বিদ্যা আজ পর্য্যন্ত রোগার্ত্ত জনগণের প্রতীকার বিধান করিয়া আসিতেছে, সেই দিনেই তাহা ভারতে স্থান পরিগ্রহ করে, যে প্রচণ্ড তেজ হলদিঘাট প্রভৃতি রণক্ষেত্রে পরিস্ফুট হইয়া ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে, এবং অধিক দিন অতীত হয় নাই, যাহার একটি স্ফুলিঙ্গ চিলিয়ান্‌ওয়ালায় অতুল-পরাক্রম শিখ-জাতির হৃদয় হইতে বাহির হইয়া দুর্ব্বারপরাক্রম ব্রিটীস তেজকেও বিধ্বস্ত করিয়াছে," যাহার নিমিত্ত পবিত্র ইতিহাসে আদরের ধন হলদিঘাট ও চিলিয়ান্‌ওয়ালা গ্রীসের থর্ম্মাপলী ও মারাথন্ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছে, সেই দিনেই তাহা ভারতে অনুপ্রবেশিত হয়। আর্য্যগণ এই পবিত্র দিনে, পবিত্র

সময়ে ভারতে পদার্পণ করিয়া অলৌকিক বুদ্ধিবলে, অলৌকিক পাণ্ডিত্য-বলে সভ্যতা প্রসারিত করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত ভারত সুসভ্য হয়, এবং তাঁহাদের নিমিত্ত ভারতীয় মহিমা ইতিহাসের পূজনীয় হইয়া উঠে।

এক্ষণে ভারতের সে মহত্ত্ব বিগত হইয়াছে, সে জ্ঞান, সে ধর্ম্ম, সে নীতি, সে সদাচার, সে সভ্যতা, সে উদারতা অনন্ত সময়ের সহিত বিলীন হইয়াছে। যে পঞ্চনদবাহিনী সিন্ধুসরস্বতীর তীরে বসিয়া আর্য্য মহর্ষিগণ জলদগম্ভীর মধুর স্বরে বেদ গান করিতেন, সে সিন্ধু সরস্বতী আজও পঞ্চনদ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, যে হিমাদ্রির নির্জ্জন গহ্বরে সমাসীন হইয়া যোগ-রত আর্য্য তাপসগণ অনন্ত-শক্তির ধ্যানে নিবিষ্ট থাকিতেন, সে গিরিশ্রেষ্ঠ—গিরিগহ্বর আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে হলদিঘাটে প্রচণ্ড আর্য্যতেজ, আর্য্য-সাহস বিকশিত হইয়া শত্রুর মর্ম্মভেদ করিয়াছিল, সে হলদিঘাট আজও ভারত-মানচিত্রে শোভা পাইতেছে, যে পশ্চিম শৈলের শিখরে দাঁড়াইয়া অদীনপরাক্রম শিবজী বিজয়-ভেরীর গভীর রবে নিদ্রিত ভারতকে জাগাইয়াছিলেন, সে পশ্চিম শৈল আজও বিস্তৃত রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের সে জ্ঞান সে ধর্ম্ম নাই, সে জীবনী-শক্তি নাই, সে একতা সে আত্মত্যাগ নাই। প্রাচীন ভারতে সভ্যতার স্রষ্টা আর্য্য মহর্ষিগণের বিলাস-ভূমি গিরিকন্দর অবিকৃত রহিয়াছে, পুণ্যসলিলা সিন্ধুসরস্বতী যথাগতি প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু অদ্য ভারত শ্মশান। ভারতের সে গৌরব-সূর্য্য এক্ষণে অনন্ত জলধিতলে ডুবিয়াছে। সে সাহস, সে বীর্য্যবত্তা, সে রণোন্মাদ, সে একতা, সে আত্মত্যাগ এক্ষণে কেবল আভিধানিক শব্দে পরিণত হইয়াছে। অদ্যতন ভারত এইরূপ দুরবস্থায় পতিত। অদ্যতন ভারতের সন্তানগণ এইরূপ নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ও নিস্পৃহ! যে ভারত এক সময়ে জগতের শিক্ষা-ভূমি ছিল, সেই ভারত এখন একটী সামান্য বিষয়ের জন্য অন্যের দ্বারে লালায়িত! এইরূপ এক সময়ে ভিক্ষা-দাতা অন্য সময়ে

ভিক্ষাপ্রার্থী, এক সময়ে লোকারণ্যের হৃদয়োদ্দীপক কোলাহল-পূর্ণ, অন্য সময়ে বিকট শ্মশানের বিকট মূর্ত্তির প্রতিরূপ ভারতের সমুদয় অবস্থা আনুপূর্ব্বিক জানিবার উপায় নাই। ভারতের একখানি প্রকৃত ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত লোক-সমাজে প্রচারিত হইয়া অতীত জ্ঞানের অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ আলোকিত করে নাই। ভারতের ইতিহাসের অভাব দেখিয়া এখন অনেকে ভারতীয় ব্যক্তিদিগকে কুহকিনী কল্পনার কুপোষ্য বলিয়া ধিক্কার দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, ভারতের কেহ ইতিহাস লিখিতে জানিত না। ভারতে ইতিহাসের ন্যায় প্রকৃত ঘটনাপূর্ণ কোন বিষয় কোন সময়ে বিরচিত হয় নাই, সকলেই কেবল কল্পনার পরিচর্য্যায় নিয়োজিত থাকিয়া স্বীয় গ্রন্থ অদ্ভুত ঘটনায় পরিপূর্ণ করিত। যাঁহারা এক সময়ে সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিতে জগতের পূজনীয় ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাই অনৈতিহাসিক বলিয়া সাধারণ্যে অপদস্থ হইতেছেন।

সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে কেবল রাজতরঙ্গিণী নামে কাশ্মীর দেশের একখানি ইতিহাস আছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কহ্লন পণ্ডিত এই ইতিহাস আরম্ভ করেন। পরে অপরাপর লেখক কর্ত্তৃক ইহা পরিসমাপ্ত হয়। এই কাশ্মীরের ইতিহাস—রাজতরঙ্গিণীই সংস্কৃত সাহিত্য-ভাণ্ডারের অদ্বিতীয় ইতিহাস। তবে কি ভারতবর্ষে ইতিহাস-স্থানীয় আর কিছু লিখিত হয় নাই? আর্য্য ঐতিহাসিকের কর্ত্তব্য-জ্ঞান কি কেবল এক কাশ্মীর দেশে বিকাশ পাইয়া কাশ্মীরেই বিলীন হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা উচিত, কবিতার ন্যায় প্রকৃত ঘটনাপূর্ণ ইতিহাসের বিষয় লিখিবার পদ্ধতি প্রাচীন ভারতেও প্রচলিত ছিল। এই লিখিত বিষয়গুলি কালক্রমে বিপ্লবপরম্পরায় অথবা কীট ও ঋতুবিশেষের আক্রমণে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই মতের সমর্থন জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে;—আকবরের সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী আবুল ফজল প্রাচীন

ভারতের একখানি ইতিহাস রচনা করেন। এ সম্বন্ধে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, আবুয়ল ফজল কোথাহইতে স্বপ্রণীত ইতিহাসের বিষয় সংগ্রহ করিলেন? ইহা কি তাঁহার মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা? না ইতিহাসস্থানীয় পূর্ব্ববর্ত্তী বিষয়-সমূহের সংগ্রহ? যদি আবুয়লফজলের ইতিহাস প্রকৃত ইতিহাস হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আবুয়ল ফজল পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু ঐতিহাসিকদিগের নিকট হইতে স্বীয় ইতিহাসের বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ভারতে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি প্রচারিত না থাকিলে আবুয়ল ফজেলের ইতিহাস প্রণীত হইত না।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে একজন সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করেন। পরিব্রাজকের নাম হিউয়েন্থ সাঙ্, ধর্ম্ম বৌদ্ধ। পবিত্র বৌদ্ধ তীর্থদর্শন, পবিত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের সংগ্রহ এবং পবিত্র সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন প্রভৃতিই তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত ভারতবর্ষে প্রায় পনর বৎসর অতিবাহিত করেন। এই বৌদ্ধ পরিব্রাজক স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া ভবিষ্য বংশীয়দিগের অতীত জ্ঞানের পথ অনেকাংশে পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ফরাসী ভাষায় অনুবাদিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এই বিখ্যাত ভ্রমণকারীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে আমরা ভারতীয় ইতিহাসের নিদর্শন দেখিতে পাই। হিউয়েন্থ সাঙ্ লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কেবল দৈনন্দিন ঘটনা লিখিবার ভার সমর্পিত ছিল। এই দৈনিক বিবরণ নীলপীঠ নামে প্রসিদ্ধ। ঘটনাবলীর বিবরণ ইতিহাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং নীলপীঠ যে ইতিহাসের সম্মানিত পদে অধিরূঢ় হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। হিউয়েন্থ সাঙের বর্ণিত নীলপীঠের বিবরণে আমরা স্পষ্ট জানিতে পারি, ভারতে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, এবং ভারতীয় আর্য্যগণ কাব্য, দর্শন প্রভৃতির ন্যায় ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় এবং সর্ব্বশেষ প্রমাণ, চাঁদ কবির "পৃথ্বীরায় রাঁসো।" যিনি দুর্দ্দান্ত যবনের হস্ত হইতে জন্মভূমির রক্ষার জন্য প্রসন্নসলিলা দৃশদ্বতীর তটে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি অবিচলিত অধ্যবসায়, অবিচলিত উদারতা ও অবিচলিত দেশহিতৈষিতার জন্য সহৃদয় সমাজে হৃদয়গত শ্রদ্ধা, ও হৃদয়গত প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইতেছেন, যাঁহার নিমিত্ত পবিত্র ইতিহাসের আদরের ধন তিরৌরী অতুলপরাক্রম হিন্দুজাতির প্রধান সমর-ভূমি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছে, চাঁদ কবি সেই হিন্দুকুল-গৌরব, হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তী পৃথ্বীরায়ের বিবরণ লইয়া "পৃথ্বীরায় রাঁসো" প্রণয়ন করিয়াছেন। চাঁদ কবির মধ্যে পরিগণিত, এবং তৎপ্রণীত গ্রন্থও কাব্য বলিয়া পরিচিত। কিন্তু চাঁদ কবির গ্রন্থকেও একরূপ ইতিহাস বলা যাইতে পারে। ব্যক্তিবিশেষের কার্য্য যাহাতে ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত থাকে, তাহাকে তদানীন্তন সময়ের প্রধান প্রধান ইতিহাসের অংশ বলা গিয়া থাকে। সুতরাং চাঁদ কবির "পৃথ্বীরায় রাঁসো" কাব্য হইলেও যে, অসম্পূর্ণ ইতিহাস, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই "পৃথ্বীরায় রাঁসো" এবং পূর্ব্বকথিত আবুয়ল ফজলের ইতিহাস ও নীলপীঠের বর্ণনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রাচীন ভারতে ইতিহাস লেখার নিয়ম ছিল।

এই ইতিহাস স্থানীয় বিষয়গুলির লিখিবার ভার রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর উপর ছিল এবং উহা রাজ্যশাসন-সম্বন্ধীয় কাগজ পত্রের মধ্যে থাকিত। সময়ের পরিবর্ত্তনে এক রাজ্যের পর অপর রাজ্য সংগঠিত হইয়াছে, এক আক্রমণের পর অন্য আক্রমণে সমুদয় বিষয় পর্য্যুদস্ত হইয়া গিয়াছে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ রাজবিপ্লবে ও বিদেশী জাতির পুনঃ পুনঃ আক্রমণে রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজ পত্রের সহিত উক্ত লিখিত ঘটনাবলীও বিনষ্ট হইয়াছে।

যদি কেহ এই যুক্তিতে অনাস্থা দেখান, তাহা হইলেও তাদৃশ ক্ষোভ নাই। কারণ যে ইউরোপ এক্ষণে আপনাকে সভ্যতাভিমানী ও পাণ্ডিত্যাভিমানী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচয় দিতেছে, কয়েক শতাব্দী

পূর্ব্বে সেই ইউরোপে ইতিহাসের অবস্থা কিরূপ ছিল? যাহা প্রকৃত ইতিহাসপদে বাচ্য, তাহা কেবল গত শতাব্দী হইতে ইউরোপে পরিজ্ঞাত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বিপ্লবের সংঘাতে ইউরোপীয়দিগের মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই উৎকর্ষ হইতেই ইউরোপে প্রকৃত ইতিহাসের উৎপত্তি। যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর সভ্যতাস্পর্দ্ধী ইউরোপে ইতিহাস বাল্যলীলাতরঙ্গে দোলায়িত, তখন বহু প্রাচীন আর্য্যগণের তদ্বিষয়ক অনভিজ্ঞতা বড় অপমানের কথা নহে।

আর্য্যপূর্ব্ব-পুরুষগণ ঐতিহাসিক বলিয়া পরিচিত হউন বা না হউন, এক্ষণে তদ্বিষয়ের অনুশীলন অপেক্ষা আমাদিগের স্বদেশীয় ইতিহাসের অনুশীলনই অধিকতর আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যদি কেহ স্বদেশের ব্যথায় নির্জ্জন প্রদেশে নীরবে বসিয়া এক বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া থাকেন, যদি কেহ অত্যাচার-পীড়িত জন্মভূমির সুখ শান্তি বাড়াইতে যত্নপর হন, যদি কেহ মহাজন-মুখ বিনিঃসৃত "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী" বাক্যের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া স্বদেশের হিতের তরে স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে সকলের আগে তাঁহার স্বদেশের ইতিহাস অধ্যয়ন করা উচিত। স্বদেশের ইতিহাস না পড়িলে তিনি স্বদেশের বেদনার প্রকৃত কারণ অনুভব করিতে পারিবেন না। বেদনার প্রকৃত কারণ না বুঝিলে ঔষধ প্রয়োগ ব্যর্থ হইবে। স্বদেশের অতীত বিষয়ক জ্ঞান ও তাহার সহিত বর্ত্তমান বিষয়ক জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধানই শোকসন্তাপ দূর করিবার উপায়। এই উপায়ের অনুসরণ করিতে হইলে স্বদেশীয় ইতিহাসের অনুশীলন অবশ্য কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ, স্বদেশের ইতিহাস অধ্যয়নের অন্যরূপ সার্থকতা লক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির উপর স্বদেশের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে স্বদেশের হিতকর ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইলে ব্রিটীস রাজনীতির সহিত

পরিচিত হওয়া বিধেয়। মনোযোগের সহিত স্বদেশের ইতিহাস না পড়িলে ব্রিটীস রাজনীতির কৌশল অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই।

স্বদেশের ইতিহাস পড়া উচিত বটে, কিন্তু যে ইতিহাস বৈদেশিক লোকের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে, তাহার অনুশীলন বিধেয় নহে। ইঙ্গ্‌রেজ চিত্রকরের হস্তে ভারতের ঐতিহাসিক চিত্র কোথাও অরঞ্জিত, কোথাও বা অতিরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। অরঞ্জিত বা অতিরঞ্জিত চিত্র দ্বারা যেরূপ আলেখ্যের প্রকৃতভাব হৃদয়ঙ্গম হয় না, সেইরূপ অতি-বর্ণিত বা অবর্ণিত ইতিহাস পড়িলে ঐতিহাসিক জ্ঞান পরিস্ফুট হয় না। ইঙ্গ্‌রেজ ঐতিহাসিকের হস্তে ভারতের ইতিহাসের যে যে ঘটনা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, এই স্থলে তাহার কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে।

মরে, স্নুয়েল প্রভৃতি ইঙ্গ্‌রেজ লেখকগণ সিরাজউদ্দৌলাকে অন্ধকূপ হত্যার প্রধান অধিনায়ক বলেন। সিরাজউদ্দৌলা শত অপরাধে অপ-রাধী হউন, জন-সমাজে প্রজাপীড়ক, প্রজাঘাতক বলিয়া ধিক্কৃত হউন, ঐতিহাসিকের কঠোর লেখনীর আঘাতে তাঁহার চরিত্রপট ক্ষত বিক্ষত হউক, কিন্তু সিরাজ অন্ধকূপ হত্যার পাপে পাপী নহেন। ন্যায়ের পক্ষপাত-বর্জ্জিত বিচার এই আরোপিত অপরাধ হইতে তাঁহাকে বিমুক্ত করিবে।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জুন ইঙ্গ্‌রেজ-হস্ত হইতে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের পতন হয়। দুর্গ অধিকৃত হইলে হলওয়েল প্রভৃতি ১৪৬ জন ইঙ্গ্‌রেজ বন্দী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া সিরাজউদ্দৌলার সমক্ষে আনীত হন। সিরাজ, হলওয়েল্ প্রভৃতিকে শৃঙ্খল-বিমুক্ত করিয়া দৃঢ়তা সহকারে বলেন যে, কেহ তাঁহাদিগের কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না। রাত্রিতে নবাব বিশ্রাম-ভবনে গমন করিলে, তাঁহার এক জন সেনাপতি এই ইঙ্গ্‌রেজ বন্দিদিগকে প্রায় ১৮ ফীট্ বর্গ পরিমিত একটি ক্ষুদ্রায়তন গৃহে অবরুদ্ধ করিয়া রাখেন। যাঁহারা অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস পড়িয়া-ছেন, তাঁহারা এই কারারুদ্ধ ব্রিটীস বন্দিদিগের দুরবস্থা অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। প্রচণ্ড নিদাঘের রাত্রিতে অল্পপরিসর

নির্ব্বাত গৃহে ১৪৬ জন মনুষ্যের একত্র অবস্থা কি ভয়ঙ্কর! কি লোমহর্ষণ!!

কাল রাত্রি প্রভাত হইল। অরুণসহচরী উষা ধীরে ধীরে জগৎ উদ্ভাসিত করিল। নবাব সেনাপতি কারা গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। তখন কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! স্তূপীভূত ১২৩ জন মৃত দেহের মধ্য হইতে ২৩ জন বিবর্ণ, বিশীর্ণ, কঙ্কালাবশিষ্ট জীবিত শরীর বাহিরে আসিল। নবাব এই সাংঘাতিক ব্যাপার কিছুই জানিতেন না। তিনি সেনাপতিদিগের হস্তে দুর্গ-রক্ষার ভার দিয়া বিশ্রামভবনে বিশ্রাম করিতে ছিলেন, সুতরাং দোষভার বন্দিরক্ষক সেনাপতির স্কন্ধেই অর্পিত হইতেছে। এরূপ স্থলে সিরাজউদ্দৌলাকে দোষী করা সঙ্গত নহে। তবে সিরাজ অপরাধীর প্রতি দণ্ড বিধান করেন নাই। এ অংশে অবশ্য তাঁহার ক্রটী লক্ষিত হইতেছে। সিরাজউদ্দৌলা সর্ব্বদা তোষামোদ-প্রিয় কুপোষ্য সম্প্রদায়ে পরিবেষ্টিত থাকিতেন। অমিতাচার ও অতিবিলাসে এবং এইরূপ চাটুকারগণের সংসর্গে থাকাতে তাঁহার হৃদয় সমবেদনা-শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। বোধ হয় এই সমবেদনার অভাব বশতঃ তিনি বন্দিঘাতক অপরাধীকে দণ্ড দেন নাই।

এস্থলে ইঙ্গ্লণ্ডের অধিপতি তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বকালে গ্লেনকোর হত্যার সহিত অন্ধকূপ হত্যার তুলনা করা অসঙ্গত নহে। সিরাজের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই হত্যাকাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়। যে ইঙ্গ্লণ্ড সভ্যতাভিমান ও পাণ্ডিত্যাভিমানে স্ফীত হইয়া প্রাচ্য বিষয়ের সমালোচনা করিয়া থাকেন, সেই ইঙ্গ্লণ্ডের অধিপতিই যখন এইরূপ ভয়ঙ্কর নরহত্যার পাপে পাপী, তখন সিরাজ যদিও অন্ধকূপ হত্যার অপরাধে অপরাধী হন, তাহা হইলেও তাঁহাকে তৃতীয় উইলিয়ম অপেক্ষা অধিকতর নৃশংস বলা সঙ্গত নহে।

দ্বিতীয় ঘটনা; দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ ও পঞ্জাব অধিকার। ইঙ্গ্রেজ লেখকগণের অনেকে দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই।

অনেকে কেবল মুলতানের শাসন-কর্ত্তা মূলরাজের অভ্যুত্থানকেই উহার প্রধান হেতু বলিয়া নীরব হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ নির্দ্দেশ করিতে এই কয়েকটি ধরিতে হয়, ১ম, মহারাজ রণজিৎ সিংহের বিধবা মহিষী মহারাণী ঝিন্দনের নির্ব্বাসন; ২য়, দলীপ সিংহের বিবাহের দিন ঠিক করিতে ব্রিটীস রেসিডেণ্টের অসম্মতি; এবং ৩য়, হাজরার শাসন-কর্ত্তা সর্দ্দার ছত্রসিংহের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার। এই তিনটী কারণ হইতেই দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের উৎপত্তি। এই শিখ-যুদ্ধের পর ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পঞ্জাব অধিকার করেন। দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ প্রবলপরাক্রম শিখ জাতির অন্যায় আচরণের ফল এবং পঞ্জাব অধিকার ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পবিত্র ইতিহাসের সম্মান নষ্ট করা অনুচিত।

তৃতীয় ঘটনা অযোধ্যা অধিকার। অন্ধকূপ হত্যা ও দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের ন্যায় ইহাও অধিকাংশ ইঙ্গরেজ লেখকের পক্ষপাতিনী লেখনীর আঘাতে বিকৃত হইয়া ভারত ইতিহাসে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে। এই লেখকদিগের মতে অযোধ্যায় বড় অত্যাচার ও অবিচার হইত। লর্ড ডালহৌসী এজন্য নবাব ওয়াজিদ আলীকে পদচ্যুত করিয়া অযোধ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিশপ হিবর, হারমান্ মেরিবেল প্রভৃতি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, অযোধ্যায় এরূপ কোন দৌরাত্ম্য হয় নাই, যে জন্য উক্ত রাজ্য গ্রহণ করা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে। বরং কোম্পানীর রাজ্য অপেক্ষা অযোধ্যা সুশাসিত ছিল।

সকল ইঙ্গরেজ লেখকই যে ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনা এইরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়াছেন, তাহা নহে। অনেকানেক লেখক পক্ষপাতশূন্য হইয়া এ বিষয়ে ন্যায়ানুমোদিত পক্ষ অবলম্বন করিতে ত্রুটী করেন নাই। ভারতবর্ষ এই মহাপুরুষদিগের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে।

যাহাহউক; সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ ও প্রমাদরহিত স্বদেশের ইতিহাস পাঠ করা স্বদেশীয় ব্যক্তি মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বদেশের ইতিহাস

পাঠ করিলে মনে স্বদেশের প্রতি গভীর হিতৈষণার উৎপত্তি হয়, এবং গভীর সহৃদয়তার আবির্ভাব হইয়া থাকে। বাল্মীকি, ব্যাসের ন্যায় কবি, পাণিনি, পতঞ্জলির ন্যায় বৈয়াকরণ এবং গৌতম, শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ধর্ম্ম-প্রচারকের নাম মনে হইলে কোন্ সহৃদয় ভারতবসীর হৃদয় স্বদেশ-প্রেমে পরিপূর্ণ না হয়? কে না এই মহাপুরুষদিগের ইতিহাস পাঠে সমুদ্যত হন? প্রাচীন আর্য্যগণ এক সময়ে জগতের পূজনীয় ছিলেন। তাঁহারা কোমল বিষয়ের কোমল সৌন্দর্য্যের সম্ভোগেই ব্যাসক্ত থাকিতেন না, তাঁহারা কেবল ভ্রমরচুম্বিত প্রভাতকমলের অঙ্গবিলাস দেখিয়া অথবা কাব্য নাটকের অনুশীলন করিয়াই কালাতিপাত করিতেন না। তাঁহারা গভীর বিষয়ের গভীর চিন্তায় সর্ব্বদা সংযত থাকিতেন, তাঁহাদিগের হৃদয় সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, অভ্রভেদী গিরিবরের ন্যায় সদা উন্নত থাকিত। তাঁহারা সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে অদ্বিতীয়, সমর-কৌশলে অদ্বিতীয় এবং ধর্ম্মনীতিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। এক সময়ে ভারতবর্ষ এইরূপ মহাতেজস্বী, মহাসত্ত্ব আর্য্যপুরুষগণের আবাস-ভূমি ছিল, এক সময়ে এইরূপ আর্য্যতেজ, আর্য্যসাহস, আর্য্য জ্ঞানের মহিমায় ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

হিন্দু আর্য্যগণ দশগুণোত্তর সংখ্যার সৃষ্টিকর্ত্তা। হিন্দু আর্য্যগণ ক্ষেত্রতত্ত্ব, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিতের উৎকর্ষ-কারক। হিন্দু আর্য্যগণ প্রভাববতী চিকিৎসা বিদ্যার প্রধান অনুশীলনকারী। আরব ও গ্রীস দেশীয়গণ হিন্দু আর্য্যদিগের নিকট হইতেই গণিতাদি শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে। যে গ্রীস হইতে ইউরোপের এত শ্রীবৃদ্ধি, সেই গ্রীসই প্রাচীন ভারতের মন্ত্র-শিষ্য।

হিন্দু আর্য্যগণ গণিতাদি শাস্ত্রের ন্যায় যুদ্ধ-বিদ্যাতেও পারদর্শী। এক সময়ে হিন্দুদিগের সমর-কৌশলে সমস্ত পৃথিবী চমকিত হইয়াছিল। সাহিত্য, দর্শন, যুদ্ধ-বিদ্যা প্রভৃতিতে আর্য্য হিন্দুগণ যেরূপ শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্ম-নীতিতে সেইরূপ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শাক্য-সিংহের ধর্ম্মভাব আজ পর্য্যন্ত

সমস্ত পৃথিবীর বরণীয় হইয়া রহিয়াছে। রাজ্যেশ্বরের স্নেহাস্পদ পুত্র ও আজন্ম সৌভাগ্য-সম্পত্তির ক্রোড়ে লালিত হইয়াও শাক্য সিংহ কেবল ধর্ম্মের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রকার উদাসীনতা, সর্ব্বপ্রকার বিষয়-নিবৃত্তি তাঁহার জীবনের অবলম্বন ছিল। তিনি "নলিনীদলগত" জলের ন্যায় জীবনের ক্ষণস্থায়িতা, বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর চঞ্চলতা, এবং চক্রনেমির ন্যায় অদৃষ্টের পরিবর্ত্তনশীলতা জানিয়া, সংসার ছাড়িয়া নির্জ্জন গিরিকন্দরে বা নির্জ্জন অরণ্যে নীরবে বসিয়া অন্তিমে অনন্তপদ প্রাপ্তির আশায় অনন্তশক্তির ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন। এইরূপ ধর্ম্মভাব জগতে অতুল্য ও অমূল্য। শাক্যসিংহের প্রচারিত ধর্ম্ম এক্ষণে মধ্য এশিয়া অতিক্রম করিয়া চীনে প্রসারিত হইয়াছে, হিমগিরির শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছে। সংক্ষেপে কামস্কট্কার তুষার-ক্ষেত্র হইতে সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত ছাইয়া পড়িয়াছে। এই ধর্ম্মপ্রচারক শাক্যসিংহ ভারতের স্নেহাস্পদ সন্তান।

প্রাচীন আর্য্যদিগের গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহাতেও আর্য্যগণের ধর্ম্মভাব দেদীপ্যমান দেখিবে। রামায়ণ ও মহাভারতের রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির ধর্ম্মভাবের জন্য আজ পর্য্যন্ত সকলের হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও ভক্তির পূজা পাইয়া আসিতেছেন। অধিক কি, আর্য্য হিন্দুগণের ধর্ম্মনীতি বিদেশীয়দিগকেও বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এরিয়ান্ এবং বিখ্যাত পরিব্রাজক হিউয়েন্থ্ সাঙ্ উভয়েই মুক্তকণ্ঠে হিন্দুদিগকে সত্যবাদী, উদার-স্বভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতভূমি এইরূপ বিদ্যা, তেজস্বিতা ও ধর্ম্মনীতির বিলাসক্ষেত্র ছিল।

আইস ভ্রাতৃগণ! আমরা একবার সেই মনস্বী আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণের চরণে প্রণাম করি; আইস একবার সেই পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মনীতির আলোচনা করিয়া উদারতা, সরলতা সংগ্রহে যত্নশীল হই; যত দিন পবিত্র আর্য্য-শোণিতের শেষবিন্দু আমাদিগের

ধমনীতে প্রবাহিত থাকিবে, আইস, ততদিন আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় জীবনের শান্তিময় উৎকৃষ্ট পথে অগ্রসর হইতে থাকি *।

প্রাচীন আর্য্য জাতি।

যাঁহারা এক্ষণে হিন্দু, গ্রীক, রোমক, ইতালীয়, পারসিক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন, তাঁহারা সকলেই এক মূল্য জাতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। এই মূল্য জাতি "আর্য্য" নামে পরিচিত। সাধারণতঃ মান্য ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আর্য্য বলা যায়। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কৃষক। কোন কোন পণ্ডিতের মতে "ঋ" ধাতু হইতে "আর্য্য" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই ঋ ধাতুর অর্থ চাস করা। অর্য্যদিগের আদিম অবস্থা যখন কিছু উন্নত হয়, যখন তাঁহারা কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন, তখন বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে "আর্য্য" সংজ্ঞার উৎপত্তি হইয়াছে।

এই মূল্য আর্য্য জাতি প্রথমে এশিয়া খণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। চঙ্গেজ্ খাঁ, তিমুর লঙ্গ প্রভৃতি দিগ্‌বিজয়-মত্ত ভূপতিগণ যে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া, এক সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে ঘোরতর আতঙ্ক বিস্তার ও নর-শোণিত স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, আদিম আর্য্যগণ প্রথমে সেই স্থানেরই একাংশে বাস করিতেন। গ্রীক, রোমক ও পারসিকেরা পূর্ব্ব দিকে আপনাদের দেবভূমি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আবার হিন্দুগণ যখন পঞ্জাবে আসিয়া বাস করেন, তখন তাঁহারা উত্তর দিকে আপনাদের স্বর্গ নির্দ্দেশ করিতেন। এক্ষণে এই সকল জাতির পবিত্র স্থানের অবস্থান-সন্নিবেশ আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, মধ্য এশিয়ার ভূখণ্ড ইহাঁদের আদি নিবাস-স্থান। মানচিত্র

---

* কলিকাতার যুবজন সম্মিলনী সভায় শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিত।

সমূহে এই ভূখণ্ড স্বাধীন তাতার নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সমুন্নত মালভূমিতে পরিব্যাপ্ত। আমুদরীয়া এবং মুরঘাব নদী ইহার অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহার উত্তরে কিজলকম্ প্রভৃতি বালুকাময় মরুভূমি, পূর্ব্বে কৈলাস পর্ব্বত, দক্ষিণে হিন্দুকুশ এবং পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর। বর্ত্তমান সময়ে বল্‌খ, সমরকন্দ, মিসেদ এবং হিরাত ইহার প্রধান নগর। প্রাচীন সময়ে শিথিয়া (শক জাতির আবাস ভূমি), পার্‌থিয়া প্রভৃতি কতিপয় স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। যাঁহাদের সন্তানগণ এক্ষণে পৃথিবীতে সুসভ্য জাতি বলিয়া সম্মানিত হইতেছেন, এই প্রদেশের একাংশ তাঁহাদের আবাস-ভূমি ছিল।

বর্ণিত ভূখণ্ড আয়তনে অনেক বড়, এই আয়ত প্রদেশের কোন্ অংশে আদিম আর্য্যগণ বাস করিতেন, সূক্ষ্মরূপে তাহার নির্দ্দেশ করা একরূপ দুঃসাধ্য। যাহা হউক, পণ্ডিতগণের গবেষণায় এক্ষণে এক প্রকার স্থির হইয়াছে যে, হিরাত হইতে বল্‌খ পর্য্যন্ত রেখার দক্ষিণে এবং বেলুরতাগ ও মুসতাগ পর্ব্বতের পশ্চিমে প্রাচীন আর্য্যগণ বাস করিতেন।

ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিবার বহু পূর্ব্বে এই আদিম আর্যগণ আপনাদের প্রথম অবস্থায় তাদৃশ সভ্য ছিলেন না। তাঁহারা মৃগয়ালব্ধ বন্য পশুর মাংসে উদর পূর্ত্তি করিতেন এবং সময়ে সময়ে দলবদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে করিতে পশুহননে বহির্গত হইতেন। তাঁহারা সোমরস-প্রিয় ছিলেন। এই মদিরা সেবনে তাঁহাদের মৃগয়া-প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিত। গৃহ নির্ম্মাণে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ছিল না। বন্য জন্তুর সমাগম নাই, বা কণ্টকময় ঝোপ নাই, এমন পরিষ্কৃত ক্ষেত্রে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। অগণ্য-তারকা-শোভিত বিশাল আকাশ বা বিস্তৃত ভূখণ্ড তাঁহাদের মানসিক ভাব বিস্তৃত করিত না, লাবণ্যময় পূর্ণচন্দ্র বা অরুণ-রঞ্জিত উষা তাঁহাদের হৃদয়ে কোমলতার সঞ্চারে সমর্থ হইত না, এবং সমুন্নত পর্ব্বত বা বেগবতী তরঙ্গিণী তাঁহাদিগকে জ্ঞানের উচ্চতর মন্দিরে

তুলিয়া দিতে পারিত না। তাঁহাদের চারিদিকে প্রকৃতির এই সকল ভীষণ ও কমনীয় কান্তি বিরাজ করিত, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের কবিত্ব-শক্তির উন্মেষ হইত না। কে তাঁহাদের সম্মুখে এই সকল দৃশ্য প্রসারিত রাখিয়াছেন, কাহার করুণাবলে তাঁহারা জীবিত থাকিয়া প্রকৃতির এই সৌন্দর্য্যের রাজ্যে বাস করিতেছেন, তাহা তাঁহারা একবারও ভাবিতেন না। বন্য জন্তুর উপদ্রব নিবারণ ও জীবন-ধারণার্থ পশুহননই তাঁহাদের চিন্তার বিষয় ছিল। তাঁহারা বন্যভাবে আপনাদের অধ্যুষিত ভূখণ্ডের বনে বনে বেড়াইতেন, এবং উচ্চতর জ্ঞান ও ধর্ম্মে বঞ্চিত থাকিয়া এই বন্য ভাবেই আপনাদের জীবিত কাল অতিবাহিত করিতেন।

ক্রমে তাঁহাদের এই বন্য-ভাব তিরোহিত হইল। ক্রমে তাঁহারা আরণ্য পশুদিগকে বশ করিতে শিখিলেন, ক্রমে এই বশীভূত পশু-দিগের প্রতিপালনে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মিল। এই সময় হইতে তাঁহাদের অবস্থা ধীরে ধীরে এক এক গ্রাম উপরে উঠিতে লাগিল। ভূমি কর্ষণে গবাদি জন্তু বিশেষ আবশ্যক হওয়াতে তাঁহারা যথা-নিয়মে এই সকল জীবের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহাদের মমতা ও সমবেদনা জন্মিল। পূর্ব্বতন আরণ্য প্রকৃতি তিরোহিত হইল, এবং কোমলতা, মৃদুতা ও সৌম্যভাব তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত করিতে লাগিল। তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক আপ-নাদের গবাদি পশু পালন করিতে লাগিলেন। গৃহপালিত গাভীর নিরীহ ও শান্তভাব দর্শনে তাঁহাদের প্রকৃতি অধিকতর নিরীহ ও শান্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা এখন একের অধিক দার পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন, সাধারণের প্রতি সৌহার্দ্দ দেখাইতে আরম্ভ করিলেন এবং পরিবার-বদ্ধ হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা শান্ত-ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইলেন। গবাদি জীবের চারণ-ভূমি তাঁহাদের রাজ্য, গৃহ-পালিত পশু তাঁহাদের সম্পত্তি, এই সকল পশুর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহা-দের কার্য্য, ইহাদের সন্তুষ্টি সাধন তাঁহাদের আমোদ এবং ইহাদের

দুগ্ধ তাঁহাদের প্রধান পানীয় হইয়া উঠিল। ক্রমে গবাদি জীবের জন্য অধিক চারণ-ভূমির প্রয়োজন হওয়াতে তাঁহারা যত্ন সহকারে বর্ষা প্রভৃতির আবির্ভাব ও তিরোভাবের আলোচনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রাকৃতিক কার্য্যের প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ হইল। তাঁহারা ধীর ভাবে আকাশ ও পৃথিবী উভয়েরই বিভিন্ন পরিবর্ত্তন দেখিতে লাগিলেন, এবং চন্দ্র সূর্য্যের গতি দ্বারা আপনাদের সময় নিরূপণ করিতে অভ্যাস করিলেন। এই পশুপালক সম্প্রদায়ের মধ্যে যিনি অধিক ক্ষমতাপন্ন ও বুদ্ধিমান, তিনি আপন আপন দলের অধিনায়ক হইলেন। সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ে অধিনায়কের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ও প্রাধান্য অপ্রতিহত হইয়া উঠিল।

ক্রমে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইল। আর্য্যগণ বলদ প্রভৃতির সাহায্যে হল-চালনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে গাভীগণ প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ দিতে লাগিল। কৃষিজীবিগণ এই দুগ্ধ ও গোধূমচূর্ণ দিয়া উৎকৃষ্টতর খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কৃষি-ক্ষেত্র ইঁহাদের স্থায়ী সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইল। এই আদিম সময়ে লোক সংখ্যা অধিক ছিল না, সুতরাং ক্ষেত্র হইতে যাহা লাভ হইত, তদ্দ্বারা আর্য্যগণের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। কৃষি-ক্ষেত্রের কাজ যখন শেষ হইয়া যাইত, উৎপন্ন শস্য-সম্পত্তিতে যখন আবাস-গৃহ পরিপূর্ণ হইত, তখন আর্য্যগণ আপনাদের প্রয়োজন মত সামান্য সামান্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। এইরূপে কৃষিজীবী আর্য্য সম্প্রদায় গবাদি পশু ও আপনাদের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া সংসার-ধর্ম্ম রক্ষায় প্রবৃত্ত হন।

আত্ম প্রাধান্য রক্ষার জন্য আর্য্যগণ ক্রমে সাহসী ও রণ-পটু হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপনের রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। প্রত্যেক ক্ষুদ্র রাজ্যে এক এক জন রাজার অধীনে সৈন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। রাজারা আপনাদের শাসনাধীন জনপদের উৎকর্ষের জন্য আইন প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের

রণ-দক্ষতা প্রকাশের জন্য চারণগণ নিযুক্ত হইল। ইহারা যুদ্ধ-বিষয়িণী গীতিকা মধুর স্বরে গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। যুবকেরা এই গানে উত্তেজিত হইয়া আত্ম-প্রাধান্য দেখাইতে অগ্রসর হইল। যাহারা অপেক্ষাকৃত সাহসী ও বলবান্ ছিল, তাহারা শত্রু-পক্ষের উপর আপনাদের বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সংগঠিত হইল। প্রতি ক্ষুদ্ররাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন দলের লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহারা রাজাকে যথানিয়মে কর দিত। সামান্যরূপ বাণিজ্যও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন তাঁহারা সভ্যতার এই শেষোক্ত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন।

উপরে যে চারি অবস্থা বর্ণিত হইল, তাহাতে আদিম আর্য্যদিগের জাতি-বিভাগের বিষয় জানা যাইবে। সভ্যতার উৎকর্ষের সহিত আর্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইয়া উঠেন। পাঁচ হাজার বৎসরের অধিক হইল, আর্য্যগণ হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরদিগ্বর্ত্তী প্রদেশে বাস করিতেন। এই সময়ে তাঁহাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও ধর্ম্ম-প্রণালী যে অসংস্কৃত অবস্থায় ছিল, তাহা সহজে বোধ হইবে। তাঁহারা প্রধানতঃ তিন জাতি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। এক সম্প্রদায় মৃগয়া দ্বারা, অপর সম্প্রদায় পশুপালন দ্বারা এবং তৃতীয় সম্প্রদায় কৃষি কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। মৃগয়াজীবী আর্য্যেরা রূঢ় ও উদ্ধতপ্রকৃতি, পশুপালকেরা অলস ও অধ্যবসায়-রহিত এবং কৃষিজীবীরা পরিশ্রমী ও নিয়মিতরূপে কার্য্যকারী ছিলেন। প্রথম দুই সম্প্রদায়ের আর্য্যেরা আপনাদের ব্যবসায়ের অনুরোধে এক স্থানে বাস করিতেন না। যেখানে মৃগয়ার উপযোগী জীব জন্তু পাওয়া যাইত, মৃগয়াজীবীরা তথায় যাইয়া বাস করিতেন। মৃগ্য জীবের অভাব হইলে আর সেখানে থাকিতেন না, স্থানান্তরে চলিয়া যাইতেন। এইরূপে পশুপালকেরা, যেখানে ভাল তৃণ-ক্ষেত্র পাওয়া যাইত, সেইখানে অবস্থান করিতেন। অধ্যুষিত স্থানে তৃণাদির অভাব

হইলে আবার ভাল চারণ-ভূমি পাইবার আশায় নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বাসস্থানের স্থিরতা না থাকাতে মৃগয়াজীবী ও পশুপালকেরা কোন স্থানেই স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন না। তাম্বুর ন্যায় গৃহ-বিশেষই তাঁহাদের অবস্থার উপযোগী ছিল। কিন্তু কৃষিজীবীরা এরূপ নানা জনপদ-বিহারী ছিলেন না। তাঁহাদিগকে এক স্থানে থাকিয়া কৃষি-ক্ষেত্রের কার্য্য করিতে হইত। এজন্য তাঁহারা দৃঢ় ও স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিতেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম ও নীতি-জ্ঞানও অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। তাঁহারা পরিবার-বদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। কৃষি-ক্ষেত্রের কার্য্য শেষ হইলে সরল ও পবিত্র গোষ্ঠী-কথায় তাঁহাদের সময়াতিপাত হইত। এই কৃষিজীবী আর্য্যগণ হইতে প্রথমে দেশের অভ্যন্তরীণ উন্নতির সূত্রপাত হয়।

এই প্রাচীন আর্য্যদের মধ্যে বিবাহের রীতি ছিল। বহুবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। একের অধিক দার পরিগৃহীত হইত। সকলে পরিবার-বদ্ধ হইয়া বাস করিতেন। উত্তরাধিকারের নিয়ম ও সম্পত্তি রক্ষার বন্দোবস্ত ছিল। দণ্ডবিধি অনুসারে চৌর্য্য প্রভৃতি পাপ-কার্য্য নিবারণ করা হইত। সকলেই শান্ত ও সংযতচিত্ত হইয়া প্রচলিত বিধি সকল মানিত। পিতা পরিবার পালন করিতেন, মাতা আহারীয় দ্রব্য প্রভৃতির পরিমাণ ও ব্যবস্থা করিতেন এবং দুহিতা দুগ্ধ দোহন করিতেন। এইরূপে পরিবার রক্ষার ভার পিতার (কর্ত্তার) প্রতি, সাংসারিক কার্য্যের ভার মাতার (কর্ত্রীর) প্রতি, এবং আবশ্যক দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার দুহিতা প্রভৃতির প্রতি সমর্পিত ছিল। পরিবারের মধ্যে যিনি সকল বিষয়ের কর্ত্তা, তিনি ভক্তিভাবে আরাধ্য দেবতার নিকট আপনাদের কুশল প্রার্থনা করিতেন।

এই সময়ে শিল্পকার্য্যের তাদৃশ উন্নতি না হইলেও আর্য্যেরা আপনাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিতেন। তাঁহারা পশু-বিশেষের চর্ম্ম বা লোম দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কর্ম্মের উপযোগী সমুদয় দ্রব্য ও অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবহার ছিল।

স্বর্ণ, স্বর্ণময় আভরণ, তাম্র ও লৌহ তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাঁহারা অবস্থা-বিশেষে এই সকল ধাতুর ব্যবহার করিতেন। সম্প্রদায়ের পার্থক্য থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে বস্ত্রের পার্থক্য ছিল না। তাঁহারা শীত-প্রধান দেশ বাসী ছিলেন, এজন্য তিন সম্প্রদায়ই শীত নিবারণের উপযোগী চর্ম্ম বা লোম নির্ম্মিত কাপড় ব্যবহার করিতেন।

আর্য্যদিগের খাদ্য সামগ্রী এক রকম ছিল না। তিন সম্প্রদায়ই আপনাদের অবস্থা ও ব্যবসায়ের ভিন্নতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য আহার করিতেন। মাংস মৃগয়াজীবিদের খাদ্য ছিল। কিন্তু পশু-পালক ও কৃষিজীবীরা কেবল মাংসের উপর নির্ভর করিতেন না। ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য এবং গবাদি জীবের দুগ্ধ ও তাঁহাদের জীবন রক্ষার অবলম্ব ছিল। মৃগয়াজীবী ও পশুপালকেরা সুরাপায়ী ছিলেন। সোম মদিরা ইহাঁদের বড় প্রিয় ছিল। এতদ্ভিন্ন ইঁহারা গম, যব হইতে এক্ষণকার পচাইয়ের মত এক প্রকার সুরা প্রস্তুত করিতেন। কৃষিজীবীরা এরূপ সুরাসেবী ছিলেন না। ইঁহারা অল্প পরিমাণে সোম-রস পান করিতেন। বস্তুতঃ কৃষিজীবিগণ অতিশয় মিতাচারী ছিলেন। আহার পানে ইঁহারা মত্ত হইতেন না। এজন্য ইঁহাদের প্রকৃতি অতিশয় নিরীহ ছিল। সকল দেশের সকল স্থানেই কৃষকদিগের এই নিরীহ ভাব দেখা যায়।

আর্য্যগণ প্রথম অবস্থায় ছন্দোবদ্ধ রচনার বড় পক্ষপাতী ছিলেন। ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান সময়ে এই সকল ছন্দোময়ী কবিতার আবৃত্তি হইত। কবিতার স্বর ও ছন্দের পবিত্রতা সাধনে আর্য্যেরা বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। অপরিশুদ্ধ ছন্দে কোন কবিতা প্রণীত হইলে বা অপরিশুদ্ধ স্বরে কোন কবিতা পাঠ করিলে তাঁহারা আপনাদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও প্রনষ্ট-সর্ব্বস্ব বিবেচনা করিতেন। ঋগ্বেদে আদিম আর্য্য-দিগের এই সকল ছন্দোময়ী রচনা দেখা যায়। এগুলি তাঁহাদের তদানীন্তন পরিশুদ্ধ রুচি ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠার প্রধান পরিচয়। এই সকল

রচনা লিখিত হইত না। আদিম আর্য্যেরা লিখিতে জানিতেন না। এগুলি বংশ-পরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিত।

আর্য্যদিগের ধর্ম্ম-প্রণালী তাঁহাদের সভ্যতার ইতিহাসের প্রধান বিষয়। মানুষ যখন সাতিশয় অসভ্য অবস্থায় থাকে, তখন দেবতার সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণা থাকে না। সে যখন এই অবস্থা হইতে কিছু উন্নত হয়, তখন দেবতাকে আপনার শত্রু, সুতরাং ভয়ের বিষয় বলিয়া মনে করে। কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে সে প্রথমে আপনার এই ভয়-জনক শত্রুকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হয়। নিকোবর দ্বীপের অসভ্যেরা আপনাদের দেবতাকে সর্ব্বদা ভয় দেখাইতে চেষ্টা পায়। প্রার্থনা পূর্ণ না হইলে আফ্রিকার নিগ্রোরা আপনাদের দেবতাকে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়া থাকে। ইহার পর মানুষের গৌরব ও সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দেবতারাও গৌরব-পূর্ণ ও সুসভ্য হইতে থাকেন। কিন্তু ইহাঁদের ক্ষমতা প্রসারিত হয় না। উহা এক একটী বিষয়ে আবদ্ধ থাকে। এক জন সমুদ্রের অধিপতি হন, একজন ভূমির উপর কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করেন, একজন মেঘের নিয়ামক হন, অন্য জন পর্ব্বতের কর্ত্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করেন। অধিকতর ক্ষমতাশালী দেবতারা প্রায়ই নির্দ্দয় ও হিংসা-পর হইয়া থাকেন। ইহাঁদিগকে শোণিত মাংস দিয়া পরিতর্পণ করিতে হয়। আদিম আর্য্যদিগের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মতেরও এইরূপ পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। আধুনিক অসভ্যদিগের ন্যায় ইহাঁদেরও প্রথমে দেবতার সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না। পরে ইহাঁরা আপনাদের অনিষ্টকারী হিংসাপর দেবতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। শেষে ইহাঁদের মধ্যে বহুসংখ্য দেবতার সৃষ্টি হয়। এক একটী দেবতা অনন্ত-বিস্তৃত প্রকৃতি-রাজ্যের এক একটী বিষয়ের অধিপতি হইয়া উঠেন। এইরূপে ইন্দ্র, মরুৎ, দ্যৌস্ (স্বর্গ), পৃথ্বী, ঊষা, অগ্নি, পর্জ্জন্য, বায়ু, অদিতি প্রভৃতি দেবতার কল্পনা হয়। এই সকল দেবতার সৃষ্টি এক দিনে বা এক সময়ে হয় নাই। প্রাচীন আর্য্যদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন

দেবতার সৃষ্টি ও পূর্ব্বতন দেবতার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে ইন্দ্র পৌরাণিক ধর্ম্ম-জগতে দেবরাজ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছেন। মৃগয়াজীবী আর্য্যদিগের মধ্যে সেই ইন্দ্র একটী কাল্পনিক বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই বৃত্তি পশু-হনন-সময়ে মৃগয়াজীবিদিগকে বল, উৎসাহ ও তেজ দিত। সোমরস-পানে ইহা প্রদীপ্ত হইত। ইহা মৃগয়াজীবিদিগকে উন্মত্ত-প্রায় করিয়া তাহাদিগকে বিজন গিরি-গহ্বরে বা অগম্য বনান্তরে লুক্কায়িত শ্বাপদদিগের নিধনে নিয়োজিত রাখিত। এই গিরিগহ্বর ও নিবিড় অরণ্য সমূহকে বৃত্র বলা যাইত। এক দিকে ইন্দ্র মৃগয়াজীবী আর্য্যদিগকে পশু-হননে প্রবর্ত্তিত করিত, অপর দিকে বৃত্র এই পশুদিগকে আপনার আশ্রয়ে লুকাইয়া রাখিত। সুতরাং ইন্দ্রের সহিত বৃত্রের চিরন্তন শত্রুতা ছিল। চিরদিন উভয়েই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইত। ইহার পর আর্য্য-সম্প্রদায় যখন সভ্যতার দ্বিতীয় সোপানে পদার্পণ করেন, যখন তাঁহারা পশু-পালনে ও পশুদিগের চারণ-ভূমির উৎকর্ষ বিধানে মনোযোগী হন, তখন তাঁহাদের ইন্দ্র ও বৃত্রেরও অবস্থান্তর প্রাপ্তি হয়। আর্য্যেরা দেখিলেন, বৃষ্টিপাতে ক্ষেত্র সমুদয় নব-দূর্ব্বাদলে শোভিত হইয়া উঠে, তরুলতা সকল পল্লবিত হইয়া নয়নের অনির্ব্বচনীয় প্রীতি সম্পাদন করে। এই সময়ে তাহাদের কোন ভাবনা থাকে না,তাহাদের অদ্বিতীয় সম্পত্তি—গৃহপালিত গবাদি পশু ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নব তৃণ ভোজনে পরিতৃপ্ত হইতে থাকে; পর্য্যাপ্ত আহার পানে ইহারা বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম হয়, এবং যথাসময়ে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধ দিয়া আপনাদের প্রতি-পালকদিগকে সন্তৃপ্ত করিতে থাকে। বৃষ্টির এইরূপ উপকারিতা দেখিয়া আর্য্যেরা ইন্দ্রকে বজ্রধারী ও বৃষ্টির কর্ত্তা বলিয়া কল্পনা করি-লেন। তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মিল, ইন্দ্র সদয় হইলে বৃষ্টি দ্বারা জনপদ জল-সিক্ত হয় এবং তৎপ্রযুক্ত চারণ-ভূমি নানাপ্রকার তৃণগুল্মে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সভ্যতার আদিম অবস্থায় এরূপ বিশ্বাস অসম্ভব নহে। সিন্ধুদেশের নিম্ন শ্রেণীর কৃষক-সম্প্রদায়ের আজ পর্য্যন্ত বিশ্বাস আছে

যে, তাহাদের সিন্ধু নদের ন্যায় আকাশে বড় বড় নদী সকল রহিয়াছে। এই সকল নদীর তট-দেশ যখন প্লাবিত হয়, তখনই বৃষ্টি হইয়া থাকে। এই বৃষ্টিতে তাহাদের কৃষি-ক্ষেত্র সকল শস্যশালী হয়। আদিম আর্য্যেরা এইরূপ সংস্কারের বহির্ভূত ছিলেন না। এইরূপ সংস্কার প্রযুক্তই বৃষ্টির কর্ত্তা ইন্দ্রের কল্পনা হয়। কিন্তু ইন্দ্র আপনার এই অবস্থাতেও প্রতিদ্বন্দ্বি-শূন্য ছিলেন না। যথাসময়ে বৃষ্টি না হইলে ক্ষেত্র সকল বিশুষ্ক হইয়া যাইত, নবীন তৃণদলের অভাবে গবাদি পশু বিশীর্ণ হইয়া পড়িত, পশুপালক আর্য্যেরা আপনাদের পশুযূথের দুর্দ্দশা দেখিয়া ম্রিয়মাণ ও কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া উঠিতেন। অনাবৃষ্টি হইলে তাঁহাদের দুর্গতির অবধি থাকিত না। আকাশে নবীন মেঘের উদয় হইলে তাঁহারা উৎফুল্ল নেত্রে বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকিতেন, কিন্তু এই আশাপ্রদ মেঘ যদি উড়িয়া যাইত, গগনমণ্ডল যদি আবার পরিষ্কার হইত, তাহা হইলে তাঁহারা বিষণ্ণ হইয়া ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী অনাবৃষ্টিকারী বৃত্রের ক্ষমতায় বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। এইরূপে নিবিড় অরণ্য ও গিরি-গহ্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বৃত্র ক্রমে অনাবৃষ্টির কর্ত্তা হইয়া উঠে। পূর্ব্বে যে বৃত্র শ্বাপদ-কুলকে লুক্কায়িত রাখিয়া ইন্দ্রের ব্যাঘাত জন্মাইত, এক্ষণে সেই বৃত্র অনন্ত নভোমণ্ডলে অবস্থান করিয়া বৃষ্টির কর্ত্তা ইন্দ্রের ব্যাঘাত জন্মাইতে প্রবৃত্ত হয়। আর্য্যেরা আপনাদের গৃহপালিত জীব-সমূহের মঙ্গল কামনায় সংযতচিত্তে ভক্তিরসার্দ্র হৃদয়ে ইন্দ্রের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করিতেন; বৃষ্টি না হইলে বৃত্রের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য আবার সেই ইন্দ্রেরই শরণাপন্ন হইতেন। আর্য্যদিগের ইতিহাসে সভ্যতার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদিগের উৎকর্ষের এই সূত্রপাত।

দ্যৌঃ, পৃথ্বী, উষা, অদিতি, অগ্নি প্রভৃতি এক একটী পৃথক্ দেবতা। আর্য্যেরা দ্যৌঃকে পিতা এবং পৃথ্বীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে দৌষ্পিতৃ (অর্থাৎ পিতা দ্যৌঃ) শব্দের উল্লেখ আছে। এই দ্যৌঃ বৃষ্টিধারী ইন্দ্রের জনক।

উষা-সমাগমে আর্য্যগণ শয্যা হইতে উঠিয়া আপনাদের রক্ষণীয় পশু-দিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেন। এই সময়ে তাঁহাদিগকে দৈনন্দিন কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে হইত। তাঁহারা শুচি হইয়া এই সময়ে হল স্কন্ধে করিয়া,স্নেহপালিত গোধন সঙ্গে কৃষি-ক্ষেত্রে যাইতেন। সুতরাং উষা কৃষিজীবী আর্য্যদিগের দৈনন্দিন কার্য্যের নিয়ন্ত্রী ছিল। আর্য্যেরা আপনাদের কার্য্যের কুশল কামনায় ভক্তিভাবে এই উষার আরাধনা করিতেন। উষার ন্যায় অদিতির দেবীভাবও প্রাচীন আর্য্য-দিগের কল্পনা-সম্ভূত। আর্য্যদিগের আদিম অবস্থায় বন্য পশুদিগের আশ্রয়স্থল গিরি-সঙ্কট গিরি-গহ্বর প্রভৃতি বিভক্ত ও উচ্চ নীচ স্থান "দিতি" নামে অভিহিত হইত। দিতিশূন্য স্থান অর্থাৎ তৃণ-সমাচ্ছাদিত প্রশস্ত সমভূমি-খণ্ডের নাম "অদিতি" ছিল। দিতি যেমন ভয় ও আতঙ্কের উদ্দীপক ছিল, অদিতি তেমন ছিল না। আর্য্যেরা অদিতির ভক্ত ছিলেন, যেহেতু ইহা তাহাদিগকে বন্য পশুর উপদ্রব হইতে রক্ষা করিত, এবং তাহাদের পরম স্নেহের ধন গবাদিজীবের আশ্রয়-ভূমি ছিল। প্রশস্ত শ্যামল ক্ষেত্রের এক দেশ দিয়া পার্ব্বত্য সরিৎ বহিয়া যাইতেছে, অদূরে গৃহ-পালিত পশুপাল নবীন তৃণ ভোজনে পরিতৃপ্ত হইতেছে, স্থানে স্থানে শস্যাদির ভাণ্ডার রহিয়াছে, তরঙ্গিণীর তীরবর্ত্তী সুচ্ছায় তরু-তলে বসিয়া কৃষিজীবী আর্য্য-সম্প্রদায় যখন এই সকল দেখিতেন, তখন তাঁহাদের কবিত্ব-শক্তি সহজেই বলবতী হইত, নবীন অবস্থায় নবীন কল্পনায় মত্ত হইয়া তাঁহারা তখন সমস্বরে অদিতীর স্তুতি-গীতি গাইতেন। অদিতি এইরূপে কৃষিজীবী আর্য্যদিগের মধ্যে আশ্রয়-দাত্রী মাতা ও পশু সমূহের চারণ-ভূমি বলিয়া পরিচিত ছিল। শেষে দেব-জননী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। অদিতির ন্যায় অগ্নির উপরেও আর্য্যদিগের অটল ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। এই আদিম অবস্থায় সকলের ঘরেই গার্হপত্য অগ্নি স্থাপিত থাকিত। পরিবারের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি প্রাতঃকালে সংযতচিত্ত হইয়া, ফল মূল প্রভৃতি উপহার দিয়া, এই অগ্নির উপাসনা করিতেন।

প্রাচীন আর্য্য জাতির এই ধর্ম্ম-প্রণালীর বিবরণে প্রতিপন্ন হইবে যে, তখন পৌত্তলিকতা ছিল না। কেহ কোনরূপ দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা করিতেন না। কোনরূপ দেবমন্দির বা বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইত না। কেহ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাহারও পুরোহিত ছিলেন না। ভিন্ন ভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায় সংগঠিত হইত না। প্রকৃতি-রাজ্যে যাহা সুন্দর, যাহা মহৎ, যাহা দেখিলে হৃদয়ে গভীর উদাত্ত ভাবের আবির্ভাব হয়, আর্য্যগণ একান্ত মনে তাহারই উপাসনা করিতেন। সে সময়ে আর্য্য জাতির বুদ্ধিবৃত্তি তাদৃশ মার্জ্জিত হয় নাই, আর্য্যগণ সে সময়ে এই সুকৌশল-সম্পন্ন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন নাই, এই অবস্থায় তাঁহারা যাহার উপকারিতা বা মহত্ব দেখিতেন, তাহারাই দেবত্ব স্বীকার করিয়া তগদ্গতচিত্তে তদীয় উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন। প্রতি পরিচ্ছন্ন ভূখণ্ডই পবিত্র দেব-মন্দির স্বরূপ ছিল, প্রতি গৃহস্বামীই শান্তি-পরায়ণ পুরোহিত হইয়া সাধারণের কুশল প্রার্থনা করিতেন, প্রতি পরিবারই উপাসনা-সময়ে আপনাদের বরণীয় দেবতার মহীয়সী শক্তির ধ্যানে নিবিষ্ট হইত। উপাসনার প্রণালী সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বর-শূন্য ছিল। কোন রূপ পার্থিব বিকার দ্বারা ইহা কলুষিত করা হইত না। সরলভাবে সরল হৃদয়ে সকলেই এই সরল আরাধনা-কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

কিন্তু তিন সম্প্রদায় একভাবে আপনাদের বরণীয় দেবতার স্বরূপ চিন্তা করিতেন না। মৃগজীবিদের দেবতা পশু হননে সাহায্যকারী ছিলেন, পশু পালকদিগের দেবতা পশুযূথের মঙ্গল বিধান করিতেন, এবং কৃষি-জীবিদিগের দেবতা কৃষিক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধনে ও কৃষি-বস্তুর রক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতেন। পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রার্থনার এইরূপ পার্থক্য থাকিলেও সকলেই একভাবে আপনাদের দেবতার মহত্ব স্বীকার করিতেন। সকলের দেবতাই পরিপূর্ণ, মঙ্গলময় ও হিংসা-লোভাদি-শূন্য ছিলেন। এই মঙ্গলময় দেবতা হইতে কোন অমঙ্গল হইবে বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখি-

লেন, এরূপ মঙ্গল-বিধাতা দেবগণ থাকাতেও অনাবৃষ্টি, রোগ, মহামারী প্রভৃতি নানা প্রকার অমঙ্গলের আবির্ভাব হয়, তখন তাঁহারা এই সকল অমঙ্গলের কর্ত্তা কতক গুলি দুষ্ট যোনির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, এই সকল দুষ্ট যোনি সর্ব্বদা মঙ্গলময় দেবগণের সহিত যুদ্ধ করে এবং সময়ে সময়ে তাঁহাদের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিয়া নানা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

এই আদিম আর্য্য-সম্প্রদায় কত কাল পর্য্যন্ত আপনাদের আদি নিবাস-ভূমিতে একত্র ছিলেন, কোন্ সময় তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন করেন, এক্ষণে তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। তাঁহাদের দল যখন ক্রমে বাড়িয়া উঠে, কৃষিক্ষেত্র সকল যখন ক্রমে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সম্প্রদায় বিশেষের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতের পার্থক্য যখন প্রবল হইতে থাকে, তখন বোধ হয়, তাঁহারা মধ্য এশিয়ার উন্নত ভূখণ্ড পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মৃগয়াজীবী ও পশুপালক আর্য্যগণ এক স্থানে বাস করিতেন না। যে খানে বন্য পশু এবং ভাল চারণ- ভূমি পাওয়া যাইত, তাঁহারা সেইখানে যাইয়া অবস্থিতি করিতেন। সম্ভবতঃ এই মৃগয়াজীবীগণ প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্বদিকে তুরেণীয় নামক অসভ্য জাতি বিশেষ প্রবল ছিল। তাহাদের আবাস ভূমিতে তাহারাই একাধিপত্য করিত। সুতরাং আর্য্যগণ পূর্ব্বদিকে যাইতে পারিলেন না। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক তাঁহাদের নির্গমন-দ্বার হইল। তাঁহারা এই তিন দিকে ক্রমে অগ্রসর হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিলেন। এই উপনিবেশ স্থাপন এক সময়ে সম্পন্ন হয় নাই। এক সময়ে সকল সম্প্রদায় একত্র হইয়া এক দিকে গমন করেন নাই। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দল ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হন। বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া এই উপনিবেশ স্থাপনের কার্য্য চলিয়াছিল। বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া আর্য্যগন বহুদেশে আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন।

আর্য্যগণ প্রথমে কোন্ দিকে অগ্রসর হন, তাহা জানিবার কোন

উপায় নাই। এস্থলে প্রথমে উত্তর দিক তাঁহাদের গমনপথ বলিয়া ধরা যাইতেছে। এক্ষণে মধ্য এশিয়ার মাল-ভূমি হইতে উত্তরাভিমুখ হইয়া পশ্চিমে গেলে ইউরোপে উপনীত হওয়া যায়। এই ইউরোপে আমরা "স্লাবনীয়," "লিথুনীয়" ও "টিউটন" এই তিনটী জাতি দেখিতে পাই। এই তিন জাতির লোক প্রাচীন আর্য্যদিগের সন্তান। এক্ষণে এই জাতিত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করিতেছে। তন্মধ্যে বর্ত্তমান রুষীয় ও পোলগণ স্লাবনীয় আর্য্য। প্রুশীয়গণ লিথুনীয় আর্য্যজাতির সন্তান এবং জর্ম্মান, দিনেমার, ওলন্দাজ, ইঙ্‌রেজ প্রভৃতি টিউটন আর্য্য।

ইহার পর পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী পথের অনুসরণ করিলে প্রথমে আমাদিগকে পারস্যে উপনীত হইতে হয়। এই পারস্য দেশ একটী প্রধান আর্য্য-উপনিবেশ ছিল। পারস্য হইতে কয়েকটী বিভিন্ন দল পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া 'কেল্টিক,' 'আর্ম্মাণীয়,' 'হেলেনিক' প্রভৃতি জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কেল্টিকগণ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে যাইয়া, সিরিয়া ও মিশর দেশ দিয়া আফ্রিকার উত্তর উপকূলে উপনীত হয়। সেখান হইতে ইউরোপে উপনিবিষ্ট হইয়াছে। আইরিষ্‌ প্রভৃতি কতিপয় জাতি এই কেল্টিক আর্য্যদিগের সন্তান। এশিয়া হইতে আফ্রিকার উত্তরসীমান্ত ভাগ অতিবাহন-সময়ে আর্য্যগণ পশ্চাতে আপনাদের কোন চিহ্ন রাখিয়া যান নাই। আফ্রিকার উত্তর উপকূলে আর্য্য-উপনিবেশের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। ইহার কারণ সহজেই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পথে সেমিতিক নামক পরাক্রান্ত জাতি তাঁহাদের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহারা কোন স্থানে স্থির হইয়া বাস করিতে পারেন নাই, এজন্য পথে তাঁহাদের উপনিবেশেরও কোন চিহ্ন থাকে নাই।

আর্ম্মাণীয়গণ অধিক দূরে অগ্রসর হয় নাই। এশিয়াটিক তুরুস্কের স্থান-বিশেষেই ইহাদের আবাস-ভূমি হইয়া উঠে। হেলেনিক জাতি

এশিয়া মাইনর হইতে গ্রীসে ও ইতালীতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়। এই জাতি হইতে ইউরোপ খণ্ডে সভ্যতার আলোক বিস্তৃত হইয়াছিল। গ্রীক ও রোমকগণ এই হেলেনিক আর্য্যদিগের সন্তান।

এক্ষণে আমাদিগকে দক্ষিণ দিকের অনুসরণ করিতে হইতেছে। মৃগয়াজীবিগণ বহুদলে বিভক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত দুই দিকে গমন করিলেও আদি আর্য্য-ভূমির জন-সংখ্যা কমিয়া যায় নাই। বরং উত্তরোত্তর ইহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এজন্য পশুপালক ও কৃষিজীবিগণ আপনাদের আবাস-স্থানের সীমা বাড়াইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। ইহাঁদের দক্ষিণ দিকে গমনের আরও একটী কারণ ছিল। যে তুরেণীয় জাতির পরাক্রমে আর্য্যগণ পূর্ব্বদিকে যাইতে পারেন নাই, সেই জাতি ক্রমে এশিয়ার অনেক স্থানে ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে পারস্য হইতে মিসর দেশ পর্য্যন্ত ইহাদের গতি প্রসারিত হয়। এই জাতির উপদ্রবে আর্য্যগণ ক্রমে দক্ষিণ দিকে আসিয়া আফগানিস্তানে উপনিবিষ্ট হন। কতকাল পর্য্যন্ত ইহাঁরা এই স্থানে একত্র ছিলেন, প্রাচীন ইতিহাস তাহা বলিয়া দিতে পারে না। তবে এই মাত্র জানা যায়, ইহাঁদের এক দল সিন্ধুনদ উত্তরণ পূর্ব্বক পঞ্চনদে আসিবার বহুপূর্ব্বে ইহাঁরা আফগানিস্তানের পার্ব্বত্য প্রদেশে একত্র বাস করিতেছিলেন।

পশু-পালক ও কৃষিজীবী আর্য্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদৃশ প্রীতি ও সদ্ভাব ছিল না। বিভিন্ন আচার ব্যবহার উভয় সম্প্রদায়কে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তুলিয়াছিল। পশুপালকেরা পশুমাংস ও উগ্র সুরা-প্রিয় ছিলেন, কৃষিজীবিগণ প্রধানতঃ আপনাদের ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য ও ফল মূলাদি দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন। প্রথম সম্প্রদায় ভাবিতেন, পশু-বলি এবং তেজস্কর সোম-মদিরা দিলে তাঁহাদের দেবগণ সন্তুষ্ট হন, দ্বিতীয় সম্প্রদায় ভাবিতেন, সুস্বাদ ফল মূল ও তীব্র মাদকতা-রহিত সোম-লতার রসে তাঁহাদের দেবগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, এক দল হিংসাশীল ও পরিবর্ত্তন-প্রিয় ছিলেন, অন্য

দল নিরুপদ্রব ও শান্তিময় জীবনের প্রশংসা করিতেন। এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতিতে উভয় দলের আরাধ্য দেবতাও বিভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট হইয়া উঠেন। সাহসী, উদ্ধত, কোপন-স্বভাব ও সমর-পটু দেবতা পশুপালকদিগের অধিকতর যোগ্য হইলেন এবং নম্র, নিরীহস্বভাব ও শান্তিপ্রিয় দেবতা কৃষি-জীবিদিগের প্রকৃতির সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়া উঠিলেন। উভয় সম্প্রদায় আপনাদের দেবতাদিগকে এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতি মনে করাতে উভয়ের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনৈক্য উপস্থিত হইল। "দেবগণ" পশুপালকদিগেব পরিচালক হইলেন, "অসুরগণ" কৃষিজীবিগণের অধিনেতা হইয়া উঠিলেন। এস্থলে ইহা বলা উচিত যে, শব্দবিদ্যার নিয়ম অনুসারে সংস্কৃত ভাষার "স" কারের স্থানে আবস্তিক ভাষায় "হ" কারের আদেশ হয়। সুতরাং সংস্কৃত 'অসুর' ও আবস্তিক 'অহুর' অভিন্ন শব্দ। প্রাচীন বেদ-সংহিতার কোন কোন স্থলে অসুর শব্দের উল্লেখ আছে। ঋগ্‌বেদের ব্যাখ্যাকারক সায়নাচার্য্যের মতে অসুর শব্দের অর্থ প্রাণ দাতা। ইহা "অস্" ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঋগ্বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবগণ অনেকবার 'অসুর' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। আবার এই বেদের অনেক স্থলে ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বীকেও 'অসুর' বলা হইয়াছে। ইন্দ্র 'অসুরঘ্ন' অর্থাৎ অসুর-নিহন্তা নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, অসদ্ভাব জন্মিবার পূর্ব্বে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই 'অসুর' শব্দ দেব-বাচক ছিল। উত্তর কালে হিন্দু আচার্য্যেরা অসুরদিগকে দেবদ্বেষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া আপনাদের দেবতাদিগকে সুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, পশু-পালকগণ ইন্দ্রকে দেবগণের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন, কৃষিজীবিগণ অহুরমজ্দকে অসুরদিগের আধিপত্য দিলেন। পশুপালকেরা আপনাদের দেবতা—দেবগণকে নানাগুণ-ভূষিত ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন, এবং কৃষিজীবিদিগের দেবতা—অহুরদিগকে অবজ্ঞা করিতে আরম্ভ করিলেন, কৃষিজীবীরা আপনাদের

দেবতা অহুরদিগকে ধর্ম্মপর ও উৎকৃষ্ট গুণান্বিত বলিয়া নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেবদিগকে 'দেও' অর্থাৎ দৈত্য বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সম্প্রদায়-বিশেষের এক এক জন কর্ত্তা ছিলেন। কবিগণ বীর-রসের উদ্দীপক কবিতা রচনা করিতে যথেষ্ট সময় পাইতেন। উভয় দলের পুরোহিতগণ আপনাদের দেবতাদিগের অসীম শক্তি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন। সমাজে এই সকল কবি ও পুরোহিতের যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই ইহাঁদিগকে সম্মান করিত এবং সকলেই ইহাঁদের কথায় আস্থা দেখাইত। এক্ষণে এই কবিগণ কবিতা গাইয়া আপনাদের দল উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, পুরোহিতেরাও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তাঁহারা আপনাদের সম্প্রদায়ের সমক্ষে দেবমহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সকলে ইহাঁদের ক্ষমতার নিকট মস্তক অবনত করিল, এবং ইহাঁদের গান ও ইহাঁদের বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া আপন আপন প্রতিদ্বন্দী দেবতা-পূজকদিগের সহিত মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এই মহাসংগ্রামই বোধ হয় পুরাণে দেবাসুরের যুদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

এইরূপে পশুপালক ও কৃষিজীবীদিগের মধ্যে আত্ম-বিগ্রহ উপস্থিত হইল। এই বিগ্রহ কিছুতেই নিবারিত হইল না। উভয় দলে অনেকবার যুদ্ধ হইল। উভয় দল অনেক বার আপনাদের সমর-চাতুরী দেখাইল। উভয় দলের অধিনেতারা অনেকবার রণ-ক্ষেত্রে আপন আপন পারদর্শিতার পরিচয় দিলেন। জয়শ্রী একবার এক দলকে গৌরবান্বিত করিতে লাগিল, আর একবার আর এক দলের পক্ষ-শোভিনী হইয়া উঠিল। পশু-পালক দল অবশেষে আপনাদের অদৃষ্টের নিকট অবনত-মস্তক হইলেন। তাঁহারা আর এই ঘোরতর আত্ম-বিগ্রহে আত্ম-পক্ষের ধ্বংস দেখিতে পারিলেন না। স্থানান্তরে যাইয়া শান্ত ভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা হইল। এই উদ্দেশে তাঁহারা আফগানিস্তানের পার্ব্বত্য ভূমি পরিত্যাগ করিলেন এবং সিন্ধুনদ উত্তরণ পূর্ব্বক পঞ্জাবের শ্যামল ক্ষেত্রে আসিয়া 'হিন্দু'

নামে পরিচিত হইলেন। সংস্কৃতে এই 'হিন্দু' শব্দের উল্লেখ নাই। পশুপালক আর্য্যগণ যাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেশ-ত্যাগী হন, বোধ হয় তাঁহাদের ভাষার নিয়ম অনুসারে এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। পশুপালকগণ প্রথমে সিন্ধু নদের পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে আসিয়া বাস করেন। এই সিন্ধু হইতে 'হিন্দু' নামের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। কৃষি-জীবিগণ 'হপ্তহেন্দুর' বিষয় অবগত ছিলেন। এই 'হপ্তহেন্দু' সংস্কৃত সপ্ত সিন্ধু ব্যতীত আর কিছুই নহে। সিন্ধু ও তাহার পাঁচ শাখা এবং সরস্বতী বা কাবুল বোধ হয়, এই সাত নদী সপ্ত সিন্ধু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সিন্ধু হইতে যে 'হিন্দু'র উৎপত্তি হইয়াছে, এই সপ্তসিন্ধুর বিবরণেও তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

যাহা হউক, এদিকে কৃষিজীবীরাও চিরকাল আপনাদের পূর্ব্ব নিবাস-ভূমিতে থাকিলেন না। তাঁহারা ক্রমে পারস্যে যাইয়া 'পারসিক' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। এইরূপ উভয় দল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলেও দেবতা-বিশেষের আরাধনা হইতে বিযুক্ত হন নাই। অগ্নি উভয় দলের মতেই পরম পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হন। উভয় দলই সমান ভক্তির সহিত সূর্য্যের আরাধনা করিতে থাকেন। কিন্তু দেবতা-দিগের সংজ্ঞা পরিবর্ত্তনে উভয় দলের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার সামাজিক বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ঋগ্‌বেদ এই ভারতবর্ষ-প্রবাসী আর্য্যদিগের এবং অবস্তা পারসিকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ। বৈদিক আর্য্যেরা দেবগণের উদ্দেশে নূতন নূতন স্তোত্র রচনা করিতেন, অবস্তার অনুবর্ত্তিগণ পুরাতন বিষয়েই পরিতৃপ্ত থাকিতেন। বৈদিক আর্য্যেরা দেবগণের নিকট সর্ব্বদা অভি-নব চারণ-ভূমি প্রার্থনা করিতেন, অবস্তার অনুবর্ত্তীরা এক স্থানে থাকিয়া আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কৃষি-ক্ষেত্রের কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন। বৈদিক আর্য্যেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া ভূয়োদর্শিতা সংগ্রহ করিতে যত্নশীল হইতেন, অবস্তার অনুবর্ত্তীরা আপনাদের নির্দ্দিষ্ট বাস-স্থানের সীমার মধ্যে থাকিতে ভাল বাসিতেন। বৈদিক আর্য্যদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ উদ্ভাবনা, মনীষা ও গবেষণায় পরিপূর্ণ, অবস্তার অনুবর্ত্তিগণের ধর্ম্মগ্রন্থ কর্ত্তিপয়

নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের সমষ্টি। সুতরাং বৈদিক আর্য্যেরা সংস্কারক এবং অবস্তার অনুবর্ত্তীরা রক্ষণশীল। এই সংস্কারক বৈদিক আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে সভ্যতা-জ্যোতিঃ প্রসারিত করিয়াছেন। এদিকে রক্ষণশীল আর্য্যগণ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ধর্ম্মোন্মত্ত যবনদিগের পরাক্রমে আপনাদের আবাসভূমি পারস্য হইতে তাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। যে কেল্ট ও টিউটনদিগের আদি পুরুষগণ প্রথমে আপনাদের আদি নিবাস-স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের সন্তানগণও এখন এই দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এইরূপে মৃগয়াজীবী, পশুপালক ও কৃষিজীবী আর্য্যগণ এক সময়ে মধ্য এশিয়ার প্রশস্ত ভূখণ্ডে একত্র থাকিয়া বহু শতাব্দী পরে এখন ভারতের প্রশস্ত ভূমিতে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষ এখন এই বহু শতাব্দীর বিযুক্ত তিন সম্প্রদায়েরই সম্মিলন-স্থল হইয়াছে। আশা করি, এই সম্মিলনে ইঁহাদের ভ্রাতৃভাব প্রশস্ততর হইবে, এবং ইঁহারা আপনাদের পূর্ব্বতন বিদ্বেষ ভুলিয়া এই দেশের উন্নতির জন্য একপ্রাণতা ও সমবেদনা দেখাইতে অগ্রসর হইবেন।

ভারতবর্ষে আর্য্যদিগের বসতি ও সভ্যতা বিস্তার।

হিন্দু আর্য্যগণ আফগানিস্তানের পার্ব্বত্য ভূমি পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে পঞ্জাবে আসিয়া বাস করেন। আফগানিস্তানে অনেক গুলি চারণ-ভূমি ছিল। গবাদি জীব প্রসন্নভাবে এই সকল ভূমিতে চরিয়া বেড়াইত। আর্য্যেরা কিয়দংশে আপনাদের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিয়া ছিলেন। এজন্য কোন স্থানে উঠিয়া যাইতে ইহাঁদের প্রথমে প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে ইহাঁরা আপনাদের অদৃষ্টের নিকট মস্তক অবনত করিলেন। দুর্নিবার আত্মবিগ্রহ ইঁহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিল। ইঁহারা অবশেষে আপনাদের প্রিয়তম আরাম-ভূমির

মমতা পরিত্যাগ করিলেন। যেরূপ আগ্রহে ইঁহাদের স্বদেশীয়গণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিবার জন্য দলে দলে মধ্য এশিয়ার ভূখণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যেরূপ সাহসে তাঁহারা আদিম জাতিকে পরাস্ত করিয়া গ্রীশে, ইতালীতে, রুষিয়ায় ও জর্ম্মনিতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষণে পশুপালক আর্য্যগণও ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপনের প্রসঙ্গে সেইরূপ আগ্রহ ও সেইরূপ সাহস দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিবারবর্গ ও অনুচরগণ কেহই আর আফগানিস্তানে রহিল না। সকলেই দল বাঁধিয়া হিমালয়ের পরপারে যাইতে প্রস্তুত হইল।

আর্য্যেরা গিরি-সঙ্কট পার হইয়া প্রথমে পেশাবরের নিকট উপনীত হন। সুদূর-বিস্তৃত হিমগিরি অনেক স্থলে ইহাঁদের আসিবার পথে বাধা দিয়াছিল। কিন্তু ইহাঁরা কিছুতেই কুণ্ঠিত বা ভগ্নোদ্যম হন নাই। ইহাঁদের সাহস, উৎসাহ ও একাগ্রতা তখন বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাঁরা দল বলের সহিত অমিত বিক্রমে সমস্ত দরী, সমস্ত উপত্যকা ও সমস্ত টিব্বা (পাহাড়ের উচ্চ অংশ) অতিক্রম করেন। যেখানে বেগবতী তরঙ্গিণী তরঙ্গরঙ্গ বিস্তার করিয়া ইহাঁদের গমনের অন্তরায় হয়, সেখানে ইহাঁরা নৌকা সংগ্রহ করিয়া অপর পারে উত্তীর্ণ হন। ইহাঁদের উৎসাহ বা উদ্যম কোনও স্থানে পর্য্যুদস্ত হয় নাই। বীর্য্যবন্ত আর্য্যপুরুষেরা বিপুল উৎসাহ সহকারে গিরি-পথ অতিক্রম পূর্ব্বক পঞ্জাবের শ্যামল ক্ষেত্রে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

ভারতবর্ষে আসিয়া আর্য্যেরা প্রতিদ্বন্দ্বী-শূন্য হইলেন না। যে শান্তি লাভের আশায় ইহাঁরা আফগানিস্তানের পার্ব্বত্য প্রদেশ ছাড়িয়া ছিলেন, এবং আপনাদের স্নেহ-পালিত গোধনের চারণ-ভূমির মমতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রথমে ইহাঁদের অদৃষ্টে সে শান্তি-সুখ ঘটিয়া উঠিল না। ইহাঁরা স্বদেশীয় শত্রুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, বিদেশীয় শত্রুর হাতে পড়িলেন। এই বিদেশীয়গণ আর্য্য-

দিগকে সহজে স্থান দিল না। ইহারা আপনাদের আবাস-ভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আর্য্যদিগের সহিত ঘোরতর সমরে অগ্রসর হইল। এদিকে আর্য্যেরা অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া দলবলের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অমনি ফিরিলেন না; ভারতবর্ষ-বাসী অনার্য্যদিগের যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিয়া তাঁহারাও সমর সজ্জার আয়োজন করিলেন। যে কাণ্ড আফগানিস্তানে ঘটিয়াছিল, ভারতবর্ষে তাহারই অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রথমে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডে নর-শোণিতস্রোত বহিল। আর্য্যদিগের এই প্রতিদ্বন্দ্বিগণ ভারতবর্ষের আদিম জাতি। বেদে ইহারা দস্যু অথবা দাস নামে উক্ত হইয়াছে।

আর্য্য ও দস্যুদিগের মধ্যে অনেক বিষয়ে বৈষম্য ছিল। আর্য্যেরা সকলে সম্মিলিত হইয়া আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির ভাল প্রণালী অবধারণ করিতে পারিতেন, দস্যুরা এরূপ এক উদ্দেশ্যে এক সূত্রে সম্বদ্ধ হইতে জানিত না। আর্য্যদিগের মধ্যে সমাজ-তন্ত্র ছিল, সকলে উৎকৃষ্টতর সামাজিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদের অবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিতেন, দস্যুগণের মধ্যে এরূপ সমাজ-তন্ত্র ছিল না, সমাজের উন্নতির জন্য ভাল ব্যবস্থাও প্রণীত হইত না। আর্য্যেরা যুদ্ধের নিয়ম জানিতেন, উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োগেও দক্ষ ছিলেন। দস্যুরা সামরিক রীতি পদ্ধতি কিছুই জানিত না, তাহাদের ভাল রকম অস্ত্র শস্ত্রও ছিল না। কোন বিষয়ে একবার অকৃতকার্য্য হইলে আর্য্যেরা আপনাদের বুদ্ধিবলে কৃতকার্য্য হইবার ভাল উপায় ঠিক করিতেন, এবং অধ্যবসায়ের সহিত সেই উপায় অবলম্বন করিয়া সিদ্ধকাম হইতেন, দস্যুদিগের এরূপ বুদ্ধি-বল ছিল না, সুতরাং তাহারা সকল সময়ে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিত না। আর্য্যেরা যুদ্ধে জয় লাভের জন্য দেবতাদিগের সহায়তা প্রার্থনা করিতেন, এবং জয়লাভ হইলে দেবতাদের প্রসাদে বিজয়-লক্ষ্মী অধিকৃত হইয়াছে ভাবিয়া, ভক্তিভাবে তাঁহাদের আরাধনায় নিবিষ্ট হইতেন, দস্যুদিগের

এরূপ ঈশ্বর-নিষ্ঠা ছিল না, তাহারা কেবল আপনাদের বাহুবলেরই গৌরব করিত। আর্য্যেরা সময়ে সময়ে প্রকাশ্য সমিতিতে সকলে একত্র হইতেন, এই সকল সমিতিতে সাহসী ও প্রতিভাশালী, সুযোদ্ধা ও সুকবিগণ সাধারণের নিকট প্রশংসা ও সম্মান পাইতেন, দস্যু-দিগের এরূপ সমিতির সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না। আর্য্যেরা অরাতিদিগকে সম্মুখ-যুদ্ধে আহ্বান করিতেন, সম্মুখ-যুদ্ধ ব্যতীত ইহাঁরা আর কোন রূপে শত্রুর অনিষ্ট করিতেন না, দস্যুরা সকল সময়ে সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হইত না, তাহারা অনেক সময়ে লুকাইয়া থাকিয়া, সুযোগ ক্রমে শত্রুপক্ষের খাদ্য সামগ্রী বা সম্পত্তি হরণ করিয়া বিঘ্ন জন্মাইত। আর্য্যেরা সুগঠিত, সুশ্রী, সুদীর্ঘ ও বলিষ্ঠ ছিলেন। দস্যুরা খর্ব্বকায়, কদাকার ও নয়নের অপ্রীতিকর ছিল; সংক্ষেপে সভ্যতার অনতিস্ফুট আলোক আর্য্যদিগকে ক্রমে উদ্ভাসিত করিতেছিল, অসভ্যতার অন্ধকার দস্যুদিগকে একবারে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল।

দস্যুরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিত। লৌহ অস্ত্র ইহাদের অদ্বিতীয় সম্বল ছিল। ইহারা কটিদেশে একখান ছোট ধুতি জড়াইয়া রাখিত। কোন কোন দস্যু অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সভ্য ছিল। ইহাদের সুরক্ষিত দুর্গ ও অনুচর থাকিত। ইহাদের সহিত যুদ্ধের সময় হিন্দু আর্য্যেরা আপনাদের আরাধ্য দেবগণের নিকট শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করিতেন।

আর্য্যেরা পঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি যে যে দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিলেন, সেই সেই দেশেই দস্যুরা তাঁহাদের বিপক্ষে দাঁড়াইল। ইহারা অভিনব আক্রমণকারিদের নিকট সহজে মস্তক অবনত করিল না। সকলেই আপনাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইল। আর্য্যেরা এই অসভ্যদিগের সাহস ও স্বদেশ-ভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তাঁহারা আপনাদের অধ্যুষিত স্থান নিরাপদ রাখিবার জন্য ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

তাঁহাদের সৈন্যগণ প্রধানতঃ পদাতিক ও অশ্বারোহী এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এই পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অনেক গুলি দল সংগঠিত হইল। প্রতি দলের এক এক জন সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। ইহাঁরা গো চর্ম্মে আচ্ছাদিত অশ্ব-চালিত যুদ্ধরথে আরোহণ করিয়া শঙ্খধ্বনি পূর্ব্বক সমর-দেবতার স্তুতি-গীতি গাইতে গাইতে আপন আপন সৈন্যদল চালনা করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন পতাকা সকল ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যদলে শোভা পাইতে লাগিল। সৈন্যগণের কেহ ধনুঃ ও তীর, কেহ বর্শা বা তরবারি লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সেনাপতিগণ আপনাদের সৈন্যদল সমভিব্যাহারে ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাইয়া দস্যুদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। দস্যুরা ইহাঁদের পরাক্রম সহিতে পারিল না; আপনাদের শস্য-পূর্ণ গ্রাম বা নগর ছাড়িয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল। অনেকে তরবারির মুখে সমর্পিত হইল। অনেকে পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক নানাবিধ উপহার দিয়া বিজেতাদিগকে পরিতুষ্ট করিল। দস্যুদিগের যে সকল জনপদ অধিকৃত হইল, আর্য্যেরা তথায় উপনিবিষ্ট হইলেন। এইরূপে অসভ্য দস্যু-জনপদে আর্য্য রীতি পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল এবং আর্য্য দেবগণ স্তুত হইতে লাগিলেন। প্রত্যেক সেনাপতি আপনাদের অধিকৃত এক একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া উঠিলেন। এই যুদ্ধ এক দিনে শেষ হইয়া যায় নাই। এক দিনে সমস্ত দস্যু-জনপদ আর্য্যদিগের হস্তগত হয় নাই। এ যুদ্ধ বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া চলিয়াছিল, বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া ভারতের এই আদিম অসভ্য জাতি প্রবল পরাক্রান্ত, সহায়-সম্পন্ন বিদেশীয় আক্রমণকারিদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। শেষে যখন ইহাদের জয়লাভের আশা নির্ম্মূল হইল, তখনও সকলে আর্য্যদিগের পদানত হইল না; কেহ স্বজন সমভিব্যাহারে দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইয়া আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিল, কেহ বা বিজন অরণ্যে যাইয়া বাস করিতে লাগিল। আর্য্যদিগের ইতিহাসের কোনও সময়ে এই জাতি একবারে পরাজিত হয় নাই। এখন ভারতবর্ষে খস, গারো, পুলিন্দ, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল

অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতি দেখা যায়, সেই সকল জাতির লোক এই আদিম দস্যুদিগের সন্তান।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আর্য্যগণ পঞ্জাবে আসিয়া বাস করেন। কিন্তু প্রথমেই একবারে সমস্ত পঞ্জাব বা তাহার বহিঃস্থ ভূভাগ তাঁহাদের অধিষ্ঠান-ভূমির মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। আর্য্য সেনাপতিগণ ভিন্ন ভিন্ন দস্যুজনপদের অধিকারী হইলেও প্রথমে উত্তর ভারতের একটী বিশেষ ভূখণ্ডে সকলে বাস করিতেন। এই ভূখণ্ড ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে পরিচিত। ইহা সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী এবং দিল্লীর প্রায় এক শত মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। সরস্বতী বিনশন নামক স্থানে বালুকা-গর্ভে বিলীন হইয়াছে। দৃষদ্বতী বর্ত্তমান সময়ে কাগার নাম ধারণ করিয়াছে। ব্রহ্মাবর্ত্তের দৈর্ঘ্য ৬৫ মাইল এবং বিস্তার ২০ হইতে ৪০ মাইল।

আর্য্যদিগের বংশ যখন ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ব্রহ্মাবর্ত্তে যখন তাঁহাদের স্থান-সমাবেশ হইল না, তখন তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মাবর্ত্তের পর তাঁহারা যে জনপদে আসিয়া বাস করেন, তাহার নাম ব্রহ্মর্ষি। উত্তর বিহার লইয়া গঙ্গা ও যমুনার উত্তরবর্ত্তী স্থান ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের মধ্যে পরিগণিত। এই প্রদেশ চারি ভাগে বিভক্ত ; কুরুক্ষেত্র, মৎস্য পঞ্চাল ও শূরসেন। কুরুক্ষেত্র সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী থানেশ্বরের নিকটে, মৎস্যদেশ এই কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে এবং মথুরার ৮৩ মাইল পশ্চিমে, কেহ কেহ কহেন, বর্ত্তমান জয়পুর-রাজ্যের কোন কোন অংশ মৎস্যদেশের অন্তর্গত। পঞ্চালের বর্ত্তমান নাম কান্যকুব্জ বা কনোজ ; শূরসেন বর্ত্তমান মথুরা। ইহাতে দেখা যাইতেছে, বংশ-বৃদ্ধির সহিত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রায় সমস্ত ভূভাগে আর্য্যদিগের বসতি বিস্তৃত হয়।

ব্রহ্মর্ষির পর আর্য্যেরা যে স্থানে আসিয়া বাস করেন, তাহার নাম মধ্যদেশ। মনুসংহিতার মতানুসারে মধ্যদেশ হিমালয় ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী।

মধ্যদেশের পর আবার উপনিবেশের সীমা বৃদ্ধি পাইল। আর্য্য-দিগের বংশ যখন এত বাড়িয়া উঠিল যে, মধ্যদেশেও সকলের স্থান-সমাবেশ হইল না, তখন তাঁহারা আপনাদের আবাসের জন্য চতুর্থ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। এই চতুর্থ স্থান আর্য্যাবর্ত্ত নামে প্রসিদ্ধ হইল। আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্বসীমা কালকবন বা বর্ত্তমান রাজমহল পাহাড়, দক্ষিণসীমা পারিযাত্র বা বিন্ধ্য পর্ব্বত এবং পশ্চিম সীমা আদর্শাবলী বা আরাবলী পর্ব্বত। ক্রমে আর্য্যাবর্ত্তের সীমা সম্প্রসারিত হয়। মনুসংহিতার মতে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, পূর্ব্বে পূর্ব্ব সাগর, দক্ষিণে বিন্ধ্য গিরি এবং পশ্চিমে পশ্চিম সাগর।

আর্য্যেরা যে, কেবল এই চারি স্থানেই আপনাদের উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নহে। ক্রমে দক্ষিণাপথেও তাঁহাদের বসতি বিস্তৃত হয়। এই সকল উপনিবেশ-স্থাপন ক্রমে ক্রমে হইয়াছিল, আর্য্যদিগের বংশ বৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের আবাস-স্থানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপ সংখ্যা বৃদ্ধি অল্প সময়ের মধ্যে হয় নাই। সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথে বসতি স্থাপন করিতে বহু বৎসর লাগিয়াছিল। হিন্দু আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই সমুদয় স্থানের আধিপত্য গ্রহণ করেন নাই।

আর্য্যগণ যখন দস্যুদিগকে পরাজয় করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিলেন, তখন ভারতবর্ষে অভিনব শাসন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রধান প্রধান আর্য্য পুরুষেরা দরবারে উপস্থিত হইয়া যথানিয়মে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে সময়ে ইহারা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন; আর্য্য গোষ্ঠীপতি, আর্য্য যাজ্ঞিক এবং আর্য্য সেনাপতি। সমাজে এই তিন শ্রেণীর লোকেরই সম্মান ও মর্য্যাদা ছিল। রাজাদের অন্তঃপুর ছিল। তাঁহারা সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। মৃগয়ায় তাঁহাদের আসক্তি ছিল। সময়ে সময়ে তাঁহারা সুবিস্তৃত আরণ্য প্রদেশে যাইয়া পশু হননে প্রবৃত্ত হইতেন। আরাধ্য

দেবতার পূজায় এবং পুরোহিতদিগকে ধন দানে তাঁহাদের ঔদাসীন্য ছিল না। সামন্তগণ তাঁহাদের সহচর ছিল। তাঁহারা এই সমস্ত সহচরে পরিবৃত হইয়া চারণদিগের মুখে প্রশংসা-গীতি শুনিতে শুনিতে আপনাদের আড়ম্বর-প্রিয়তা দেখাইতেন।

এই সময়ে আর্য্য-সমাজের সাধারণ অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীপতি পরিষ্কৃত ও সুন্দর গৃহে বাস করিতেন। তিনি যথানিয়মে রূপলাবণ্যবতী কামিনীদিগকে বিবাহ করিয়া অন্তঃপুরে রাখিতেন। তাঁহার বহুসংখ্য অনুচর ও গৃহপালিত পশু থাকিত। দেব-আরাধনার উপলক্ষে তিনি সমৃদ্ধ ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া সমাজে আপনার প্রতিপত্তি রক্ষা করিতেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ তাঁহাকে সাতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। অগ্রে তিনি ভোজন-স্থানে উপবিষ্ট না হইলে কেহই ভোজনে প্রবৃত্ত হইত না। আত্মপ্রাধান্য ও সমাজে আপনার ক্ষমতা রক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বদা অনুচরবর্গের সহিত প্রস্তুত থাকিতেন। ইহাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইলেও বিমুখ হইতেন না। তিনি সর্ব্বদা যুদ্ধ-বেশে থাকিতেন। সুকঠিন বর্ম্ম তাঁহার দেহ রক্ষা করিত এবং সুতীক্ষ্ণ তরবারি ও বর্শা তাঁহার হস্তে শোভা পাইত। তিনি গল-দেশে হার ও কর্ণে বলয় ধারণ করিতেন। কিরূপে প্রকৃত যোদ্ধার ন্যায় বীরত্ব দেখান যায়, ইহাই তাঁহার ভাবনার বিষয় ছিল। প্রকৃত যুদ্ধবীর হওয়া তিনি ধর্ম্মসম্মত কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিতেন। আরাধ্য দেবতার নিকট স্বাস্থ্য, আত্মরক্ষা ও সর্ব্বপ্রকার সুবিধাজনক আবাসগৃহ, এই তিনটী তাঁহার প্রার্থনার বিষয় ছিল। তিনি যত্নপূর্ব্বক যুদ্ধ-বিদ্যা অভ্যাস করিতেন। যুদ্ধে বা ভোগ-বিলাসের দ্রব্য সংগ্রহে তাঁহার সন্তানগণ সর্ব্বদা তাঁহার সহায়তা করিত। এজন্য তিনি দেবতাদের নিকট সুস্থ ও বলিষ্ঠ সন্তান প্রার্থনা করিতেন। পরিবার প্রতিপালন ব্যতীত অধিকৃত জনপদের শান্তিরক্ষা কার্য্যেও তাঁহার মনোযোগ ছিল। তিনি একের অধিক দার পরিগ্রহ করিতেন। তদীয় ধর্ম্মপত্নীগণ দেব-আরাধনা-স্থলে বা উৎসব-ভূমিতে

তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন। পুরোহিতেরা তাঁহার দানশীলতার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। প্রাত্যহিক উপাসনা-কার্য্যে এই পুরোহিত তাঁহার সহায়তা করিতেন। এই সময়ে এক জন উদ্গাতা (গায়ক) স্তোত্র গান করিতেন। এই গায়কেরা কেবল পুরাতন স্তোত্র গান করিতেন না; সময়ে সময়ে অভিনব স্তোত্রও রচনা করিতেন।

মহিলাগণ সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। তাঁহাদের বেশ-ভূষার ক্রমে পারিপাট্য হইয়াছিল। তাঁহারা যখন স্বয়ং পতি মনোনীত করিতে পারিতেন, তখন পরিণয়-পাশে আবদ্ধ হইতেন। কেহ কেহ বা যাবজ্জীবন বিবাহ করিতেন না। যুদ্ধ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অশ্ব ও হস্তী উভয়কেই যত্নসহকারে শিক্ষা দেওয়া হইত। শিল্পীরা নানাবিধ বিলাস-দ্রব্য প্রস্তুত করিত। প্রধান প্রধান লোকে এই সকল দ্রব্য অনেক পরিমাণে কিনিয়া লইতেন। শ্রমজীবীরা যথানিয়মে আপনাদের পরিশ্রমের মূল্য পাইত। সাহস করিয়া কেহ কোন মহৎ কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইলে সকলেই তাহাকে উৎসাহিত করিত। এইরূপে আর্য্যদিগের সাহস ও পরাক্রম ক্রমেই বাড়িয়া উঠিত, ক্রমেই তাঁহারা আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দস্যুদিগকে পরাজিত করিয়া আপনাদের অধিকার বাড়াইতে অগ্রসর হইতেন।

আর্য্য-সমাজে পুরোহিতের বিশেষ আদর ও মর্য্যাদা ছিল। রাজা ও গোষ্ঠীপতিগণ সকলেই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতেন, সকলেই তাঁহার বাসনা পূরণে চেষ্টা পাইতেন এবং সকলেই উপাসনা-সময়ে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। পুরোহিত সর্ব্বদা রাজ-দরবারে যাইতেন; রাজ-অন্তঃপুরেও তাঁহার গমন নিষিদ্ধ ছিল না, কিন্তু তিনি শাসন-সংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। তাঁহার ক্ষমতা কেবল ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়েই নিবদ্ধ থাকিত। সুতরাং শাসন-কর্ত্তা বা সেনাপতিদিগের ন্যায় তিনি আপনার আধিপত্য দেখাইতে পারিতেন না। এরূপ হইলেও পুরোহিতের পদ-গৌরব কোন অংশে হীন ছিল না। তাঁহার অনেক ধনরত্ন, অনেক ভূসম্পত্তি ও অনেক

অনুচর থাকিত। তিনি রাজার নিকট হইতে এক শতটী গাভী, রথ, অশ্ব, খেলাত ও বহুসংখ্য দাস পাইতেন। সুতরাং পুরোহিত সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। গোষ্ঠীপতিগণ অনেক বিষয়েই পুরোহিতের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। পুরোহিত উপস্থিত না হইলে প্রভাতে ও সায়ংকালে দেবতার আরাধনা বা পবিত্র অগ্নিকে উপহার দেওয়া হইত না। পুরোহিত যথানিয়মে আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন জন্য ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয় শিক্ষা করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সময়ে সময়ে সমিতি হইত। এই সকল সমিতিতে সকলে সমবেত হইয়া সাহিত্য ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয়াদির আলোচনা করিতেন। যে সকল ছাত্র ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয় শিক্ষা করিত, তাহাদের পরীক্ষা লইয়া, উপযুক্ত ছাত্রদিগকে এই সময়ে পুরোহিত-পদে বরণ করা হইত। এই উপাধি-দানের রীতি আড়ম্বর-শূন্য ও সরল ছিল। সমিতিস্থ বৃদ্ধ পুরোহিত ও শিক্ষকগণ সম্মত হইলে শিক্ষার্থিগণ প্রশংসা-পত্র পাইত। যে ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইত, তাহাকে কৃষক হইয়া হল চালনা করিতে হইত। সমাজে পুরোহিতের ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। তাঁহারা পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যে কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, তাহা লোকে কেবল পার্থিব সুখের দ্বার বিবেচনা করিত না, প্রত্যুত দেবগণকে সন্তুষ্ট করিবার একমাত্র উপায় মনে করিত। সুতরাং লোকে দেবগণকে প্রীত করিবার জন্য এবং সর্ব্ব প্রকার পার্থিব সুখ পাইবার আশায় পুরোহিতের অনুগ্রহাপেক্ষী হইয়া থাকিত। এইরূপ প্রাধান্য পাওয়াতে পুরোহিতগণ ক্রমে সমাজ মধ্যে আপনাদিগকে অসীম-শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। সময়ে এই অসীম শক্তি-সম্পন্ন পুরোহিত হইতে ভারতবর্ষে সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত হয়।

রাজা ও পুরোহিতের পর জনসাধারণ আর্য্য সমাজের একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। ইহারা প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য করিত। এ সময়ে কৃষিকার্য্য সকলেরই অভ্যস্ত ছিল। পুরোহিত আপনার কার্য্যে অপারগ হইলে হলচালনায় প্রবৃত্ত হইতেন। সেনাপতি যুদ্ধ বিগ্রহের অবসান হইলে

কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিতেন। গোষ্ঠীপতি সমাজের শাসন-কার্য্য হইতে অবসর লইলে কৃষি-ক্ষেত্রের তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত হইতেন। ভূমি চাস করা সকলেই একটী পবিত্র ও মহৎ কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করিত। কেহই এই পবিত্র ও মহৎ কর্ত্তব্যের প্রতি তাচ্ছীল্য দেখাইত না। যখন যুদ্ধ বাধিয়া উঠিত, তখন সকলে আপনার গোরু ও লাঙ্গল কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া, ধনুর্ব্বাণ ও অসি হস্তে করিয়া অরাতি নিপাতে বহির্গত হইত। যাহা হউক, কৃষি-কার্য্যের এইরূপ আদর থাকিলেও জনসাধারণের মধ্যে অন্যান্য ব্যবসায় অপ্রচলিত ছিল না। বণিকেরা স্থলপথে বা জলপথে বাণিজ্য-দ্রব্য লইয়া যাইত। এই সকল দ্রব্য লইয়া যাইবার জন্য জাহাজ ও নৌকা প্রভৃতি ছিল। কর্ম্মকারেরা স্বর্ণের নানাবিধ আভরণ, লৌহের নানাবিধ অস্ত্র ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিত। সাধারণতঃ পশম ও কার্পাস বস্ত্রের ব্যবহার ছিল। শিল্পীরা ভোগ-বিলাস-রত মহিলাদের জন্য বিশেষ পারিপাট্যশালী বস্ত্র প্রস্তুত করিত। তুষার-ধবল বস্ত্রেরই মূল্য অধিক ছিল। সূচীকার্য্যের আদর ছিল। অনেকে দরজীর কাজ করিত। জনসাধারণের মধ্যে চুক্তি-সংক্রান্ত আইন অপ্রচলিত ছিল না। সুদ লইয়া টাকা ধার দেওয়ার প্রথা ছিল। কোন কোন সময়ে অতিরিক্ত হারে সুদ গৃহীত হইত। কৃষি-ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত; এদিকে লোকে শিল্পজাত দ্রব্যাদিও প্রচুর পরিমাণে কিনিয়া লইত। সুতরাং সাধারণের জীবিকা নির্ব্বাহের কোন কষ্ট ছিল না। এই সময়ে কৃষিকার্য্যের অবস্থা অনেকাংশে উন্নত হইয়াছিল। স্থানে স্থানে কূপ খনিত হইত, কৃষিক্ষেত্র-সমূহে যথাসময়ে জল সেচন করা যাইত। ইহাতে পশুপালক ও কৃষি-জীবী, উভয়েরই বিশেষ সুবিধা হইত। দুষ্টা স্ত্রীলোকের অসদ্ভাব ছিল না। ইহাদের মধ্যে রহস্য-প্রসব বা ভ্রূণহত্যা হইত। আর্য্য সম্প্রদায়ের সকলেই প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিতেন, সকলেই প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনের পর শুচি হইয়া পবিত্র অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেন, এবং সক-

সেই ভক্তি-রসার্দ্র হৃদয়ে নানাবিধ উপহার দিয়া সেই অগ্নির উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতেন। জনসাধারণ উষার উদ্দেশ্যে যে সকল স্তোত্র গান করিত, তৎসমুদয়ে তাঁহাদের কার্য্য-তৎপরতা পরিস্ফুট হইত। উষার স্তুতির পর সাহসী যোদ্ধারা বিপক্ষের ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইত; কেহ কেহ শান্তভাবে গোধন সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে যাইত, কেহ বা আপনাদের অবলম্বিত ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিত।

এই সময়ে আর্য্য মহিলাগণের অবস্থা একবারে নিকৃষ্ট ছিল না। ইহাঁরা যথানিয়মে শিক্ষা পাইতেন, দেবার্চ্চনায় ও যজ্ঞানুষ্ঠানের অধিকারিণী ছিলেন, এবং স্বামীর সহিত যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত থাকিতেন। বিশ্ববারা নামে একটী মহিলা ঋগ্‌বেদের কয়েকটী বচন রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে হিন্দু আর্য্য মহিলাদিগের সুশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অধিক বয়স না হইলে এবং স্বয়ং পতি মনোনীত করণের ক্ষমতা না জন্মিলে আর্য্য মহিলাগণ পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতেন না। কেহ কেহ চিরকুমারী হইয়া থাকিতেন। চিরকুমারীরা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। মহিলাদের যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর ছিল। ইহাঁরা উপস্থিত হইলে পুরুষগণ দণ্ডায়মান হইয়া ইহাঁদের অভ্যর্থনা করিতেন। গর্ভবতী রমণী ও বালক বালিকাদের আহার অগ্রে প্রদত্ত হইত। ধর্ম্ম-পরিণীতা বণিতা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত না হইলে গৃহস্থের যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইত না। ইঁহারা এখনকার মত সর্ব্বদা অন্তঃপুরে নিরুদ্ধ থাকিতেন না, দেব-আরাধনা স্থলে বা উৎসব-ভূমিতে স্বামীর সহিত ইঁহাদের আগমন প্রতিষিদ্ধ ছিল না। স্বামিকর্ত্তৃক নিষিদ্ধা না হইলে ইহাঁরা অপর লোকের সহিত কথোপকথন করিতে পারিতেন। স্বামী বিদেশে থাকিলে মহিলারা অপরের বাটীতে যাইতেন না এবং উৎসব-স্থলে বা প্রকাশ্য সমিতিতে উপস্থিত হইতেন না। এই সময়ে তাঁহারা ঘরে বসিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেন। আর্য্য মহিলারা কঞ্চুলিক (কাঁচুলী) পরিধান করিতেন, এবং শীলতা রক্ষার জন্য চাদরে মস্তক আবৃত রাখিতেন। অপেক্ষাকৃত সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলারা কাঁচু-

লীর উপর আঙ্গিয়া (কুর্ত্তা) ধারণ করিতেন। কেহ কেহ ঘাগরা পরিতেন, কিন্তু অধিকাংশ মহিলাদেরই সাড়ী পরার প্রথা ছিল। এখনকার মত ঘোমটা দেওয়ার পদ্ধতি ছিল না। আর্য্য মহিলারা স্বর্ণময়-আভরণ ধারণ করিতেন। তাঁহাদের কেশগুচ্ছ খোঁপার ন্যায় মস্তকের দক্ষিণ ভাগে থাকিত। স্বর্ণময় শিরোভূষণ এই কেশ-গুচ্ছের উপর শোভা পাইত। এই সময়ে সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল না, মৃতভর্ত্তৃকার পত্যন্তর গ্রহণেরও নিষেধ-বিধি ছিল না। বিধবারা পতির মৃতদেহের নিকটে কিছুকাল শয়ন করিয়া উঠিয়া আসিতেন, পরে অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিতেন। অনেক স্থলে মৃত ভর্ত্তার ভ্রাতার সহিত ভ্রাতৃপত্নীর বিবাহ হইত। সাংসারিক কার্য্যের ভার গৃহিণীদিগের উপর সমর্পিত ছিল।

বৈষয়িক কার্য্যের তারতম্য অনুসারে আর্য্য-সম্প্রদায় উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। তিন শ্রেণীই আপনাদের অবস্থামত সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। এই সময়ে কোন কোন গৃহ দ্বিতল ছিল। গৃহের বাহ্য সৌন্দর্য্যের তাদৃশ আড়ম্বর ছিল না। মাটীর দেয়াল দিয়া মোটা মুটি ভাবে গৃহগুলি নির্ম্মিত হইত। কিন্তু গৃহের পরিচ্ছন্নতার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি ছিল। কোন গৃহই অপরিষ্কার থাকিত না, কোন গৃহই স্বাস্থ্যের হানি করিত না এবং কোন গৃহই বিশৃঙ্খল অবস্থায় দেখা যাইত না। গৃহে যাইবার পথ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিত। পথের পার্শ্বে রমণীয় ফুলের গাছ সকল রোপিত হইত। বিশ্বস্ত কুকুর গৃহদ্বার রক্ষা করিত। গৃহের মধ্য স্থলের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাংশে দেব-আরাধনা ও যজ্ঞের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। এইখানে পবিত্র অগ্নি থাকিত। এই উপাসনা-ভূমির প্রতি আর্য্যদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। ইহা কোন প্রকারে অপবিত্র হইলে সকলে আপনাদিগকে প্রনষ্ট-সর্ব্বস্ব বিবেচনা করিতেন। শত্রুর আক্রমণ হইতে ইহা সর্ব্বদা রক্ষিত হইত। এই যজ্ঞভূমি দর্শনে আর্য্যদিগের হৃদয়ে অভিনব আশা ও উৎসাহের উদয় হইত, অভিনব আশা ও

উৎসাহের সহিত আর্য্যেরা এই যজ্ঞ-ভূমিতে সমবেত হইতেন। প্রাতঃকালে ও সায়ন্তন সময়ে গৃহস্বামী স্ত্রীপুত্রে পরিবৃত হইয়া পুরোহিতের সাহায্যে পবিত্র অগ্নিতে আহুতি দিতেন। ছোট ছোট বালক বালিকারা সমস্বরে পবিত্র স্তোত্র গান করিত। এখন আমাদের মধ্যে কৌশেয় বস্ত্র যেমন পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হয়, আর্য্যদের মধ্যে তেমনি শ্বেত পরিচ্ছদের পবিত্রতা ছিল। পুরোহিত শ্বেত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন; গৃহস্বামী শ্বেত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া উপাসনা-ভূমিতে উপস্থিত হইতেন। দুর্গ সকল প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত থাকিত। এই সময়ে কৃষিক্ষেত্র, গোচরণ স্থান ও গাভী আর্য্যদের প্রধান সম্পত্তি ছিল। আর্য্যেরা গাভীদিগকে যত্নসহকারে রক্ষা করিতেন। গোদোহ একটী পবিত্র কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। গোষ্ঠীপতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন। গাভীদিগকে পরিষ্কৃত স্থানে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাখা হইত, আর্য্যগণ সংযত চিত্তে প্রত্যেক গাভীকে সম্বোধন করিয়া পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, ইহার পর বৎসের দুগ্ধ পান শেষ হইলে পর্য্যায়ক্রমে এক একটী গাভীকে দোহন করা হইত। হিন্দু আর্য্যগণ গো, মেষ, মহিষ প্রভৃতির মাংস আহার করিতেন। তখন গোহত্যার নিষেধ-বিধি ছিল না। অতিথি সমাগত হইলে আর্য্যেরা তাহাকে গো-বৎস্যের মাংসে সন্তৃপ্ত করিতেন। সোমরস দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া সুপেয় সুরা প্রস্তুত করা হইত। আর্য্যেরা এই সুরার বড় ভক্ত ছিলেন। ইহার ঘ্রাণে তাঁহারা তৃপ্ত হইতেন, ইহার স্পর্শে তাঁহারা অনির্ব্বচনীয় প্রীতি লাভ করিতেন, এবং ইহার আস্বাদে তাঁহারা অভিনব উৎসাহে পূর্ণ হইয়া মহত্তর কার্য্য-সাধনে অগ্রসর হইতেন। বিবাহের সময় বর কন্যার গাত্রে দুগ্ধ ও মাখন মাখাইয়া দেওয়া হইত। কন্যা-কর্ত্তা সমৃদ্ধ হইলে অনেক বহুমূল্য দ্রব্য যৌতুক দিতেন। কোন কোন সময়ে এক হাজার গাভী দেওয়া হইত। উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত নিয়ম ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতেন। পুত্রের অবর্ত্ত-

মানে দৌহিত্র মাতামহের সম্পত্তি অধিকার করিত। উত্তরাধিকার ও ধর্ম্ম-কার্য্যের সম্বন্ধে সর্ব্বদা প্রবীণদিগের মত গ্রহণ করা হইত। যাঁহাদের বয়স অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর হয় নাই, তাঁহাদের উপর এই সকল গুরুতর বিষয়ের বিচার-ভার সমর্পিত হইত না।

আর্য্যেরা যখন মধ্য এশিয়ার ভূখণ্ডে বাস করিতেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে মৃতদেহ কবরসাৎ বা দগ্ধ করার প্রথা ছিল না। কাহারও মৃত্যু হইলে তদীয় শব নিকটবর্ত্তী অরণ্যে বা কোন নিভৃত স্থানে ফেলিয়া দেওয়া হইত। বোম্বাই-নিবাসী পারসীদিগের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত এই নিয়ম প্রচলিত আছে। ইঁহারা আপনাদের আত্মীয় স্বজনের মৃত দেহ উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে নিক্ষেপ করেন। যাহা হউক, আর্য্যেরা যখন কৃষিজীবিদিগের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহারা এই প্রণালীর সংস্কার আরম্ভ করেন। বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রণালী তাঁহাদিগকে এ সম্বন্ধে বিভিন্ন পদ্ধতির অবলম্বনে প্রবর্ত্তিত করে। ইহার পর স্বাস্থ্যের উপদেশ, দেশের জল বায়ুর অবস্থা ও হৃদয়ের কোমল বৃত্তি-নিচয় এইরূপ সংস্কারের অনুকূল হয়। ভক্তি-ভাজন জনক জননী, স্নেহাস্পদ সন্তান, প্রেমময়ী প্রণয়িনীর দেহ শৃগাল, কুকুর বা মাংসাশী পক্ষীসকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে, ইহা মনে হইলে কাহার না হৃদয় ব্যথিত হয়? হিন্দু আর্য্যেরা এইরূপ ব্যথিত-হৃদয় হইলেন। মৃতদেহ স্থান-বিশেষে ফেলিয়া দেওয়ার পরিবর্ত্তে উহা সমাধিস্থ করার নিয়ম হইল। বলদদ্বয়-চালিত রথে মৃতদেহ স্থাপন পূর্ব্বক সমাধি-স্থানে লইয়া যাওয়া হইত। এখন যেমন হিন্দুদের মধ্যে স্বজাতি ভিন্ন আর কেহ মৃতদেহ স্পর্শ করিতে পারে না, পূর্ব্বে তেমন নিয়ম ছিল না। রথের অভাবে বাড়ীর প্রাচীন দাস শব লইয়া যাইত। ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে পত্নী তাহার পার্শ্বে শয়ন করিতেন। এক জন আত্মীয় অথবা বিশ্বস্ত চাকর এই মৃতভর্তৃকাকে সম্বোধন করিয়া কহিত, "শুভে! তুমি গতাসু ব্যক্তির পার্শ্বে শয়ন করিয়াছ, এখন উঠিয়া জীবলোকে আইস। যে তোমার পাণিগ্রহণে অভিলাষী, তাহার

সহিত আবার পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হও।" রমণী উঠিয়া আসিতেন। মৃতের হস্তে ধনুর্ব্বাণ থাকিত। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি এই ধনুর্ব্বাণ খুলিয়া লইত। পরে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শব মৃত্তিকায় প্রোথিত করা হইত। তিন হাজার বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হিন্দু আর্য্য-সমাজে এই রীতি প্রচলিত ছিল। ইহার পর দাহ করিয়া ভস্মাবশেষ মৃত্তিকায় প্রোথিত রাখিবার প্রথা হয়। খ্রীষ্টীয় শাকের প্রারম্ভ হইতে দাহাবশিষ্ট ভস্মাদি প্রোথিত করার পরিবর্ত্তে জলসাৎ করার নিয়ম হয়। এখন এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

হিন্দু আর্য্যগণের মধ্যে সাধারণতঃ ধুতি পরার প্রথা ছিল। গায়ে চাপকানের মত এক প্রকার লম্বা অঙ্গাবরণ থাকিত। যুদ্ধ-যাত্রীরা কোমর বন্ধ ব্যবহার করিত। মাথায় চাদর বান্ধা হইত। চাদরের উভয় পার্শ্ব পশ্চাদ্দেশে ঝুলিতে থাকিত। পাদুকার মধ্যে এক প্রকার চটী জুতা প্রচলিত ছিল। আর্য্যেরা কর্ণে বলয় ও গলদেশে হার ধারণ করিতেন। এখন হিন্দুস্থানীরা যেমন কতক গুলি মোহর গাঁথিয়া গলায় পরে,সম্ভবতঃ আর্য্যেরা তখন স্বর্ণ-মুদ্রা সকল তেমন করিয়া গলায় দিতেন। মহিলাদের মধ্যে কর্ণাভরণ, শিরোভূষণ, হার, বালা, তাবিজ প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব ছিল না। বৈদিক গ্রন্থে স্বর্ণাসন, ভোজন-পাত্র, পান-পাত্র প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আর্য্যেরা চর্ম্ম-নির্ম্মিত থলিয়াতে জল রাখিতেন। এই থলিয়াতে চর্ম্মভাণ্ড বলা যাইত। সমুদ্র-যাত্রার জন্য জাহাজ ও নৌকা নির্ম্মাণের প্রথা ছিল।

এই সময়ে হিন্দু আর্য্যেরা সভ্যতার উচ্চতর সোপানে পদার্পণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের সমুদয় আচার ব্যবহার পরিশুদ্ধ ও সংস্কৃত প্রণালীর অনুমোদিত ছিল না। তাঁহারা যখন কোন বিষয়ের গূঢ় তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইতেন, তখন আপনাদের কল্পনা-বলে সেই বিষয়টী অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিতেন। এই প্রকারে নানা প্রকার কুসংস্কারের আবির্ভাব হয়। সূর্য্য অথবা চন্দ্রগ্রহণ হইলে আর্য্যেরা

ভাবিতেন, কোন ক্ষমতাশালী দৈত্য সূর্য্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। এজন্য পুরোহিতগণ কাতরস্বরে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ইহাদের মুক্তি প্রার্থনা করিতেন। এই সময়ে কামল ও শ্বাসরোগের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। এই কামল ও শ্বাস-রোগীর দেহের উপর পবিত্র স্তোত্র পড়িয়া উপশম প্রার্থনা করা হইত। এখন যেমন আমাদের দেশে "ঝাড় ফোঁকের" পদ্ধতি আছে, প্রাচীন হিন্দু আর্য্যগণের মধ্যেও এইরূপ পদ্ধতি ছিল। পবিত্র মন্ত্রের উপর আর্য্যদিগের অটল বিশ্বাস ছিল। তাঁহারা ভাবিতেন, এই মন্ত্রবলে তাঁহাদের দেবগণ সন্তুষ্ট হইবেন এবং তাঁহাদের স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকিবে।

প্রাচীন হিন্দু আর্য্যগণ যখন মধ্য এশিয়ার প্রশস্ত মালভূমিতে অথবা আফগানস্তানের পার্ব্বত্য প্রদেশে ছিলেন, তখন তাঁহারা প্রকৃতিরাজ্যের এক একটী বিশেষ শক্তিকে দেবতা বলিয়া আরাধনা করিতেন। ইহার পর তাঁহারা ভারতবর্ষে সমাগত হইলেন। অনন্ত-তুষার-মণ্ডিত হিমগিরি তাঁহাদের কল্পনাশক্তিকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। সপ্তসিন্ধুর প্রসন্ন সলিল-বিধৌত শ্যামল ভূখণ্ড তাঁহাদের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় প্রীতি সঞ্চারিত করিল। এখানেও বায়ুর অসীম প্রভাব, সূর্য্যের প্রচণ্ড মূর্ত্তি, অগ্নির তেজঃপ্রকাশিনী সুচঞ্চল শিখা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তাঁহারা ভারতবর্ষের নিসর্গ-শোভা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। চারি দিকের নৈসর্গিক ব্যাপারের প্রভাব দর্শনে তাঁহাদের বিস্ময় জন্মিল, তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় নৈসর্গিক দেবগণেরই প্রাধান্য স্বীকার করিলেন। যজমানের নিজ নিকেতনে পূর্ব্বের ন্যায় বরুণ, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণের আরাধনা হইতে লাগিল। তাঁহারা অন্নাদি লাভের উদ্দেশ্যে বা বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য এই সকল দেবতার স্তুতি পাঠ করিতেন এবং ইহাদিগকে ফল, মূল ও সোমরস নিবেদন করিয়া দিতেন। এসময়ে তাঁহাদের মধ্যে পৌত্তলিকতা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, এ সময়ে তাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন

নাই। তাঁহারা এ সময়ে সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতির প্রভাব দেখিয়া তৎসমূদয়ের উপাসনা করিতেন। অনাবৃষ্টি হইলে বৃষ্টির প্রার্থনায় ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইতেন এবং সিন্ধু সরস্বতীর মনোহর শোভা ও শৈত্য-প্রভৃতি গুণ দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ভক্তিরসার্দ্র হৃদয়ে উহাদের স্তব করিতেন। ভারতবর্ষ-বাসী আর্য্যদিগের উপাসনা-পদ্ধতি প্রথমে এইরূপ সরল ও প্রশান্ত ছিল। তাঁহারা ঋগ্বেদের মন্ত্র মাত্র আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতেন।

এই সময়ে লিপি-প্রণালী প্রচলিত ছিল না। হিন্দু আর্য্যদিগের সমস্ত রচনা মুখে মুখেই চলিয়া আসিত। দেবগণের উদ্দেশে অনেক কবিতা রচিত ও গীত হইত। এই সকল কবিতা ঋগ্বেদের মন্ত্র নামে এক্ষণে সাধারণের নিকট পরিচিত হইতেছে। এই স্থলে বলা উচিত যে, বেদ ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বেদের আবার সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ এই তিনটী অংশ আছে। সংহিতায় সরল ভাবে উপাসনার মন্ত্র, ব্রাহ্মণে আড়ম্বর-পূর্ণ পূজা-পদ্ধতি এবং উপনিষদে পরমার্থ-চিন্তা-ঘটিত আলোচনা রহিয়াছে। এসময়ে ঋগ্বেদের সংহিতামাত্র আর্য্যদিগের প্রধান সাহিত্য ছিল। এই সাহিত্যে বিবিধ ছন্দ বা অনুপ্রাসের অভাব নাই। ইহার অনেক স্থানে উদ্দীপনা, আবেগ ও কল্পনার লীলা-তরঙ্গ নাই। আর্য্যগণ দেবগণের উদ্দেশে যে সকল স্তোত্র রচনা করিয়াছেন, তৎসমুদায়েই তাঁহাদের জাতীয় স্বভাব প্রতিফলিত হইয়াছে। এই সকল রচনা কোমলতা, উদ্ভাবনা ও উদ্দীপনা প্রভৃতি আদিম অবস্থায় কবিত্ব-সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ। ইহার সকল স্থলেই সরলতা ও প্রশান্ত ভাব প্রতিভাসিত হইয়াছে। হিন্দু আর্য্যগণ ভক্তিরসার্দ্র হৃদয়ে দেবগণের উদ্দেশে যে সকল স্তোত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দ-প্রবাহের আবির্ভাব হয়।

প্রাচীন আর্য্যদিগের এই সাহিত্যে তাঁহাদের উপাস্য দেবগণের মহিমা সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আর্য্যগণ সকল সময়ে সকল

অবস্থাতেই দেব-মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা দেবগণের নিকট সুখাদ্য দ্রব্য, সুপেয় জল, সুস্থ সন্তান এবং শত্রুপক্ষের উপর জয় প্রার্থনা করিতে কখনও ঔদাসীন্য দেখান নাই। সুতরাং তাঁহাদের সাহিত্যের সকল স্থলেই তাঁহাদের প্রশান্ত ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধর্ম্মভাবের আতিশয্য প্রযুক্তই আর্য্যেরা সকল সময়ে আপনাদের দেবগণের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন।

অশোক।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যত রাজা রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অশোক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অশোকের প্রতাপ ও অশোকের শাসন এক সময়ে পাটলীপুত্র হইতে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত, ধাযুলী হইতে কটক পর্য্যন্ত, এবং ত্রিহুতের উত্তরাংশ হইতে গুজরাট পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। হোমর অবিসম্বাদিতরূপে বীররসের শ্রেষ্ঠ কবি নহেন, দিমস্থিনিস অবিসম্বাদিতরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাগ্মী নহেন, নেপোলিয়ন অবিসম্বাদিতরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরপুরুষ নহেন, কিন্তু অশোক সমুদয় প্রাচীন নরপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। তিনি অন্যান্য নৃপতিদিগকে এতদূর পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছেন যে, তাঁহাদিগকে কখনই তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত করা যায় না।

মহারাজ অশোক সুপ্রসিদ্ধ পাটলীপুত্ররাজ বিন্দুসারের পুত্র। যে চন্দ্রগুপ্তের শাসন-মহিমা এক সময়ে যুনানী সম্রাট-গণের গৌরব-স্পর্দ্ধী হইয়াছিল, যাঁহার সময় হইতে প্রাচীন ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাস অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ও আলোকিত হইয়াছিল; অশোক সেই মৌর্য্যকুল-গৌরব মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র।

বিন্দুসার যখন পাটলীপুত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন চম্পা-পুরীবাসী একজন ব্রাহ্মণের নিকট একটী কন্যারত্ন লাভ করেন। কন্যার নাম সুভদ্রাঙ্গী। সুভদ্রাঙ্গীর সম্বন্ধে একদা গণকেরা কহিয়াছিলেন, ইনি একজন প্রসিদ্ধ রাজার মহিষী ও একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতির মাতা হইবেন। ব্রাহ্মণ এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী করিবার আশায় তনয়াকে বিন্দুসারের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করেন।

বিন্দুসার কন্যাটীকে পাইয়া অন্তঃপুরে রাখিলেন। কিন্তু সুভদ্রাঙ্গীকে দেখিয়া অন্তঃপুরবাসিনী মহিষীদিগের নিদারুণ ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তাঁহারা সুভদ্রাঙ্গীকে সর্ব্বদা নিকৃষ্ট কার্য্যসাধনে নিয়োজিত রাখিতেন। ক্রমে তাঁহার প্রতি ক্ষৌর-কার্য্যের ভার সমর্পিত হইল। সুভদ্রাঙ্গী তাহাতে অপমানিতা বোধ না করিয়া এই কার্য্যে সাতিশয় মনোযোগী হইলেন। একদা রাণীগণের আদেশে তিনি মহারাজ বিন্দু-সারের ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করেন। মহারাজ বিন্দুসার সুভদ্রাঙ্গীর কার্য্যপটুতা দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া, তাঁহার যে কোন প্রার্থনা পূরণে প্রতিশ্রুত হইলেন। সুভদ্রাঙ্গী ইহাতে বিন্দুসারের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রস্তাব করিলেন। বিন্দুসার তাঁহাকে নীচবংশোদ্ভবা মনে করিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তাহাতে সুভদ্রাঙ্গী উত্তর করিলেন, "আমি ব্রাহ্মণতনয়া। পিতা আপনার সহিত বিবাহ দিবার ইচ্ছা করিয়াই আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।" সুভদ্রাঙ্গীর এই উত্তরে পূর্ব্বের সমস্ত বিবরণ বিন্দু-সারের স্মৃতিপথবর্ত্তী হইল। বিন্দুসার তাঁহাকে যথাবিধানে বিবাহ করিলেন। সুভদ্রাঙ্গী ক্রমে নিজগুণে অন্তঃপুরের প্রধানা মহিষী হইলেন।

এই দম্পতী হইতে অশোকের উদ্ভব হয়। কথিত আছে পুত্র-মুখ নিরীক্ষণে মাতার শোক দূরীভূত হওয়াতে ভূমিষ্ঠ সন্তান অশোক নামে অভিহিত হয়। কিন্তু সুভদ্রাঙ্গীর কি শোক ছিল, তাহা প্রকাশ নাই। অশোক অতি কদাকার ছিলেন; আকৃতির সঙ্গে অশোকের

প্রকৃতিও সাতিশয় অপ্রীতিকর হইয়াছিল। এজন্য তিনি 'চণ্ড' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। বিন্দুসার পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষার্থ পিঙ্গলবৎস নামে একজন জ্যোতির্ব্বিদের হস্তে সমর্পণ করেন। এই জ্যোতির্ব্বিৎ একদা গণনা করিয়া কহেন, অশোক পিতৃরাজ্যের অধিকারী হইয়া পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করিবেন। অশোক ব্যতীত সুভদ্রাঙ্গীর আরও একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাঁহার নাম বীতাশোক বা বিগতাশোক।

মহারাজ বিন্দুসারের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ তনয়ের নাম সুসীম। ইঁহার সহিত অশোকের সম্প্রীতি ছিল না। বিন্দুসার ইঁহাকে স্থানান্তরে রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময়ে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। বিন্দুসার অশোককে ঐ বিদ্রোহদমনার্থ পাঠাইয়া দিলেন।

অশোক তক্ষশিলায় উপস্থিত হইলে তত্রত্য অধিবাসিগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিল। অশোক বিদ্রোহ দমনে কৃতকার্য্য হইলেন। ইতিমধ্যে সুসীম পাটলীপুত্রে উৎপাত আরম্ভ করাতে মন্ত্রিগণের পরামর্শে বিন্দুসার সুসীমকে তক্ষশিলায় পাঠাইয়া আশোককে পাটলীপুত্রে আহ্বান করিলেন।

ক্রমে বিন্দুসারের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল; তিনি জীবনের শেষ সীমায় পদার্পণ করিলেন। বিন্দুসার এই আসন্নকালে অমাত্যের পরামর্শে কিন্তু নিজের সম্পূর্ণ অমতে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অনুপস্থিতি পর্য্যন্ত অশোককে রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ আদেশ দিয়া পরলোক গমন করিলেন। এদিকে সুসীম তক্ষশীলা হইতে প্রত্যাগত হইয়া পাটলীপুত্র আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অশোক তাঁহার কার্য্যকুশল অমাত্য রাধাগুপ্তের সাহায্যে সুসীমকে পরাভূত ও নিহত করিলেন।

ইহার পর ভাবী অনিষ্ট ও উপদ্রবের আশঙ্কায় অশোক স্বহস্তে রাজবংশীয় অনেক ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করেন। এই রূপ আরও অনেক কার্য্যে তাঁহার প্রচণ্ড স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। একদা তিনি

শুনিতে পাইলেন, কয়েকটী কামিনী পুষ্পচয়ন উপলক্ষে একটি অশোক-বৃক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়াছে। এই অপরাধ বড় গুরুতর মনে করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সেই অপরাধিনী কামিনীদিগকে প্রজ্বলিত অনলে দগ্ধ করিবার জন্য চণ্ডগিরিক নামে একজন নরহন্তাকে আদেশ করিলেন। নিষ্ঠুর চণ্ডগিরিক অবিলম্বে কঠোর আজ্ঞা সম্পাদন করিল।

একদা সার্থবাহ নামে একজন ধনাঢ্য বণিক্ সপরিবারে এক শত বণিকের সহিত বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। এই সমুদ্রবাস সময়েই তাঁহার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়; সার্থবাহ তাঁহার নাম সমুদ্র রাখেন। সার্থবাহ বাণিজ্যের নিমিত্ত দ্বাদশবর্ষকাল নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগত হইতেছিলেন, তখন একদল দস্যু আসিয়া তাঁহাকে সপরিবারে নিহত করে, কেবল তাঁহার পুত্র সমুদ্র ঘটনাক্রমে পলায়ন করেন। সমুদ্র এইরূপে পিতৃমাতৃহীন হইয়া বৌদ্ধ যতিবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। একদা ভিক্ষা-প্রার্থী হইয়া তিনি চণ্ডগিরিকের গৃহে সমুপস্থিত হন। চণ্ডগিরিক এই বৌদ্ধ যতিকে হত্যা করিতে যথাশক্তি চেষ্টা পায়, কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। ইহাতে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া চণ্ডগিরিক এই বিবরণ অশোককে জানায়। মহা-রাজ অশোক এই সংবাদে ভ্রমণকারী ভিক্ষুকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহার কথা বার্ত্তা শুনিয়া এবং চরিত্র দেখিয়া অশোকের জ্ঞান-লাভ হইল। নিজ চরিত্র সংশোধনের ইচ্ছা জন্মিল। কিন্তু তিনি প্রথমে দুরাচার চণ্ডগিরিকের শিরশ্ছেদ না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিলেন না।

এই অবধি বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি অশোকের আস্থা ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হয়। অশোক ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ অশোকের ধর্ম্ম-গুরুর নাম উপগুপ্ত। উপগুপ্ত মথুরার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির তনয়। শোণবাসী নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ইঁহাকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। উপগুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্ম-তত্ত্বে সাতিশয় প্রবীণ ছিলেন। তিনি

অশোককে নানা প্রকার ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা বলবতী ও সাধনা মহীয়সী করিয়া তুলেন। অশোক এইরূপে গুরুসহবাসে ও গুরূপদেশে ধর্ম্ম-নিরত ও ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠেন।

ক্রমে ধর্ম্মাচরণে ও ধর্ম্মনিষ্ঠায় অশোকের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইল। নানা স্থানে স্তূপ ও মঠ প্রভৃতির নির্ম্মাণে তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। তক্ষশিলাবাসি-গণের প্রার্থনায় তথায় ৩,৫১০,০০০,০০০ স্তূপ নির্ম্মিত হয়; সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানেও দশলক্ষ স্তূপ প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া উঠে। ঈদৃশ ধর্ম্মাচরণে ও ধর্ম্মসম্মত কার্য্যানুষ্ঠানে অশোকের পূর্ব্বতন "চণ্ড" নাম তিরোহিত হয়; তিনি ধর্ম্মাশোক নামে সাধারণের নিকট প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন।

যখন উপগুপ্ত আপনার আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন, তখন অশোক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম তাঁহার সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম বলিয়া সাধারণ্যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, এবং এই ধর্ম্মের মহিমা ও এই ধর্ম্মের উন্নতিবিধানে সমুদয় সম্পত্তি ব্যয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠেন। বুদ্ধগয়ার যে তরুমূলে বসিয়া মহামতি বুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন, সেই বোধী বৃক্ষের রক্ষাবিধানে তাঁহার একাগ্রতা ও চেষ্টা সাতিশয় বলবতী হইয়া উঠে। মহারাজ অশোকের প্রধানা মহিষী পবিষ্যরক্ষিতা ভর্ত্তাকে এইরূপ পুরুষানুগত চিরন্তন ধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ ও নূতন ধর্ম্মের প্রতি আস্থা-বান্ দেখিয়া সাতিশয় বিরক্ত হন। কথিত আছে, একদা পবিষ্য-রক্ষিতা মাতঙ্গী নামে এক চণ্ডালীকে গুপ্তভাবে উক্ত বোধীবৃক্ষ বিনষ্ট করিতে আদেশ করেন। চণ্ডালী যাদুবিদ্যাপ্রভাবে ও ঔষধ-প্রয়োগে বৃক্ষটীকে ক্রমে বিশুষ্ক করিয়া তুলে। অশোক এই সংবাদ শ্রবণে সাতিশয় ক্ষুব্ধ হন। রাণী তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় না। পরিশেষে পবিষ্যরক্ষিতার আদেশে মাতঙ্গী বৃক্ষটীকে পুনর্ব্বার সজীব করে; বৃক্ষের সজীবতার সঙ্গে সঙ্গে অশোকও সজীব ও সুপ্রসন্ন হইয়া উঠেন।

এই সময়ে তক্ষশিলা শান্তিপ্রবণ ছিল না। অন্তর্ব্বিদ্রোহে উহা

সাতিশয় অব্যবস্থিত হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজ অশোক স্বীয় পুত্র কুনালকে এই বিদ্রোহ দমন জন্য তক্ষশিলায় প্রেরণ করেন। কুনাল অশোকের সাতিশয় প্রিয় ছিলেন। অশোক মহা আড়ম্বরে কাঞ্চনমালা নামে একটি রূপবতী কামিনীর সহিত কুনালের বিবাহ দেন। কাঞ্চন মালার চরিত্র অতি পবিত্র ছিল। কুনাল সৈন্যদল সমভিব্যাহারে তক্ষশিলায় উপনীত হইলে বিদ্রোহীদিগের দলপতি কুঞ্জরকর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে। এরূপ প্রবাদ আছে, কুনাল বিদ্রোহদমনার্থ তক্ষশিলায় প্রেরিত হইলে অশোক একদা স্বপ্নে দেখিলেন প্রাণপ্রিয় পুত্র কুনালের মুখ বিবর্ণ, বিশীর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অশোক এই স্বপ্নের বিবরণ গণকদিগকে জানাইলে তাঁহারা গণনা করিয়া কহিলেন, প্রস্তাবিত স্বপ্নে তিনটি অনিষ্ট সূচিত হইতেছে, প্রথম প্রাণহানি, দ্বিতীয় পার্থিব বন্ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক যতিবেশ ধারণ, তৃতীয় দর্শনশক্তির বিনাশ। মহারাজ অশোক প্রিয়তম পুত্রের সম্বন্ধে এইরূপ অনিষ্টের সূচনায় সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্য হইতে বিরত হইলেন। ইহাতে অশোকের অন্যতমা মহিষী ও কুনালের বিমাতা তিষ্যরক্ষিতা কুনালের অনিষ্ট সাধনের উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া স্বয়ং রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার মতানুসারে আদেশ-লিপি প্রচারিত হইতে লাগিল, এবং তাঁহার মতানুসারে সমুদয় কর্ম্মচারিগণ যথানির্দ্দিষ্ট কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি গোপনে একখানি পত্র লিখাইয়া কুঞ্জরকর্ণকে আদেশ করিলেন যে, অবিলম্বে কুনালের দর্শন-শক্তি বিনষ্ট করিতে হইবে। পত্র রাজনামাঙ্কিত মোহরে শোভিত হইয়া যথাস্থানে প্রেরিত হইল। কুঞ্জরকর্ণ এই পত্র পাইয়া কি প্রকারে আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে ভাবিতেছেন, ইত্যবসরে কুনাল রাজাজ্ঞা জানিতে পারিয়া আপনি কুঞ্জরকর্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া উক্ত আদেশলিপি দেখিতে চাহিলেন। কুঞ্জরকর্ণ বড় কুণ্ঠিত হইলেন, কিন্তু কি করেন, মহা পরাক্রান্ত কুনালের নিকট বাক্‌চাতুরী করিবার তাঁহার সাধ্য হইল না। রাজলিপি কুনালের হস্তে সমর্পণ

করিলেন। কুনাল ধীরে ধীরে পড়িলেন। পত্রে রাজার নাম রাজার মোহর রহিয়াছে; সন্দেহ আর কিছুই রহিল না। তখন কুনাল বলিলেন, “কুঞ্জরকর্ণ! রাজাজ্ঞা প্রতিপালন কর।” কুঞ্জরকর্ণকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া কুনাল বলিলেন, “তুমি ইতস্ততঃ করিও না, রাজাজ্ঞা অবহেলা করিলে তাহার প্রতিফল এখনই আমি দিব,” ইহা বলিয়া কুনাল কটী হইতে অসি নিষ্কোশিত করিলেন। কাজেই কুঞ্জরকর্ণকে রাজাজ্ঞা রক্ষা করিতে হইল। কিন্তু এ বিষয়ে মতান্তর আছে। যাহা হউক পরে অন্ধ কুনাল পরিব্রাজক বেশে তক্ষশিলা হইতে বহির্গত হইয়া বহু কষ্টে পাটলীপুত্রে উপনীত হইলেন। তিনি গোপনে রাজকীয় হস্তিশালায় আসিয়া নিশীথ সময়ে বংশীধ্বনি করিয়া আমোদ করিতে লাগিলেন। ধ্বনি রাজ-বিলাস-ভবনের গবাক্ষদেশ দিয়া অশোকের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইল। ইহা অশোকের হৃদয়ের প্রতিস্তর অমৃতরসে অভিষিক্ত করিয়া তুলিল। মহারাজ অশোক নিশীথকালে দূরাগত বংশীধ্বনিতে সাতিশয় প্রীত হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে তিনি বংশীবাদককে নিকটে আনয়ন করিতে লোক পাঠাইলেন। রাজার আজ্ঞায় যতিবেশধারী বংশীবাদক যথাস্থলে উপনীত হইলেন। তখন মহারাজ অশোক বিস্ময়সহকারে দেখিলেন, বংশীবাদক তাঁহার প্রিয়তম তনয় কুনাল অন্ধ। অশোক কুনালের এই অবস্থা দেখিয়া অধীর হইলেন। কুনালকে ঈদৃশ অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কুনাল কিছুই বলিলেন না। পরে অশোক অন্যত্র সমুদয় বিবরণ শুনিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া নীচাশয় ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি মহিষীর শিরচ্ছেদের জন্য তরবারি গ্রহণ করিলেন। কুনাল পিতাকে ঈদৃশ ভয়ঙ্কর কার্য্যসাধনে সমুদ্যত দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বুদ্ধের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

অশোক বিন্দুসারের জীবদ্দশায় কিয়ৎকাল উজ্জয়িনী রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি অনেক স্থলে পরিভ্রমণ করেন। ভ্রমণ সময়ে একদা দেবী নামে একটি পরমসুন্দরী রাজবালার প্রণয়-পাশে বদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই দেবীর গর্ভে একটী পুত্র ও

একটি কন্যার জন্ম হয়। পুত্রের নাম মহেন্দ্র এবং কন্যার নাম সঙ্ঘমিত্রা। ইহারা উভয়েই তরুণ বয়সে সিংহল দ্বীপে যাইয়া তত্রত্য রাজাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

অশোক পাটলীপুত্রের সিংহাসন গ্রহণ করিবার সময় যেরূপ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বনের পর তাঁহার তাদৃশ নির্দ্দয়তার নিদর্শন লক্ষিত হয় না। অশোক যখন সুসীম প্রভৃতিকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন, সেই সময়ে সুসীমের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি আকস্মিক বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় চণ্ডাল-পল্লীতে যাইয়া একজন চণ্ডালের আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানে তাঁহার একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। অশোক এই সন্তানের জীবনের সম্বন্ধে কোনরূপ অনিষ্ট করেন নাই। কথিত আছে, সুসীম-তনয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক যতিবেশে নানাস্থান পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হন।

কথিত আছে, নূতন ধর্ম্মের প্রতি অশোকের আন্তরিক যত্ন ও প্রগাঢ় আস্থা দর্শনে কতিপয় তীর্থক অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীতশোককে বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে নিষেধ করেন। অশোক ভ্রাতাকে আপনার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে যথাশক্তি চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃত-কার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহার অমাত্য এই কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং রাজ্য দিবার লোভ দেখাইয়া বীতশোককে বৌদ্ধ ধর্ম্মে আনয়ন করিলেন। অমাত্য বীতশোককে যথাবিধানে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে কাতর হইলেন না। কিন্তু এই কার্য্যে অশোকের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বীতশোকের শিরশ্ছেদ করিতে আদেশ প্রচার করিলেন। এই সময়ে তাঁহার অমাত্য বহু চেষ্টা করিয়া বীতশোককে এক সপ্তাহের জন্য আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। এই এক সপ্তাহ পরে বীতশোক উপগুপ্তের আশ্রয়প্রার্থী হন, এবং তদীয় শিষ্য গুণাকরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহশূন্য পরিব্রাজকত্ব অবলম্বন করেন।

বীতশোক এইরূপ পরিব্রাজক হইয়াও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন না। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মদ্বেষী এক সন্ন্যাসী আপনার প্রতিকৃতির পাদমূলে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া সেই আলেখ্য সমুদয় স্থানে প্রচার করেন। অশোক এই বিষয় শুনিয়া সেই ধর্ম্মদ্বেষ্টা চিত্রকরের মস্তকের জন্য একটী বিশেষ পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হন। অচিরাৎ এই প্রতিশ্রুতির বিষয় চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। এক জন গোরক্ষক এই সংবাদ শুনিয়াছিল, সে একদা জটাচীরধারী দীর্ঘশ্মশ্রু, অখণ্ডিতনখ, বীত-শোককে দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষ্টা সেই সন্ন্যাসী জ্ঞানে রাত্রিকালে তাঁহার শিরশ্ছেদ করে, এবং নির্দ্দিষ্ট পারিতোষিক লাভের আশায় সেই ছিন্ন মস্তক অশোকের নিকট লইয়া যায়। অশোক স্নেহাস্পদ ভ্রাতার মস্তক দেখিয়া, সাতিশয় শোকাতুর হইয়া বহুক্ষণ বিলাপ করেন, এবং এই নির্দ্দয়তা ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য তাঁহার ধর্ম্মোপদেষ্টা উপগুপ্তের পাদমূলে পতিত হন। এই কাহিনী কতদূর সত্য, নির্দ্দেশ করা যায় না। বোধ হয় বীতশোক বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করাতে অশোকের সহিত তাঁহার অপ্রণয় সংঘটিত হইয়াছিল। তাহা হইতেই এই কিংবদন্তী বদ্ধমূল হইয়াছে।

অশোক ৩৭ বৎসর কাল রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকগত হন। প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁহার আধিপত্য প্রসারিত হইয়াছিল। নর্ম্মদা হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে, বিহার ও বঙ্গের শ্যামল ক্ষেত্রে, পঞ্জাব ও আফগানিস্তানের পার্ব্বত্য প্রদেশে তাঁহার বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। অশোকের নামান্তর প্রিয়দর্শী। ইনি বিক্রমাদিত্য সংবতের ২০৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের অধীশ্বর হন, এবং বুদ্ধের মৃত্যুর ২০২ বৎসর পরে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন।

অশোকের মৃত্যুর পর তাঁয় তনয়গণ তাঁহার সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লন। কুনাল পঞ্জাবের আধিপত্য গ্রহণ করেন। এই কুনালই ধর্ম্মবর্দ্ধন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় রাজকুমার জনোক কাশ্মীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, এবং তৃতীয় পুত্র পাটলীপুত্রের শাসন-দণ্ড গ্রহণ করেন।

ভারতে গ্রীক।

গ্রীকদিগের মধ্যে প্রথমে মাকিদমের অধিপতি মহাবীর সেকন্দর শাহ ভারতে প্রবেশ করিয়া বেদ-কীর্ত্তিত পবিত্র পঞ্চনদে জয়-পতাকা স্থাপন করেন। পূর্ব্বে পারস্য দেশের রাজারা বড় পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে গ্রীক রাজ্য আক্রমণ করিতেন। বুদ্ধের জীব-দ্দশায় অন্যতম পারসীক রাজা দরায়ুস হস্তাস্প একবার সিন্ধু নদ পার হইয়া ভারতবর্ষের কয়েকটী জনপদ অধিকার করেন। কালে পারস্য রাজ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা হইলে সেকন্দর উহা অধিকার করিয়া গ্রীষ্টের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে উপনীত হন, এবং আটকের উজানে সিন্ধু নদ পার হইয়া বিনা যুদ্ধে বিনা বিধায় তক্ষশিলা দিয়া বিতস্তার নিকটে আইসেন। এস্থলে বলা উচিত যে, তক নামে তুরেণীয় জাতি হইতে এই নগরের নাম "তক্ষশিলা" হয়। এই জাতি রাবলপিণ্ডীর আদিম নিবাসী। এ সময়ে তক্ষশিলা সমৃদ্ধ ও জনপূর্ণ ছিল। যাহা হউক, সেকন্দর আসিয়া দেখিলেন, পঞ্জাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এই সকল খণ্ডরাজ্যের মধ্যে একতা নাই, রাজারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিযুক্ত, অনেক তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইয়া তাঁহার সাহায্যে উদ্যত। কিন্তু সেকন্দর প্রতিদ্বন্দ্বি-শূন্য হইলেন না। পুরু নামে এই খণ্ড-রাজ্যের এক জন রাজা ত্রিশ হাজার পদাতি, চারি হাজার অশ্বরোহী, তিন শত যুদ্ধরথ ও দুই শত হস্তী লইয়া সেকন্দরের বিরুদ্ধে বিতস্তার নিকট উপনীত হইলেন। যে চিনিয়ালওয়ালায় শিখগণ ইঙ্গরেজদিগকে পরাজিত করিয়াছিল, তাহারই প্রায় ১৪ ক্রোশ

পশ্চিমে সেকন্দরের সহিত পুরুর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সেকন্দর বিজয়ী হন। কিন্তু তিনি বিজয়-গৌরবে স্ফীত হইয়া বিজিতের প্রতি কোন রূপ অসম্মান দেখান নাই। সেকন্দর প্রতিদ্বন্দ্বীর অসাধারণ সাহস, পরাক্রম ও দেশ-হিতৈষিতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। পুরু এইরূপে আপনার বিজেতার একজন বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়া উঠেন। সেকন্দর আপনার জয়লাভের স্মরণ-সূচক দুটী নগর প্রতিষ্ঠা করেন। একটীর নাম বুকফল। সেকন্দরের প্রিয়তম বাহন বুকফল যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, তাহার নাম অনুসারে এই নগরের নাম হয়। ইহা বিতস্তার পশ্চিম পারে বর্ত্তমান জলালপুরের নিকট অবস্থিত ছিল। আর একটীর নাম নিকেয়া, বিতস্তার পূর্ব্ব পারে। অধুনা এই স্থান মঙ্ নামে কথিত হইয়া থাকে।

ইহার পর সেকন্দর অমৃতসর দিয়া বিপাশার তটে উপনীত হন। শিখ ও ইঙ্‌রেজদিগের যুদ্ধক্ষেত্র সোব্রাঁওর নিকটে তাঁহার জয়শ্রী-সম্পন্ন সৈন্য আপনাদের জয়-পতাকা উড্ডীন করে। সেকন্দর পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া গঙ্গার তটে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এজন্য তাঁহারা অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। সেকন্দর ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তিনি দক্ষিণ পঞ্জাবে আলেকজেন্দ্রিয়া, এবং সিন্ধুদেশে পটল নামে নগর স্থাপন করেন। আলেকজেন্দ্রিয়া এখন উচ্ নামে প্রসিদ্ধ। পটল সিন্ধুর বর্ত্তমান রাজধানী হয়দরাবাদ।

সেকন্দর শাহ পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহার মধ্যে তিনি কোন প্রদেশ আপনার অধীন করেন নাই। পরাজিত রাজার সহিত মিত্রতা স্থাপন, অভিনব নগর প্রতিষ্ঠা এবং তৎসমুদয়ে গ্রীক্ সৈন্যের সন্নিবেশ-কার্য্যেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। আফগানিস্তানের সীমান্তভাগ হইতে বিপাশা পর্য্যন্ত এবং হিমালয়ের পাদদেশ হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত ভূভাগ তাঁহার বিজয়-চিহ্নে অঙ্কিত ছিল। তিনি অনেক রাজ্য আপনার সাহায্যকারী সামন্ত-

দিগকে দান করেন। উত্তর পঞ্জাবের আলেকজেন্দ্রিয়াতে এবং সিন্ধুর পটলে গ্রীকদিগের অথবা বন্ধু রাজগণের সেনা-নিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদ্ব্যতীত বাক্ত্রিয়াতে (বলখ্) অনেকগুলি সৈন্য অবস্থান করে। সেকন্দরের মৃত্যুর পর তদীয় সাম্রাজ্যের ভাগ সময়ে সেলুকস্ নিকেতব নামে গ্রীক সেনাপতি এই বাক্ত্রিয়া এবং ভারতবর্ষের অংশ প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে গঙ্গার তটে একটী অভিনব রাজ-শক্তি সমুত্থিত হয়। আপনার জন্য কোন রাজ্য লইবার অথবা আপনার কোন শত্রুকে নির্জ্জিত করিবার ইচ্ছা করিয়া, যে সকল সাহসী ও সমর-পটু ভারতীয় বীর সেকন্দর শাহের শিবিরে উপস্থিত হন, তাঁহাদের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত নামে এক ব্যক্তি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বুদ্ধের সমকালে রাজগৃহ মগধের রাজধানী ছিল। কিন্তু অজাতশত্রু রাজগৃহ ছাড়িয়া পাটলীপুত্র নগর স্থাপন করেন। এই অবধি পাটলীপুত্র মগধের রাজধানী হয়। সেকন্দরের সমকালে নন্দ-বংশীয় শূদ্র রাজারা পাটলী পুত্রে রাজত্ব করিতে ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত এই বংশের এক জন রাজার মুরা নামে একটী দাসীর পুত্র। এজন্য তিনি মৌর্য্যবংশীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। চন্দ্রগুপ্ত পরিশ্রান্ত গ্রীকদিগকে গঙ্গার প্রসন্ন-সলিল-বিধৌত শস্য-সম্পত্তি-পূর্ণ শ্যামল ভূখণ্ডে আসিতে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রীকেরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। চন্দ্রগুপ্ত ইহাতে নিশ্চেষ্ট থাকিলেন না। আপনার বাহুবল ইহার উপর চাণক্যের মন্ত্র-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া মগধ অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এ সময়ে বসুন্ধরা বীর-ভোগ্যা ছিল। এক জন সাহসে, বীরত্বে ও মন্ত্র-শক্তিতে প্রবল হইল অপরের সিংহাসন অধিকার করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত ক্রমে প্রবল হইয়া, আপনার অভীষ্ট মন্ত্র সাধনে উদ্যত হইলেন। অনার্য্যেরা আর্য্য-ধর্ম্মের অনুমোদিত আচার ব্যবহারের পক্ষপাতী হইলেও ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের ন্যায় দ্বিজ বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই। তাহাদের একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়াছিল। তাহারা যে নীচ বংশ-সম্ভূত,

বিজেতা আর্য্যদের অনুকম্পা বলে যে, তাহাদের অবস্থা কিয়দংশে উন্নত হইয়াছে, ইহা এ সময়েও তাহাদের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। এদিকে অপেক্ষাকৃত দাম্ভিক ও উদ্ধত আর্য্যদের নিকট তাহারা সময়ে সময়ে নিগৃহীত হইত। এই সকল আর্য্য তাহাদের বংশের হীনতা ও তাহাদের পূর্ব্বতন অসভ্যতার উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিতেন। সুতরাং শূদ্রেরা যে কোন উপায়েই হউক, আপনাদের প্রাধান্য ও দ্বিজাতির উপর আপনাদের ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টায় ছিল। যখন মহামতি শাক্যসিংহ সাম্যের মহিমা ঘোষণা করিয়া ব্রহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী ইতর, সকলকে এক সমভূমিতে একত্র করিবার চেষ্টা করেন, তখন শূদ্রেরা আশ্বস্ত হইয়া সুসময়ের প্রতীক্ষায় থাকে। ইহার পর অনার্য্য-বংশ সম্ভূত চন্দ্রগুপ্ত যখন স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার ইচ্ছা করেন, তখন অনেকে তাঁহার সাহায্যে অগ্রসর হয়। চন্দ্রগুপ্ত অবিলম্বে পাটলীপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন, এবং নন্দবংশের ধ্বংশাবশেষে আপনার গৌরবের মহিমায় সকলের শ্রদ্ধাস্পদ হন। এই চন্দ্রগুপ্ত মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি সমুদয় উত্তর ভারতবর্ষ আপনার অধীনে আনিয়াছিলেন। পঞ্জাব হইতে তাম্রলিপ্ত (তমোলুক) পর্য্যন্ত তাঁহার জয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। পূর্ব্বতন রাজগণ পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেই আপনাকে "মহারাজ চক্রবর্ত্তী" বলিয়া ঘোষণা করিতেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত আপনার বাহুবলে সমুদয় প্রদেশ অধিকার পূর্ব্বক এই গৌরব-সূচক উপাধি লাভ করেন। যে শূদ্রদিগকে আর্য্যেরা দাস বলিয়া ঘৃণা করিতেন, তাঁহারাই এক্ষণে ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট্ হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তি সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নাম তাঁহাদের শ্রেণীতে নিবেশিত হইবার যোগ্য। চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের আর কোন রাজা সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া ইতিহাসের নিকট সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই।

সেলুকস খ্রীষ্টাব্দের ৩১২ হইতে ২৮০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সিরিয়ার রাজত্ব করেন। চন্দ্রগুপ্ত খ্রীষ্টাব্দের ৩১৬ হইতে ২৯২ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মগধসাম্রাজ্য শাসন করেন। সেকন্দরের মৃত্যুর পর সেলুকস যখন আপনার রাজ্যের শৃঙ্খলা বিধান করিতেছিলেন, তখন চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব পর্য্যন্ত আপনার অধিকার প্রসারিত করেন। এই উভয়ের রাজ-শক্তি যখন বদ্ধমূল হয়, তখন উভয়ে আত্ম-প্রাধান্য দেখাইবার জন্য যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উভয়ের সম্মুখীন হন। এ যুদ্ধে সেলুকসের পরাজয় হয়। পরাক্রান্ত সেকন্দর শাহ পুরুকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার সহিত মিত্রতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, সেকন্দরের সেনাপতি পরাক্রান্ত সেলুকস চন্দ্রগুপ্তের নিকট পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রিয়তম বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত অনুদার-প্রকৃতি ছিলেন না। তিনি এই বীরত্ব-লব্ধ বন্ধুতার গৌরব হরণ করিলেন না, সেলুকস্‌কে আদর-সহকারে গ্রহণ করিয়া পাঁচ শত হস্তী উপহার দিলেন। এদিকে সেলুকস পঞ্জাব-স্থিত গ্রীক অধিকারের সহিত আপনার প্রিয়তম দুহিতাকে চন্দ্রগুপ্তের হস্তে সমর্পণ করিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সহিত গ্রীক কুমারীর পরিণয় হইল। সেলুকস জামাতার সভায় একজন দূত রাখিলেন। এই দূতের নাম মেগাস্থিনিস্। ইনি খ্রীষ্টের জন্মের অনুমান ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে পাটলীপুত্রে ছিলেন।

এই মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি যদিও ভ্রমপ্রমাদের হাত এড়াইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার বিবরণ মনোযোগের সহিত পড়িলে প্রাচীন ভারতবর্ষের অবস্থা অনেক পরিমাণে জানিতে পারা যায়। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অনুসারে পাটলীপুত্র গঙ্গা ও শোণের সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে আট মাইল ও বিস্তারে দেড় মাইল। নগরের চারি দিক গড়খাই করা। গড়ের বিস্তার ৪০০ হাত এবং গভীরতা ৩০ হাত। গড়ের পর আবার একটী কাষ্ঠময় প্রাচীর। প্রাচীরে ৬৪টী তোরণ ও ৭৫০টী বুরুজ দেখা যাইত। বাণ-নিক্ষেপের জন্য প্রাচীরের স্থানে স্থানে ছিদ্র ছিল।

ভারতবর্ষ ১১৮টী রাজ্যে বিভক্ত। প্রতি রাজ্যে অনেকগুলি নগর ছিল। যে সকল নগর নদী-তটে বা সাগরের উপকূলে অবস্থিত, তৎসমুদয় প্রায় কাষ্ঠ-নির্ম্মিত, আর যে গুলি পাহাড় বা উচ্চস্থলে অবস্থিত, সে গুলি ইষ্টক বা মৃত্তিকায় প্রস্তুত হইত। ভারতবর্ষীয়েরা নিম্নলিখিত সাত শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—

১ম শ্রেণী। তত্ত্ববিৎ।—ইহাঁরা সকল সম্প্রদায়ের মান্য এবং যাগযজ্ঞে লোকের সাহায্য-দাতা। বৎসরের প্রারম্ভে ইহাঁরা একবার রাজসভায় আহূত হইতেন। কেহ দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি বা মারীভয় প্রভৃতিতে সাধারণের উপকার সাধন উদ্দেশে কোন উপায় আবিষ্কার করিয়া থাকিলে তাহা এই সময় সর্ব্বজন-সমক্ষে প্রকাশ করিতেন। রাজা পূর্ব্বে এই সকল বিষয় জানিয়া বিপন্নিবারণে যত্নশীল হইতেন। এসম্বন্ধে যদি কেহ তিন বার মিথ্যা বিবরণ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাহাকে যাবজ্জীবন মৌনী হইয়া থাকিতে হইত, আর যিনি প্রামাণিক কথা প্রকাশ করিতেন, তিনি কর-ভার হইতে বিমুক্ত হইতেন। তত্ত্ববিদ্গণ দুই দলে বিভক্ত—ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ। ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণগণেরই সম্মান অধিক। ইহাঁরা বাল্যকাল হইতেই নগরের বহিঃস্থ উপবনে বাস করিয়া উপযুক্ত গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন। ইহাঁদিগকে মাংসাহার ও সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে বিরত থাকিতে হইত। ইহাঁরা মিতাচার অবলম্বনপূর্ব্বক কুশাসন বা মৃগচর্ম্মের শয্যায় শয়ন করিতেন, সাইত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এইরূপে থাকিয়া ইহাঁরা গৃহস্থ হইতেন। তখন ইহাঁরা কার্পাস বস্ত্র পরিধান, স্বর্ণাভরণ ধারণ ও মাংসাহার করিতেন, এবং বহুসন্তান কামনায় বহু নারীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতেন।

শ্রমণেরা দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। এক দল বনে বাস করিতেন। আরণ্য বৃক্ষের পত্র ও ফল ইহাঁদের প্রধান খাদ্য এবং আরণ্য বৃক্ষের বল্কল ইহাঁদের পরিধেয় ছিল। কোন বিষয় জানিতে হইলে রাজারা ইহাঁদের নিকট দূত পাঠাইতেন। অপর দল, ভিষক্।

ইহাঁরা যদিও লোকালয়ে বাস করিতেন, তথাপি মিতাচারী ছিলেন, সাধারণতঃ ভাত বা যবের মণ্ড খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। ইহাঁদের ঔষধ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। ইহাঁরা তৈল ও প্রলেপকে শ্রেষ্ঠ ঔষধ জ্ঞান করিতেন। ইহাঁদের পথ্যের ব্যবস্থায় রোগের উপশম হইত।

২য় শ্রেণী। কৃষক।—দেশের অধিকংশ লোক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা ধীর, নম্র-স্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত। ইহাদিগকে আর কোন কাজ করিতে হইত না। ইহারা সকল সময়েই নিরাপদে কৃষি-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। এরূপ দেখা যাইত যে, উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, তাহারই নিকট কৃষকগণ অবাধে ভূমি কর্ষণ করিতেছে। কৃষকেরা আপনাদের স্ত্রী পুত্রের সহিত গ্রামে বাস করিত, কখনও নগরে যাইত না। সৈন্যেরা ইহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিত। প্রায় সমস্ত জনপদই শস্য-সম্পত্তি-শোভিত ক্ষেত্রে পরিবেষ্টিত ছিল। রাজাই ভূমির অধিস্বামী ছিলেন। কৃষকেরা উৎপন্ন দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ পাইত। এইরূপে প্রতিবৎসর অনেক শস্য রাজকীয় ভাণ্ডারে জমা হইত। ইহার কতক অংশ ব্যবসায়ীরা কিনিয়া লইত এবং কতক অংশ রাজ-কর্ম্মচারী ও সৈন্যগণের ভরণপোষণ এবং ভবিষ্য দুর্ভিক্ষাদির নিবারণ জন্য রাখা হইত।

৩য় শ্রেণী। পশু-পালক ও শিকারী।—পশু-পালন, পশু-বিক্রয় ও শিকার ইহাদের উপজীবিকা। ইহারা হিংস্র পশু সমূহের হত্যায় নিযুক্ত থাকিত, এবং শস্যের অনিষ্টকারী বিহঙ্গ-কুল বিনষ্ট করিয়া কৃষকের উপকার করিত। নগরে বা পল্লীতে ইহাদের নির্দ্দিষ্ট বাস-গৃহ ছিল না। ইহারা প্রায়ই এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইত। এজন্য ইহারা তাম্বুতে বাস করিত।

৪র্থ শ্রেণী। শিল্পকর।—ইহাদের কেহ যুদ্ধের জন্য অস্ত্র শস্ত্র ও বর্ম্ম, কেহ কৃষি-কার্য্যের জন্য যন্ত্র এবং কেহ অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত করিত। কোন কোন শিল্পকরকে কর দিতে হইত, কিন্তু যাহারা

রাজার জন্য জাহাজ ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত করিত, তাহারা রাজকোষ হইতে আপনাদের ভরণ পোষণের খরচ পাইত। প্রয়োজন অনুসারে বণিকরা রাজকীয় তরীর অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিয়া, এই সকল জাহাজ ভাড়া করিয়া লইত।

৫ম শ্রেণী। যোদ্ধা।—ইহারা সুশিক্ষিত ও যুদ্ধ-কুশল ছিল। সংখ্যায় ইহারা কেবল কৃষকদিগের নীচেই স্থান পাইত। শান্তির সময় ইহাদের কোন কাজ থাকিত না। তখন ইহারা কেবল আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইত। সমস্ত সৈন্যের ভরণ পোষণ এবং যুদ্ধোপ-করণ সংরক্ষণের ব্যয় রাজা নির্ব্বাহ করিতেন।

৬ষ্ঠ শ্রেণী। চর।—ইহারা রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে, তাহা রাজাকে,—যেখানে রাজা নাই, সেখানে প্রধান শান্তিরক্ষককে জানাইত।

৭ম শ্রেণী। মন্ত্রী।—ইহারা সংখ্যায় অতি অল্প, কিন্তু চরিত্র-গুণ ও অভিজ্ঞতায় অপরাপর শ্রেণীর লোক অপেক্ষা সম্মানিত। রাজার পরামর্শ-দাতা, কোষাধ্যক্ষ ও বিচারপতি এই শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রধান মাজিষ্ট্রেট্ এবং সেনাপতিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

এক শ্রেণীর লোকের সহিত অন্য শ্রেণীর লোকের বিবাহ হইত না, কিংবা এক শ্রেণীভুক্ত লোকের ব্যবসায় অন্য শ্রেণীভুক্ত লোক অবলম্বন করিত না। কেবল যে সে শ্রেণীর লোক তত্ত্ববিৎ হইতে পারিত। লোকে ধুতি পরিত এবং একখানি উত্তরীয়ের কিয়দংশ মাথায় জড়াইয়া কাঁধে ফেলিয়া দিত। কিন্তু যাঁহারা সৌখীন ও বেশভূষা-প্রিয়, তাঁহারা স্বর্ণ-খচিত সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতেন। কোন স্থানে যাইবার সময় অনুচরগণ তাঁহাদের মস্তকের উপর ছত্র ধরিত। রুচিভেদে লোকে আপনাদের দাড়ী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করিত। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সকলেই ছাতা ব্যবহার করিত, এবং শ্বেতচর্ম্মের পাদুকা পায়ে দিত। রাজকীয় কার্য্য-প্রণালী সুশৃঙ্খল ছিল। কর্ম্মচারিগণের মধ্যে এক এক শ্রেণীর লোক এক এক বিষয় সম্পন্ন করিতেন। দেশের লোকে মিতাচারী

ছিল। ইহারা যজ্ঞ ভিন্ন মদ্য পান করিত না। সত্য ও ধর্ম্মের সম্মান করিত। ইহাদের মধ্যে চৌর্য্য প্রায় হইত না। চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে চারি লক্ষ লোক থাকিত, কিন্তু তথায় প্রতি দিন দেড় শত টাকার অধিক চুরি হইত না। লোকের সম্পত্তি অরক্ষিত অবস্থাতেই থাকিত। লোকে উচ্ছৃঙ্খল দলের মধ্যে থাকিত না, কদাচিৎ মামলা মোকদ্দমা করিতে অগ্রসর হইত না। ইহারা প্রায়ই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া গুরুতর কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিত। দণ্ডবিধি বড় ভয়ঙ্কর ছিল। কেহ কোন গুরুতর অপরাধ করিলে তাহার হস্ত পদাদি ছেদন করা হইত। পল্লীসমাজ প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। গ্রামের মণ্ডল পল্লী-সমাজে আধিপত্য করিতেন। ভূমি মাপকরণ, গ্রামের লোকের মধ্যে বিচার, কৃষিক্ষেত্রে যথোপযুক্ত জল-সেচন, করসংগ্রহ, ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধাকরণ, পথের সংস্কার এবং সীমা স্থির করণের ভার ইহাঁর উপর সমর্পিত থাকিত। ভূমি শস্যশালিনী ছিল। বৎসরে দুই বার শস্য কাটা হইত। সুখাদ্য ফলও প্রচুর পরিমাণে জন্মিত। পথের দূরত্ব-জ্ঞাপক প্রস্তর-কীলক সকল স্থানে স্থানে প্রোথিত থাকিত। সাধারণ লোকে অশ্বে, উষ্ট্রে ও গর্দ্দভে চড়িত। রাজা ও ধনশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কেবল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহন হস্তীতে আরোহণ করিতেন। সৈন্যেরা সাধারণতঃ ধনুর্ব্বাণ, ঢাল, বর্শা ও খড়্গ ব্যবহার করিত। পদাতিকের এক হস্তে ধনুর্ব্বাণ, আর এক হস্তে গোচর্ম্মের ঢাল থাকিত। ধনুক প্রায় মানুষের সমান এবং প্রায় তিন গজ লম্বা ছিল। যোদ্ধারা এই ধনুক মাটিতে রাখিয়া বাম পদ দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া, বাণ নিক্ষেপ করিত। অসি লম্বায় তিন হাতের অধিক হইত না। শত্রু-পক্ষ অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইলে, যোদ্ধারা দুই হাতে অসি চালাইত। যুদ্ধ-রথে সারথী ব্যতীত দুই জন রথী এবং রণ-মাতঙ্গে মাহুত ব্যতীত তিন জন যোদ্ধা থাকিতে। উৎসবের সময় স্বর্ণ রৌপ্য-বিভূষিত হস্তী, শকট-সংযোজিত সুসজ্জিত অশ্ব ও বলদ, এবং সুশিক্ষিত সেনা ধীরে ধীরে চলিত। লোকে রত্ন-খচিত পাত্র, সুশোভন সিংহাসন ও বিচিত্র

বস্ত্রাদি বহন করিত। পোষিত সিংহ, ব্যাঘ্রও সঙ্গে সঙ্গে যাইত এবং সুকণ্ঠ ও সুদৃশ্য বিহঙ্গ-শোভিত বৃক্ষ সকল বৃহৎ বৃহৎ শকটে চালিত হইত। কন্যা বিবাহ-যোগ্য বয়সে পদার্পণ ককিলে পিতা কোন কোন সময়ে তাহাকে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন; যে কেহ শক্তি প্রকাশ করিয়া কোন বিষয়ে জয় লাভ করিতে পারিতেন, তিনিই কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। কোন স্থানে দাসত্ব-বন্ধন ছিল না। স্ত্রীলোকেরা সতীত্ব-গৌরবে উন্নতা ছিল। রাজা দিবসে নিদ্রা যাইতেন না। বিচার-গৃহে থাকিয়া সমস্ত দিন বিচার করিতেন। রাত্রিতে তিনি এক শয্যায় শুইতেন না। ষড়যন্ত্রের আশঙ্কায় সময়ে সময়ে শয্যা পরিবর্ত্তন করিতেন। অস্ত্র-ধারিণী মহিলারা কেহ রথে, কেহ অশ্বে, কেহ হস্তীতে আরোহণ করিয়া, মৃগয়ার সময় রাজার সঙ্গে সঙ্গে যাইত।

খৃষ্টাব্দের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয়দিগের সাধারণ অবস্থা কেমন ছিল, তাহা মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণে জানা যাইতেছে। গার্হস্থ্য আশ্রমের পর যে, বাণ-প্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হয়, মেগাস্থিনিস বোধ হয়, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। দ্বিতীয়ত, মেগাস্থিনিস যে সাত শ্রেণীর লোকের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা পৃথক্ পৃথক্ সাত জাতি নহে; এই সকল লোক অবলম্বিত কার্য্যে-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে নিবেশিত হইয়াছিল। চর ও মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ-জাতীয়। কার্য্য-ভেদে ইহাঁদের শ্রেণী বিভিন্ন হইয়াছে। কিন্তু জাতিতে ইহাঁরা বিভিন্ন নহেন। ইহার পর মেগাস্থিনিস্ তত্ত্ববিৎ হওয়ার সম্বন্ধে যাহা কহিয়াছেন, তাহা প্রমাদ-দূষিত বোধ হয়। যে সে লোক শ্রমণ হইতে পারিত দেখিয়া, তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, সকল শ্রেণীর লোকেই তত্ত্ববিৎ হইতে পারে। কিন্তু জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণেরা যে, অপর লোককে আপনাদের শ্রেণীতে গ্রহণ করেন না, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। এই কয়েকটী অনবধানতার বিষয় ছাড়িয়া দিলে দেখা যায়, খৃষ্টাব্দের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মনুর

ব্যবস্থা অনুসারেই সমাজের কার্য্য চলিতে ছিল। ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও মন্ত্রিত্ব করিতেন। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ছিলেন। বৈশ্যেরা শিল্প ও কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। অপেক্ষাকৃত ইতর শ্রেণীর লোকেরা পশু-বিক্রয় প্রভৃতি কার্য্য করিত। কেবল শূদ্রেরা এ সময়ে মনুর ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়াছিল। তাহারা দাসত্বে নিযুক্ত ছিল না। মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষে দাসত্বের অভাব দেখিয়াছেন। শূদ্রেরা বৈশ্যদিগের ন্যায় শিল্প ও কৃষি-ব্যবসায়ী ছিল।

ভারতবর্ষ একচ্ছত্র ছিল না। যেহেতু মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষে ১১৮টী খণ্ড রাজ্য দেখিয়াছেন। কেবল চন্দ্রগুপ্ত আপনার ক্ষমতাবলে তাম্রলিপ্ত হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ড অধিকার পূর্ব্বক একটী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সমগ্র ভারতবর্ষ কোন সময়ে এক রাজার অধীন ছিল না, এবং কোন সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে একতা দেখা যায় নাই।

ঝিন্দন।

ঝিন্দন ভারতীয় ইতিহাস-পটের একখানি প্রধান চিত্র। প্রধান চিত্র বলিয়াই অদ্যাপি বৈদেশিক সমালোচকগণ ইহা লইয়া কৌতুকপ্রিয় জনগণের সমক্ষে আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছেন। এই আস্ফালন যাহারা দেখিতেছে, অথবা লোকপরম্পরায় ইহার কাহিনী শুনিতেছে, তাহাদের কেহ অট্টহাস্যে করতালির ধ্বনিতে দশ দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে, কেহ ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া একটী অসহায় পতিত জাতির দেহে কলঙ্কের দুর্গন্ধপঙ্ক ঢালিয়া দিতেছে, কেহ দুঃসহ মর্ম্ম-বেদনায় অধীর হইয়া উদ্দেশে তর্জ্জনী সঞ্চালন করিতেছে, এবং কেহ বা নির্জ্জনে গম্ভীর ভাবে অতীত ঘটনা

পর্য্যালোচনা করিয়া দুঃখে, ক্ষোভে ও অভিমানে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। এই আস্ফালন বিচিত্র কি?

আমরা বলি এই আস্ফালন কিছু মাত্র বিচিত্র নহে। ইহা হৃদয়ের অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্ম অথবা প্রকৃতি-তরঙ্গিণীর অবশ্যম্ভাবী তরঙ্গ-লীলা। যখন যাহা পরিদৃশ্যমান সংসারের সমক্ষে আপনার প্রভাব বিস্তার করে, মানব-প্রকৃতি তখনই তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হয়, মানব-কল্পনা তখনই উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার অন্তর্গত ধর্ম্ম নানা বর্ণে রঞ্জিত করিতে থাকে। এই ধর্ম্ম অথবা এই কল্পনার বলে, সে হয়ত সমাজে পূজনীয় হইয়া অনেকের হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইবার অধিকারী হয়, অথবা হয়ত কলঙ্ক ও নিন্দার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া ধিক্কারের অদ্বিতীয় পাত্র হইয়া থাকে। বনান্ত-বিহারিণী বিহঙ্গী যখন মানবের অগম্য কাননে থাকিয়া অনন্ত নীলাকাশে মৃদুমধুর সঙ্গীত-সুধা বর্ষণ করে এবং আপনার সৌন্দর্য্য-মহিমায় আপনিই মুগ্ধ হইয়া শ্যামলতরুর শাখায় শাখায় নাচিয়া বেড়ায়, তখন কে তাহার বিষয় আলোচনা করে? কোন প্রাণি-বৃত্তান্তের প্রতি পত্র তাহার স্তুতি-গীতিতে পরিপূরিত হয়? কোন্ কঠোর সমালোচনার তীব্র বাণে তাহার অযত্ন-রক্ষিত সুন্দর দেহ ক্ষত বিক্ষত হইতে থাকে? কিন্তু এই বিহঙ্গী যখন লোক-লোচনের সম্মুখবর্ত্তিনী হয়, তখন ইহার সম্বন্ধে কত তুমুল আন্দোলন হইতে থাকে, বৈজ্ঞানিকের লেখনী ইহার বর্ণ, গুণ প্রভৃতির সম্বন্ধে কত বিষয় অজস্র সংগ্রহ করিয়া বিজ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকে। তখন কেহ এই বিহঙ্গীকে প্রাণ-বিযুক্ত করিয়া উৎকট স্বার্থপরতা চরিতার্থ করে। কেহবা বিরাগে বিতৃষ্ণায় ইহার কোমল-দেহ-বিচ্ছিন্ন কোমল পালক-রাশি দূরে নিক্ষেপ করিয়া আপনার অহঙ্কারের পরিচয় দিতে থাকে।

হিন্দুগণ যদি এই বনবিহারিণী বিহঙ্গীর ন্যায় আপনার মহিমায় আপনিই বিমুগ্ধ থাকিতেন; অথবা বিমুগ্ধ হইয়াই আপনার মহিমা

বিকাশ করিয়া আপনিই সুখী হইতেন তাহা হইলে তিনি কখন কাহারও বিষাক্ত বাণ বা প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলির লক্ষ্য হইতেন না। অনন্ত-প্রসারিত গগনতলে ক্ষুদ্র নক্ষত্র-বিন্দুর ন্যায় অথবা অনন্ত-বিস্তৃত জলধি-হৃদয়ে নগণ্য জল-বিম্বের ন্যায় তিনি নীরবে উত্থিত হইয়া নীরবেই বিলয় পাইতেন। কিন্তু ঝিন্দন এরূপ নীরবে সমুত্থিত হন নাই। অনেক বিস্ময়-স্তিমিত নেত্রে তাঁহার সমুত্থান চাহিয়া দেখিয়াছে; অনেক মন্ত্রণাপর রাজনীতিজ্ঞের হৃদয়ে তাঁহার সমুত্থান আশঙ্কা উৎপাদন করিয়াছে। ওয়াটর্লুর ভীষণ ক্ষেত্রে যাহারা টলে নাই, পলাশির শোণিত-স্রোত দর্শনে যাহারা বিচলিত হয় নাই, রাজনীতির রহস্য ধারণে যাহারা অসামর্থ্য প্রকাশ করে নাই, যাহারা বারিধি-বেষ্টিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে বাস করিয়া সমগ্র পৃথিবীর নিকট বীরত্ব ও রাজনীতিজ্ঞতার পূজা পাইয়া আসিয়াছে, ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া যাহাদের প্রভুশক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়াছে; ঝিন্দন তাহাদিগকেও নিস্তেজ বণিক্-প্রকৃতিক বলিয়া উপহাস করিতেন; তাহাদের বিভীষিকাও ঝিন্দনের তেজস্বি হৃদয়েরর কঠিন আবরণ ভেদ করিতে অসমর্থ হইত। এরূপ তেজস্বিনী ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ললনার চরিত্র লইয়া যে বৈদেশিক সমালোচকগণ আস্ফালন করিবেন; তাহা কিছু বিচিত্র নহে।

কিন্তু বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা এই, ঝিন্দন যাহাদের হৃদয়ে আঘাত দিয়াছেন, যাহাদিগকে বিকলাঙ্গ করিতে সাধ্যমত প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহারাই ঝিন্দনের চরিত্র-পটের চিত্রকর হইয়া সাধারণের সমক্ষে উপনীত হইয়াছে। সুতরাং এতৎ প্রসঙ্গে তাহাদের আস্ফালন আপনা হইতেই নিয়মিত সীমা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। মানব মন সহজেই দুর্ব্বল, সহজেই চঞ্চল ও সহজেই তারল্য-বিকাশক। ইহা ধীরতা ও বিবেকের অবলম্বনে না চলিলে এই অপরূপ সংসার প্রলয়-পয়োধির জলোচ্ছ্বাসে একবারে নিমগ্ন হইয়া যায়। পদ্মপত্রের উপর বারি-বিন্দু যতক্ষণ স্থির ভাবে থাকিতে পারে,

ততক্ষণ মন যদি ধীরতা ও বিবেক-বিহীন হয়, তাহা হইলে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি একবারে স্তম্ভিত হইয়া আইসে। এই কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অভাবে যদি অকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ঝিন্দনের চরিত্র অঙ্কনে নিঃসন্দেহ সেই অকার্য্যানুপাতের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।

চিত্রকর চিত্রের যথাযথ স্থলে যথাযথ বর্ণ প্রতিফলিত না করিলে চিত্রখানি যেরূপ কদাকার ও অশ্রদ্ধেয় হয়, বৈদেশিক চিত্রকরের হস্তে ঝিন্দনের চিত্রও ঠিক সেইরূপ কদাকার ও অশ্রদ্ধেয় হইয়াছে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যত কিছু কলঙ্ক, যত কিছু পঙ্কিল পদার্থ ও যত কিছু অস্পৃশ্য ঘৃণার্হ সামগ্রী আছে, চিত্রকর অম্লানবদনে, অসঙ্কুচিত হৃদয়ে, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া ঝিন্দনের চিত্র আঁকিয়াছেন। কলঙ্কই এই চিত্রের উপাদান এবং একটি নারীকে কলঙ্কিনী করিয়া তৎসংসৃষ্ট একটি প্রবল জাতির উপর সাধারণের বিরাগ উৎপাদনই এই চিত্রের উদ্দেশ্য। চিত্রকর এই উপাদান সঙ্কলনে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনে অনেকাংশে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহার সহিষ্ণুতা ও উদারতার বিশেষ প্রশংসা এই, তিনি এই সমস্ত কলঙ্কের ভারবহনে কিছুমাত্র কাতর হন নাই, ইহার উৎকট দুর্গন্ধে নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া কিছুমাত্র মুখ বিকৃত করেন নাই। সংসারবিরাগী পরমাত্মনিষ্ঠ পরমহংসের ন্যায় তিনি সকল প্রকার দুর্গন্ধময় দ্রব্যই আদরে অবিকার চিত্তে হস্তে করিয়া আপনার কার্য্য সাধন করিতেছেন। ইহাতে ঘৃণা, লজ্জা অথবা বিরাগ আসিয়া তাঁহার কার্য্যে বাধা জন্মায় নাই। এইরূপ ধীরে ধীরে কলঙ্কের রেখাপাত করাতে চিত্রের সকল স্থানই কলঙ্কময় হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কোনও স্থলে কমনীয়তার বিকাশ নাই, কোনও স্থলে সরলতার স্ফূর্ত্তি নাই, এবং কোনও স্থলে পবিত্র সৌন্দর্য্যের মদালস-বিভ্রম নাই। অবায়ু-সন্তাড়িত অপার জলধিতে যেমন একই নীলিমা ভাসিয়া বেড়ায়, নিষ্কম্প জলধর-পটলে আচ্ছাদিত গগনে যেমন একই কালিমা লীলা করে, এই চিত্রের প্রতি রেখাতে সেইরূপ একই কলঙ্ক বিকাশ পাইতেছে। শবাসনা, লোল-রসনা রুধিরাক্ত-দেহা দিগম্বরী ভৈরবীর মূর্ত্তিতে অথবা

রোমের বীর-চূড়ামণির প্রেম-ভিখারিণী মৈশরী রাজ-বালাতেও মাধুর্য্য ও পবিত্রতার আভাস সম্ভবে, কিন্তু এই চিত্রে অণুমাত্র মাধুর্য্য ও পবিত্রতার রেখাপাত সম্ভবে না। কালের করাল রাজ্যে তীব্র হলাহলময় যত নরক আছে, তৎসমুদয়ের প্রতিবিম্বই এই চিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। ঝিন্দনের ও ঝিন্দনসংস্পৃষ্ট জাতির সহিত যাহাদের সহানুভূতি নাই, ইহাদের অভ্যুদয়ে যাহাদের লাভের স্পৃহা নাই, তাহারা যে এই কলঙ্কময় চিত্রের কলঙ্কিনী আভা দেখিয়া ঘোরতর করতালি-ধ্বনির সহিত অট্টহাস্যে উপহাস করিবে, তাহাও কিছু বিচিত্র নহে।

কিন্তু বৈদেশিক চিত্রকরের সকলেই যে ভারতীয় ইতিহাস-পটে এই রূপ কালিমা বিস্তার করিয়াছেন, আমরা প্রাণান্তেও তাহা বলিব না। অনেক বৈদেশিক, ধীরতা ও বিবেকের মন্ত্রণায়, ঝিন্দনের সহিত বিলক্ষণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, এবং ন্যায়ের দিকে চাহিয়া ঝিন্দনের কার্য্য-কলাপের সমালোচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রতিভা-বলে পূর্ব্বোক্ত কালিমা অপসারিত হইয়া ঝিন্দনের চরিত্রে যথাযথ বর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা যদি একথা স্বীকার না করি, তাহা হইলে আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন ও অমানুষ-প্রকৃতি। দরিদ্র, নিপীড়িত ও অসহায় ভারতবর্ষ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত এই অপক্ষপাত পুরুষ-শ্রেষ্ঠদিগকে অভিবাদন করিতেছে।

কি কি পাপ-কার্য্য দেখাইয়া বৈদেশিকগণ ঝিন্দনকে কলঙ্কিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার কোনও উল্লেখ করিব না। ঝিন্দন ধীরে ধীরে যখন রাজাধিরাজ রণজিৎসিংহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, ধীরে ধীরে যখন রণজিতের সহধর্ম্মিণীরূপে পরিগৃহীত হইয়া আপনার ভবিষ্য ক্ষমতার রেখাপাত করেন, এবং ধীরে ধীরে যখন কোহিনুরের কান্তিতে বিভাসিত হইয়া লাহোরের দরবারে রাজনীতির পর্য্যালোচনা করেন, বৈদেশিকের নেত্রে তখন তাঁহার যেরূপ পাপীয়সী মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, সে মূর্ত্তি ধ্যান করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ইহার পর ঝিন্দন যখন স্বীয় নিয়তি-নেমির বহু-

বিধ আবর্ত্তনের পর কারাগার হইতে বিমুক্ত হইয়া বারিধি-বেষ্টিত অপ-রচিত ও অজ্ঞাত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, এবং এই স্থানে যখন অদৃষ্টলিপি তাঁহার জীবন-স্রোত কালের অনন্ত স্রোতে মিশাইয়া দেয়, তখনও ঝিন্দনকে দয়ার চক্ষে নিরীক্ষণ করা হয় নাই। অধিক কি, যে সকল পুরুষসিংহ আপনাদের অসাধারণ মহাপ্রাণতা ও অতুল্য বীরত্ব দেখাইয়া এক সময়ে সকলকে স্তম্ভিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সহৃদয়গণ আজ পর্য্যন্ত যাঁহাদের অপূর্ব্ব দেশ-হিতৈষিতার সম্মান রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কলঙ্কিনী ঝিন্দনের সংশ্রবে থাকাতে তাঁহারাও কলঙ্কী হইয়া ইতিহাসের পত্রে পত্রে লীলা-মর্কটের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। এই সমস্ত কলঙ্কের কাহিনী শুনিলেও কর্ণে হস্তা-র্পণ করিতে হয়। বৈদেশিকগণ এই পাপ, এই কলঙ্ক, এত স্তূপে স্তূপে সাজাইয়া রাখিয়াছেন যে, ভারতমহাসাগর শতবর্ষ পরিশ্রম করিয়াও ইহা প্রক্ষালিত করিতে পারিবে না, হিমালয় স্বীয় গগনস্পর্শী শৃঙ্গাবলী পাতিত করিয়াও ইহা ধূলি-রাশিতে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে না।

আমরা ঝিন্দনকে চিরকাল দয়ার চক্ষেই দেখিব; কঠোর আঘাতে কঠোর প্রহারে যে অবলার দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, তাহাকে আবার পদাঘাত করা যে মহাপাপ, চিরকাল তাহা আমরা মনে রাখিব। অবলা চির দিনই প্রীতির পুত্তলী। অবলা চির দিনই দয়ার পাত্র। ইহার পর যখন দেখিতেছি, বহুলোকে বহুদিক্ হইতে একটী অবলাকে ধরিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব তাড়না করিতেছে, অবাচ্য ভৎসনার সুতীক্ষ্ণ বাণে তাহার হৃদয়গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন করিতেছে এবং মৃত হইলেও নিরস্ত না হইয়া অকথ্য কলঙ্কের মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার পরলোকগত আত্মার তর্পণ করি-তেছে, তখন কে কোন্ প্রাণে সেই অবলার মৃত দেহে আঘাত দিতে উদ্যত হয়? কে কোন্ প্রাণে তাঁহার শত্রুদের উদ্ঘোষিত নিন্দাবাদের পুনরুদ্ঘোষণা করে? এই জন্যই আমরা দীর্ঘনিঃশ্বাস সহকারে বলি-তেছি, বৈদেশিক সমালোচকগণ ঝিন্দনের চরিত্রে যে যে কলঙ্কের

আরোপ করিয়াছেন, তাহার পুনরুল্লেখ করিয়া লেখনীকে কলঙ্কিত করিব না। এস্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ঝিন্দনের প্রতি যে যে দোষ আরোপিত হইয়াছে, তৎসমুদয় সত্য হইলে প্রকাশ করায় দোষ কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে, লোকে ঝিন্দনকে যে যে কলঙ্কে কলঙ্কিনী বলিতেছে, সে সকল প্রকৃত ঘটনার উপর স্থাপিত কি না, তাহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য। এই মীমাংসা একবারে অসাধ্য নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিগণ যে যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, সে সকল বিষয় উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা দৃঢ়তর হয় নাই। সুতরাং তাহার উপর সহজে বিশ্বাস স্থাপিত হইতে পারে না। এদিকে ঝিন্দনের যে অনন্যসাধারণ প্রভাব ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিগণ তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ঘটনাবলীর এইরূপ অসম্পূর্ণতায় একরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে, বিপক্ষ সম্প্রদায় কেবল বিষম অন্তর্দ্দাহে অধীর হইয়া ঝিন্দনকে সাধারণের নিকট অপদস্থ করিয়াছেন। সুতরাং আরোপিত দোষ প্রকাশ করিয়া ফল কি? হইতে পারে, ঝিন্দন অবলা-সুলভ কমনীয়তার বশীভূত হইয়া এক জনের প্রতি অধিক অনুগ্রহ দেখাইতেন, অথবা এক জনকে অধিক ভাল বাসিতেন; ন্যায়ের অনুরোধে আমরা ইহা অবশ্যই স্বীকার করি যে, পঞ্চনদের অধীশ্বরীর এইরূপ পক্ষপাতিত্ব দোষের মধ্যে গণনীয়। ইহার জন্য ঝিন্দনকে অপরাধিনী বলিতে আমরা সঙ্কুচিত নহি। কিন্তু "অপরাধিনী" বলিবার পূর্ব্বে একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিব। অনুগ্রহ প্রদর্শন ও ভালবাসা অবলা-হৃদয়ের অনিবার্য্য ধর্ম্ম। ঝিন্দন অবলা-হৃদয়ের অধিকারিণী হওয়াতেই এই অবলা-ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। বিচারক জগৎ ইহাতেও তাঁহাকে মার্জ্জনা করিল না। যাঁহারা জগতের সমক্ষে আপনার প্রভাব বিকাশ করেন, তাঁহাদের হৃদয়ের প্রতি স্তর এইরূপ কঠোরভাবেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে।

ঝিন্দনের শত অপরাধ থাকুক, কিন্তু তিনি পঞ্জাবে যেরূপে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ

করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নাম অনন্তকাল ইতিহাসের স্তুতিগীতিতে ঘোষিত হইবে। ঝিন্দন যখন আপনার অপূর্ব্ব প্রভাব ও অপূর্ব্ব প্রতি-ভা-বলে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন, তখন সমস্ত পঞ্চনদ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার লোকাতীত তেজোমহিমার নিকট মস্তক অবনত করিল। দরবারের অমাত্যগণ তখন তাঁহাকে তেজস্বী রণজিৎসিংহের উপযুক্ত তেজস্বিনী মহিষী বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে লাগিল, এবং রাজ্যের প্রজাগণ তখন তাঁহাকে রক্ষাকর্ত্রী মাতা বলিয়া ভক্তি করিতে লাগিল। এক্ষণে আমরা ঝিন্দ-নের এই তেজস্বিতা এবং প্রজাসাধারণের এই ভক্তি ও শ্রদ্ধার বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

দলীপ সিংহ যখন পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন হইতেই ঝিন্দনের ক্ষমতার বিকাশ হইতে থাকে। ঝিন্দন এত দিন খনির অন্ধকারময় গর্ভে থাকিয়া আপনার প্রভায় আপনিই দীপ্তি পাই-তেছিলেন, এখন খনির গর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সেই দীপ্তি বিস্তার করিতে লাগিলেন। রণজিৎসিংহের পরলোক প্রাপ্তির পর পঞ্জাব রাজ্য যেরূপ অন্তর্বিদ্রোহের ভয়াবহ তরঙ্গে আন্দোলিত হয়,তাহা ইতিহাস-প্রিয় পাঠকগণ সবিশেষ অবগত আছেন। দলীপসিংহ এই সময়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক, সুতরাং রাজ্য-সংক্রান্ত কোন কার্য্যেই তাঁহার হাত ছিল না। ঝিন্দন এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে লাহোরের সিংহাসনে সমাসীন হইয়া রাজ্যের সুব্যবস্থা করিতে যত্ন করেন। তিনি প্রতিদিনই নিয়-মিত সময়ে দরবারে উপস্থিত হইয়া রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন, এবং প্রতিদিনই স্বীয় শিশু পুত্রের রাজ্য নিষ্কণ্টক ও নিরুপদ্রব করিবার জন্য রাজনীতির গূঢ়তম মর্ম্ম উদ্ভেদ করিয়া সকলকে বিস্মিত করি-তেন। যে দুই প্রতিকূলপ্রবাহ পরস্পরের ঘাতপ্রতিঘাতে হিংসা-পরায়ণ হইয়া বেলাভূমি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছিল, ঝিন্দনের প্রভাবে তাহারা একস্রোত মিশিয়া শান্তভাবে প্রবাহিত হয়। যাহারা দীর্ঘকাল কেশাকেশি, হস্তাহস্তি ও শোণিতস্রাবে অধীর হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ

পূর্ব্ব ও পশ্চিম হইতে পরস্পর পরস্পরকে রোষ-কষায়িত নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতে দর্পের স্পর্দ্ধা করিতেছিল, ঝিন্দনের প্রভাবে তাহারা একপ্রাণ হইয়া পরস্পরকে প্রীতিভাবে আলিঙ্গন করে। যাঁহার হৃদয় এইরূপ তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ, যাঁহার মন এইরূপ উচ্চতর গ্রামে আরূঢ়, তিনি কখন অসার বা অপদার্থ হইতে পারেন না।

যখন ঝিন্দন পঞ্জাবের শীর্ষস্থানে বর্ত্তমান, রাজা লালসিংহ তখন উজীরের পদে আরূঢ়। লাল সিংহের কোনও অমাত্যোচিত গুণ ছিল না। পঞ্জাবের সকলেই তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিত। লালসিংহ পঞ্জাবে থাকিয়া উচ্চতম সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন সময়ে তাঁহার কোনও গুণ বিকাশ পায় নাই। তাঁহার সৌন্দর্য্য কেবল দেহেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, উহা আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির উৎকর্ষ সাধন করে নাই; শাসন-ক্ষমতা কেবল অন্তঃপুর-প্রকোষ্ঠেই সীমাবদ্ধ ছিল, উহা বহিঃপ্রদেশে প্রসারিত হইয়া রাজ্যের উন্নতি সাধন করে নাই; রণ-নিপুণতা কেবল তোষামোদ-প্রিয় কুপোষ্য সম্প্রদায়ের সমক্ষেই প্রকাশিত হইত, উহা রণস্থলে প্রদর্শিত হইয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহ দেয় নাই। ফলে লালসিংহ শিখ-সমাজে ধূমকেতু স্বরূপ ছিলেন। ঝিন্দন এই ধূমকেতুর প্রতি কিছুমাত্র বিরাগ দেখান নাই। প্রত্যুত নানা প্রকারে উহার প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। ঝিন্দনেয় চরিত্রের এই অংশ নিতান্ত ক্ষীণ ও নিতান্ত দুর্ব্বল। এই ক্ষীণতা ও এই দুর্ব্বলতা ঝিন্দনের অবলা-প্রকৃতির দোষ। ঝিন্দন লালসিংহের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইতেন এবং তাঁহাকে সাধারণ লোক অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন; অনুগ্রহ ও ভালবাসার পাত্রের দোষ ঝিন্দনের চক্ষে দোষ বলিয়াই পরিগণিত হয় নাই। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি, ঝিন্দনের এই দোষ অবলা-হৃদয়ের দোষ বলিয়াই আমরা চিরকাল দয়ার চক্ষে দেখিব।

রণজিতের মৃত্যুর পর খাল্‌সা সৈন্যের বিশৃঙ্খলা ও যথেচ্ছাচারিতা

দেখিয়া ইঙ্গ্রেজগণ আপনাদিগের সীমান্তপ্রদেশ রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। এজন্য বহুসংখ্য সৈন্য ব্রিটীষ রাজ্যের সীমায় উপস্থিত হইল। ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের এই উদ্যোগ দর্শনে খালসাদিগের হৃদয় নানাপ্রকার আশঙ্কার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল। ঝিন্দনও এই তরঙ্গের হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন না। তিনি সীমান্ত ভাগে ইঙ্গ্রেজদিগের সৈন্য-শৃঙ্খলা দেখিয়া ভাবিলেন, ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট আপনাদের সীমায় যেরূপ আট ঘাট বাঁধিতেছেন, তাহাতে হঠাৎ পঞ্জাবরাজ্য আক্রান্ত হইতে পারে। পূর্ব্ব-স্মৃতি আসিয়া তাঁহার এই ভাবনার সহায় হইল। ঝিন্দন আবার ভাবিলেন, ইঙ্গ্রেজগণ এইরূপ, কৌশলেই ভারতে আপনাদের রাজ্য প্রসারিত করিয়াছে; এইরূপ কৌশলেই স্বাধীন রাজ্য সমূহে পরাধীনতার লৌহ নিগড় পরাইয়া দিয়াছে। এই কৌশলের বলেই দক্ষিণে মহারাষ্ট্র দীর্ঘকাল হস্তসঞ্চালন, পদ-বিক্ষেপন ও শোণিত-মোক্ষণের পর,কালের বিকট শ্মশানে শয়ন করিয়াছে, এবং এই কৌশলের বলেই মধ্যে মুসলমান যোগরত তপস্বীর ন্যায় উর্দ্ধনেত্র হইয়া আপনার পূর্ব্ব গৌরবের ধ্যান করিতেছে। এইরূপ ভাবনায় অধীর হওয়াতেই ঝিন্দন প্রথম শিখ যুদ্ধানলের ইন্ধন সংগ্রহ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। যে আশঙ্কায় খালসাগণ মদমত্ত হস্তীর ন্যায় শতদ্রু পার হইয়া ব্রিটীষ রাজ্য আক্রমণ করিল, সেই আশঙ্কাতেই ঝিন্দন তাহাদিগকে নিরস্ত না করিয়া উৎসাহিত করিলেন। ইহাতে ঝিন্দনের যে, বিশেষ সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করিব না। ঝিন্দন এ বিষয়ে যদি তাঁহার দূরদর্শী পতির অবলম্বিত নীতি অনুসরণ করিতেন, তাহা হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞতার সম্মান রক্ষা পাইত।

লালসিংহ ও তেজসিংহের বিশ্বাস-ঘাতকতায় প্রথম শিখ যুদ্ধে খালসাদিগের পরাজয় হইল। ঝিন্দন এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রকার ব্রিটীষসিংহের করায়ত্ত হইলেন। সুতরাং প্রথম শিখ-যুদ্ধের

পর হইতেই ঝিন্দনের অদৃষ্ট-চক্র ধীরে ধীরে নিম্নে যাইতে লাগিল। কিন্তু তেজস্বিনী ঝিন্দনের তেজস্বি হৃদয় ব্রিটীষ সিংহের দুর্নিবার তেজের নিকট পরাভূত হইল না। ঝিন্দন অটল পর্ব্বতের ন্যায় অটল হইয়া রহিলেন। তাঁহার রাজ্য পরপদানত হইয়াছে, পরজাতি সাত সমুদ্র, তের নদীর পার হইয়া তাঁহার রাজ্যে আসিয়া আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেছে, ইহা তাঁহার অসহ্য হইল। বিদেশীর এই আস্পর্দ্ধা, এই অনধিকার-প্রিয়তায় ঝিন্দন মর্ম্মে আঘাত পাইলেন। কামিনীর কোমল হৃদয় অপমান-বিষে কালীময় হইয়া উঠিল।

রেসিডেণ্ট (হেনরী লরেন্স) ঝিন্দনের প্রকৃতি বুঝিতে পারিলেন। এরূপ তেজস্বিনী নারী লাহোরে থাকিলে যে, আপনাদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রহিবে না, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল। এই বিশ্বাসেই রেসিডেণ্ট ঝিন্দনকে লাহোর হইতে সেখপুরায় নির্ব্বাসিত করিলেন। এস্থানেও ঝিন্দন দীর্ঘকাল থাকিতে পারিলেন না। পরবর্ত্তী রেসিডেণ্টের (ফ্রেডরিক কারি) মন্ত্রণায় ঝিন্দন সেখপুরা হইতে আবার বারাণসীতে নির্ব্বাসিত হইলেন। এইরূপ নির্ব্বাসনেও ঝিন্দনের কিছুমাত্র বিকার লক্ষিত হইল না। প্রকৃত বীরজায়া ও বীরনারীর ন্যায়, ঝিন্দন অটল ভাবে অবিকার চিত্তে স্বীয় দশা-বিপর্য্যয়কে আলিঙ্গন করিয়া পঞ্জাব পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। ঝিন্দন এক সময়ে যে লাহোরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া চারিদিকে আপনার গৌরব বিকাশ করিয়াছিলেন, যে লাহোরের অমাত্য-সমিতি এক সময়ে ঝিন্দনের অপ্রতিহত প্রভুশক্তির নিকট অবনতমস্তক ছিলেন, সেই লাহোর পরিত্যাগ সময়ে ঝিন্দনের যেরূপ স্থিরতা দেখা গিয়াছিল, পঞ্জাব পরিত্যাগ সময়েও সেইরূপ স্থিরতার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইল না। যে পঞ্জাব এতকাল তাঁহাকে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় পূজা করিয়া আসিতেছিল, এখন সেই পঞ্জাব তাঁহার নেত্র-বিনোদনের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল। ঝিন্দন স্থিরহৃদয়ে পঞ্জাব পরিত্যাগ

করিলেন। বৈদেশিকের নিকট ঝিন্দনের চরিত্রগতি যতই নিম্নগামিনী বলিয়া বোধ হউক না কেন, বৈদেশিক চিত্র-করের হস্তে পড়িয়া ঝিন্দনের চিত্র যতই কালিমায় পরিণত হউক না কেন, ঝিন্দন এই স্থিরতার জন্য নারী-সমাজে গরীয়সী বলিয়া পরিগণিতা হইবেন।

এই নির্ব্বাসন-ঘটনাই ঝিন্দনের সৌভাগ্য-অভিনয়ের যবনিকা-পতন। এই যবনিকা-পতনের অব্যবহিত পরে পঞ্জাবে যে ভয়াবহ কাণ্ড সঙ্ঘটিত হয়, ঝিন্দনের নির্ব্বাসনই তাহার অন্যতম কারণ। এই ভয়াবহ কাণ্ড দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ। দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ শিখদিগের স্বাধীনতার ইতিহাসের শেষ অধ্যায়, এবং দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ শিখদিগের সৌভাগ্য-নেমির শেষ আবর্ত্ত। সাগরের দুটী প্রবল জলোচ্ছাস যেমন ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে প্রলয়ের ধ্বজা স্বরূপ আসিয়া পরস্পরের সংঘর্ষে ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত করে, এবং বহুক্ষণ ঘাতপ্রতিঘাতের পর ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া অনন্ত বারি রাশির সহিত মিশিয়া যায়, দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধেও সেইরূপ দুটী প্রবল জাতি বিশ্ব-ত্রাশ গর্জ্জনে বিভিন্ন দিক্ হইতে আসিয়া বহুক্ষণ হস্তাহস্তির পর এক ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। রণজিৎ-সিংহ ইষ্টকের উপর ইষ্টক গ্রথিত করিয়া যে মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই যুদ্ধের প্রবল বাত্যাতেই তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। অপর দিকে দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ শিখদিগের বীর্য্যবহ্নির অসাধারণ বিস্ফুরণ-স্থল। গুরুগোবিন্দ সিংহ যে ফল লক্ষ্য করিয়া শিখদিগকে সাধারণতন্ত্র-সমাজে একত্র করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধেই তাহার উৎকর্ষ হয়। যে চিনিয়ানওয়ালার নাম ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে, যে চিনিয়ানওয়ালার জন্য ভারতবর্ষ বীরেন্দ্র-সমাজের বরণীয় হইয়া প্রাণগত শ্রদ্ধার পূজা পাইয়া আসিতেছে, যে চিনিয়ানওয়ালায় শিখদিগের তেজের নিকট ওয়াটার্লুজয়ি ব্রিটিষ তেজও পরাভব মানিয়াছে, দ্বিতীয় শিখযুদ্ধেই সেই চিনিয়ানওয়ালা পুণ্য-পুঞ্জময় মহাতীর্থ হইয়া সকলের রসনায় রসনায় লীলা করিতে থাকে। বৈদেশিকের লিখিত ইতিহাস যাহাই

বলুক না কেন, আমরা অসঙ্কুচিত হৃদয়ে ঝিন্দনের নির্ব্বাসনকেই এই ঘটনার অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। অনেকে বলিতে পারেন, ঝিন্দনের নির্ব্বাসনের সময় পঞ্জাবে বিরাগের কোনও চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। কেহই অশ্রুপাত, হাহাকার, শিরে করাঘাত করিয়া এই নির্ব্বাসন-সংবাদ চারিদিকে ঘুষিয়া বেড়ায় নাই। পঞ্জাব নিবাত, নিষ্কম্প সমুদ্রের ন্যায় ধীর ভাবে ঝিন্দনের নির্ব্বাসন চাহিয়া দেখিয়াছে; সুতরাং ঝিন্দনের নির্ব্বাসনকে শিখ জাতির সমুত্থান ও তন্নিবন্ধন যুদ্ধ-সজ্ঘটনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। যাঁহারা এইরূপ বলিয়া পবিত্র ইতিহাসের সম্মান নষ্ট করিতে চাহেন, তাঁহারা মানব প্রকৃতির তত্ত্বানভিজ্ঞ। আমরা শত হস্ত দূর হইতে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করি। তাঁহারা যাহাকে আহ্লাদের চিহ্ন মনে করেন, আমরা তাহাকেই বিষম মর্ম্ম-পীড়ার বিষম দাহন মনে করি, এবং তাঁহারা যাহাতে সুখ ও শান্তি দেখিয়া সুখী হন, আমরা তাহাতেই গভীর আতঙ্ক ও গভীর মনোবেদনা দেখিয়া দুঃখিত হই।

যে দুঃখ হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চারিত হইতে পারে না, তাহা সামান্য বাহ্য বিকারের সহিতই নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই দুঃখ দুঃখের অভিনয় প্রদর্শন মাত্র। যখন দেখি, কেহ দুঃখে অধীর হইয়া দুই হস্তে মস্তকের কেশ উৎপাটন করিতেছে, হাহাকারে রোদন করিয়া চারিদিকের জনতা বৃদ্ধি করিতেছে, তখন সদয় ভাবে তাহাকে দুঃখের অভিনয়কারী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিব; কিন্তু যখন দেখিব, কেহ কোন ঘোরতর আকস্মিক বিপৎপাতে ম্রিয়মাণ হইয়া অচঞ্চল সাগরের ন্যায় ধীর ভাবে বসিয়া আছে, মস্তকের এক গাছি কেশও নড়িতেছে না, এক বিন্দু অশ্রুও নেত্র হইতে গলিয়া পড়িতেছে না; হৃদয়ে প্রজ্বলিত হুতাশন ধক্, ধক্ করিতেছে, কোন বাহ্য ভঙ্গীর সহিত তাহার তাপ বাহিরে আসিতেছে না; পরমাত্ম-সংযত, ধ্যান-স্তিমিত-নেত্র যোগীর ন্যায় নিঃশব্দে ও নিস্পন্দ ভাবে সে

আপনার জ্বালায় আপনিই পুড়িয়া মরিতেছে; তখন তাহাকে কাতর ভাবে দুঃখের জীবন্ত মূর্ত্তি বলিয়াই উল্লেখ করিব। "অল্প দুঃখ নেত্র-বারির সহিতই বিগলিত হয়, অল্প ক্রোধ ভ্রুকুঞ্চন ও দন্ত-ঘর্ষণের সহিতই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, অল্প আশঙ্কা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিতই বিলয় পায়।" কিন্তু যে দুঃখ হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রসারিত হয়, যে ক্রোধ শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে সঞ্চারিত হইয়া জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করে, যে আশঙ্কা মর্ম্মে মর্ম্মে বদ্ধমূল হইয়া অন্তঃকরণকে তীব্রভাবে আন্দোলিত করিতে থাকে, তাহা কখনও ভ্রুকুঞ্চন ও দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বিলীন হয় না। ঝিন্দনের নির্ব্বাসন সময়ে পঞ্জাবের যে, নিশ্চল ভাব লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা এইরূপ দুঃখ, ক্রোধ ও আশঙ্কা-মূলক। পঞ্জাবের এই নিস্তব্ধতা শান্তির নিস্তব্ধতা নহে, ইহা গভীর দুঃখ, গভীর ক্রোধ ও গভীর আশঙ্কার নিস্তব্ধতা। এই দুঃখ, ক্রোধ ও গভীর আশঙ্কায় দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ সমুপস্থিত হয়। গুরু গোবিন্দসিংহের মহিমা-বলে পঞ্জাবের অন্তর্নিগূঢ় তুষানল এই যুদ্ধের সময়েই প্রচণ্ড হুতাশনে পরিণত হইয়া বিষম স্ফুলিঙ্গ-ক্রীড়া প্রদর্শন করে। যে বীরশ্রেষ্ঠ চিনিয়ানওয়ালায় বিজয়-পতাকায় শোভিত হইয়াছিলেন, সেই সের সিংহও ঝিন্দনের নির্ব্বাসনে মর্ম্মাহত হইয়া স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন, "ইহা সকলেই ভালরূপে জানিতে পারিয়াছেন, সমস্ত পঞ্জাব-বাসী, সমস্ত শিখ, সংক্ষেপে সমস্ত পৃথিবীর বিদিত হইয়াছে, ফিরিঙ্গিগণ পরলোক সুখ-ভোগী রণজিৎসিংহের বিধবা মহিষীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে, এবং কিরূপে দৌরাত্ম্যে এই রাজ্যের লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। প্রথমত, তাহারা সমস্ত প্রজার মাতা স্বরূপ মহারাণীকে কারাবদ্ধ ও হিন্দুস্থানে নির্ব্বাসিত করিয়া সন্ধিভঙ্গ করিতে ত্রুটি করে নাই, দ্বিতীয়ত, তাহাদের দৌরাত্ম্যে শিখগণ এতদূর নিপীড়িত হইয়া উঠিয়াছে যে, আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং তৃতীয়ত, আমাদের রাজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা গৌরব-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে।"

ইহাতেও কি বলিব ঝিন্দনের নির্ব্বাসনে পঞ্জাব দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হয় নাই? ইহাতেও কি বলিব, পঞ্জাব নিরুদ্বেগে ঝিন্দনের নির্ব্বাসন চাহিয়া দেখিয়াছে?

কিন্তু ঝিন্দনের নির্ব্বাসনে কেন পঞ্জাব এইরূপ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইল? কেন পঞ্জাবের প্রতি রোমকূপে ক্রোধের অনলকণা প্রবিষ্ট হইল? কেন পঞ্জাবের শিরায় শিরায় তীব্র বিষ প্রসারিত হইল? ইহা একই উত্তর, ঝিন্দনের প্রতি পঞ্জাবের আন্তরিক ভক্তি, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আন্তরিক ভালবাসা। শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার পাত্রের শোচনীয় দশা কখনই শান্তভাবে নিরীক্ষণ করা যায় না। পঞ্জাব যাঁহাকে পরম দেবতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত, মাতার ন্যায় সরল হৃদয়ে ভাল বাসিত, তাঁহার নির্ব্বাসনে যে পঞ্জাবের হৃদয় উগ্র হলাহলে কালীময় হইয়া উঠিবে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। এক্ষণে এরূপ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রকে আমরা কোন্ প্রাণে পাপীয়সী ও কলঙ্কিনী বলিয়া ঘৃণা করিব? কোন প্রাণে এরূপ উজ্বল মূর্ত্তিতে কলঙ্কের পঙ্ক লেপিয়া হৃদয় অপবিত্র করিব? যাঁহারা এরূপ পবিত্র-ভাব দেখিয়াও ঝিন্দনকে পাপীয়সী ও কলঙ্কিনী বলিয়া ঘৃণা করেন, তাঁহারা মানব জাতির শত্রু। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া পবিত্র ভক্তির অবমাননা করেন, পবিত্র শ্রদ্ধার মুণ্ডচ্ছেদ করেন, এবং পবিত্র ভালবাসার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করেন। তাঁহাদের সহিত আমাদের কোনও রূপ সমবেদনা নাই।

এই উজ্জ্বলতা-বলেই ঝিন্দন বর্ত্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে সমস্ত ভারতবর্ষ বিভাসিত করিয়াছিলেন, এই উজ্জ্বলতায় ঝিন্দনের সমস্ত ক্ষীণতা ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, এবং এই উজ্জ্বলতাতেই আমরা ঝিন্দনের এত দূর পক্ষপাতী হইয়াছি। ঝিন্দন তেজস্বিনী নারীর অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত-ভূমি। তিনি লাবণ্য-লীলাময়ী ললনা হইয়াও, দৃঢ়তা ও অটলতার আস্পদ ছিলেন, কোমলতাময় অঙ্গনা-হৃদয়ের অধিকারিণী হইয়াও, ধীরতার অবলম্বন ছিলেন, এবং কমনীয় কান্তির আধার হুইয়াও ভীমগুণান্বিত

তেজস্বিতার পরিপোষক ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে কোনও নারী এরূপ হঠাৎ সমুত্থিত হইয়া একটী প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সহিত এরূপ তেজস্বিতা ও শাসন-ক্ষমতার স্পর্দ্ধা করে নাই। আমরা পুনর্ব্বার বলিতেছি, ঝিন্দনের তরল প্রকৃতিতে অনেক খুঁত থাকিতে পারে। কিন্তু তাহাতে যে সকল গুণ আছে, তাহার জন্য তাঁহাকে আদর না করা মূঢ়ের কর্ম্ম। কবে কখন ক্লিওপেট্রা আপনার সম্মোহন রূপ-সাগরে সকলকে ডুবাইয়া প্রেম খেলা খেলিয়াছেন, কবে কখন কুইন মেরী হৃদয়ের গরল ঢালিয়া আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন; ঝিন্দনের একটী খুত দেখিয়াই তাঁহার চরিত্রে সেই ক্লিওপেট্রা বা কুইন মেরীর কলঙ্ক লেপন করা প্রকৃত সামাজিকতার লক্ষণ নহে। দোষকে সকল স্থলেই দোষ বলিয়া ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করা উচিত, এবং গুণকে সকল স্থলেই গুণ বলিয়া আদরের সহিত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কোনও বিশ্ব-শত্রু পাষণ্ডের কোনও অলোক-সাধারণ গুণ দেখিলে তাহার পাষণ্ডত্ব ক্ষণকাল বিস্মৃত হইয়া তাহার লোকাতীত গুণের পূজা করা উচিত। যখন দেখিতেছি, এক জন নির্দ্দয় দস্যু একদিকে মূর্ত্তিমান পাপের ন্যায় সকলের হৃদয়-বৃন্ত ছিন্ন করিয়া সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠন করিতেছে; অপর দিকে অপরিসীম ও পবিত্র ভক্তির সহিত মাতার পদসেবায় ব্যাপৃত হইতেছে, এবং অপরিসীম ও পবিত্র প্রেমের সহিত বনিতার মনোরঞ্জন করিতেছে। তখন তাহার মাতৃভক্তি ও দাম্পত্য-প্রেমের নিকট সহজেই মস্তক অবনত হইয়া পড়ে। যখন দেখিতেছি, একজন নিষ্ঠুর দুরাশয় এক সময়ে একজন নির্দ্দোষ নিরীহের উপর অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আপনার দুরাশয়তা চরিতার্থ করিয়াছে, পরক্ষণেই আবার পবিত্র ভাবে সংযত চিত্তে স্নান করিয়া আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্যই যেন,ভক্তিরসার্দ্র হৃদয়ে স্বীয় নয়ন-জল ভাগীরথীর জল-প্রবাহের সহিত মিশাইয়া ঊর্দ্ধনেত্রে নিষ্পন্দ ভাবে পরম দেবতার আরাধনা করিতেছে; তখন আপনা হইতেই তাহার দেব-ভক্তির পূজা করিতে ইচ্ছা হয়। এরূপ নীচাশয় নিষ্ঠুরগণও যখন সময় বিশেষে

হৃদয়ের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে, তখন ঝিন্দন এক জনের প্রতি একটু অধিক মাত্রায় অনুগ্রহ দেখাইতেন অথবা একজনকে একটু অধিক মাত্রায় ভাল বাসিতেন বলিয়াই যে, তিনি প্রীতির অপাত্র হইবেন, হৃদয় থাকিতে আমরা তাহা কখনই স্বীকার করিতে পারিব না।

আমরা ঝিন্দনকে আজীবন দয়ার চক্ষেই দেখিব; আজীবন ঝিন্দনের চরিত্র ভাল ভাবেই স্মৃতিপটে অঙ্কিত রাখিব। বৈদেশিকগণ যেরূপে অসহায় ভারতের একটী অসহায় ললনার উপর কলঙ্কের কালিমা বর্ষণ করিয়াছেন, আমরা চিরকাল তাহার জন্য দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিব; এবং চিরকাল ঘৃণা ও অবজ্ঞার সহিত সেই চিত্রের প্রতি তাচ্ছীল্য দেখাইব।

ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়।

সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের ন্যায় ভারতের ইতিহাস অনেক ঘটনা-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। রোমক সম্রাজ্যের পতন অথবা খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে যেমন বিচিত্র ঘটনাবলী স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে, ভারতবর্ষে হিন্দু রাজ্যের উত্থান ও পতন, বৌদ্ধ রাজত্বের আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং মুসলমান অধিকারের উদয় ও বিলয়েও তেমনি বিচিত্র ঘটনাসমূহ রাশীকৃত হইয়া আছে। হিন্দুগণ প্রথম অবস্থায় পঞ্জাবে আসিয়া ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। ক্রমে হিমালয় হইতে দাক্ষিণাপথের দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাদের বসতি বিস্তৃত হয়। ভারতে হিন্দু-অধিকার পৃথিবীর ইতিহাসের একটী সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। এই অধিকারে সভ্যতার উৎকর্ষ হয়, বাণিজ্য-ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয় এবং বিদ্যার বহুল প্রচার হইয়া উঠে। আরিস্ততল যাহাতে পরাস্ত হইয়াছেন, পিথাগোরেস

যাহাতে বিমুখ হইয়াছেন, জিনোদোতস্ যাহাতে পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন, বহু পূর্ব্বে হিন্দুদিগের প্রতিভা-বলে তাহা পরিষ্কৃত ও সুবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাষ্পরাশি যেমন আপনা হইতেই শূন্যে প্রসারিত হয়, জলস্রোত যেমন আপনা হইতেই নিম্নাভিমুখে প্রধাবিত হয়, বহ্নিশিখা যেমন আপনা হইতেই আকাশের দিকে সমুত্থিত হয়, হিন্দুদিগের মন তেমনি আপনা হইতেই শাস্ত্রাধ্যয়ন, শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রাভ্যাসে আসক্ত হইয়া উঠে। এই আদিম সভ্যতার স্রোতে নীয়মান হইয়া হিন্দুগণ জলদগম্ভীর মধুর স্বরে সাম গান করিয়াছেন, উপনিষদের গূঢ় অর্থ বিবৃত করিয়া পবিত্র ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, রামায়ণ ও মহাভারতের চিত্ত-বিমোহিনী কবিত্ব-সুধা বর্ষণ করিয়াছেন এবং গণিতের অদ্ভুত সঙ্কেত প্রচার করিয়া পৃথিবীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুদিগের এই অভিজ্ঞতা অন্যান্য দেশের উন্নতির প্রসূতি।

ইহার পর বৌদ্ধ অধিকার। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যাহা সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, বৌদ্ধধর্ম্ম তাহা সম্প্রসারিত ও অসীম করিয়া তুলিল। বৈষম্য হিন্দুদিগের মূল মন্ত্র, সাম্য বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মবীজ। হিংসা হিন্দুদিগের পুণ্য কর্ম্মের প্রধান সাধন, অহিংসা বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম-মন্দিরের পবিত্র সোপান। মায়াময় সংসার-পাশ হইতে বিমুক্তি অথবা স্বর্গলাভ হিন্দুদিগের অন্তিম সিদ্ধি, আত্মার বিধ্বংস অথবা নির্ব্বাণ প্রাপ্তি বৌদ্ধদিগের চরম উদ্দেশ্য। এই বিভিন্ন প্রকৃতির ধর্ম্মের সংঘাতে বৌদ্ধধর্ম্ম পরাজয় স্বীকার করে। ভারতবর্ষ হিন্দুদিগের অধিকার কাল ব্যাপিয়া যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল, শাক্যসিংহের প্রতিভা-বলে সে শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হয়। সাগরের প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস যেমন ক্ষীণশক্তি মানবের নিষেধ না মানিয়া প্রবল পরাক্রমে সমুদয় দেশ ভাসাইয়া দেয়, বৌদ্ধধর্ম্ম তেমনি দুর্ব্বার বেগে হিন্দুধর্ম্মকে দলিত করিয়া সমস্ত স্থানে ব্যাপিয়া পড়ে। ক্রমে কামস্কট্কার তুষারধবল ভূখণ্ড হইতে চীন পর্য্যন্ত এবং ভারতের সিন্ধু-পরিক্ষালিত স্বর্ণ

ভূমি হইতে বালী ও যব দ্বীপ পর্য্যন্ত ইহার আধিপত্য প্রসারিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল প্রতাপের সময় বৌদ্ধ রাজগণের প্রবল প্রতাপও ইতিহাসের বর্ণনীয় হইয়া উঠে। মগধ সাম্রাজ্যের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া যুনানী ভূমিতে পরিব্যাপ্ত হয়, মহারাজ অশোকের শাসন-মহিমা গ্রীম ও রোমক রাজগণের নিকট পরাভব না মানিয়া গৌরব ও সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর স্পর্দ্ধা করে।

কালের পরাক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্ম আবার ভারতে হিন্দুধর্ম্মের নিকট মস্তক অবনত করিল। ব্রাহ্মণগণ আবার শ্রমণগণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিলেন, এবং বৌদ্ধ রাজগণের পরিবর্ত্তে আবার হিন্দুরাজগণের স্তুতিগীতিতে ভারতবর্ষ প্রতিধ্বনিত হইল। কিছু কালের মধ্যেই মগধ সাম্রাজ্য ও মগধ রাজগণের খ্যাতি ও প্রতাপ ক্ষণস্ফূর্ত্তিমান জলবিম্বের ন্যায় সময়ের অনন্ত বারি-রাশির সহিত মিশিয়া গেল এবং তাহার স্থানে উজ্জয়িনীরাজতার খরতর তরঙ্গ নৃত্য করিতে লাগিল। এই তরঙ্গ কেবল নির্দ্দিষ্ট সীমাতেই আস্ফালন করিল না। ইহার আবেগ কেবল সঙ্কুচিত সীমাতেই সঙ্কুচিত রহিল না। ইহা সমস্ত ভারতবর্ষ আন্দোলিত করিয়া ক্রমে ভিন্ন দেশের উপকূলে আঘাত আরম্ভ করিল। সকলেই বৌদ্ধরাজতার অত্যয়ে হিন্দুরাজতার এই অভ্যুত্থান বিস্ময়াকুল নেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। হিন্দুগণ এখন শীত-সঙ্কুচিত বৃক্ষের ন্যায় আপনাতে আপনি লুক্কায়িত না থাকিয়া চারি দিকে আপনাদের ক্ষমতা ও প্রভুতা বিস্তার করিল। ইহাঁরা শকদিগকে পরাজিত এবং রণকুশল ব্যক্তিদিগকে আপনাদের সংরক্ষণ-কার্য্যে নিয়োজিত করিলেন। ইহাঁদের প্রতাপ ও দক্ষতার সমুজ্জ্বল বহ্নি-শিখা রোমকদিগের সহিত জর্ম্মণ ও কিম্ব্রিদিগের সংঘাতজনিত তুষানলকে ঢাকিয়া ফেলিল। কিন্তু হিন্দুদিগের এইরূপ পুনরুত্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। ভারতে ইহার স্রোত নিরুদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুই একটী তরঙ্গ ইতস্ততঃ তটাভিঘাত করিয়া বেড়াইতেছিল। যে জলন্ত পবিত্র হুতাশন কপিলবস্তু হইতে

সমুত্থিত হইয়া ভারতের সমস্ত দেহ আলোকিত করিয়াছিল, তাহা তখনও স্থিররশ্মি দীপমালার ন্যায় দুই একটী স্থানে আলোক প্রদান করিতেছিল। ব্রাহ্মণগণ বহু চেষ্টা করিয়াও এই তরঙ্গ অচঞ্চল বারিরাশির সহিত মিশাইতে পারিলেন না, এবং বহু সাধনা করিয়াও এই আলোকের নির্ব্বাণে সমর্থ হইলেন না। উজ্জয়িনী-শোভিত কবিতা-বল্লীর মধুময় কুসুমের সৌরভ যখন চারি দিক আমোদিত করিয়া তুলে, পুরুষ-সিংহ ভোজের শাসন-মহিমা যখন আর্য্যাবর্ত্তকে উন্নতির উচ্চতর গ্রামে আরোহিত করে এবং শাস্ত্রদর্শী চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ানের গবেষণা যখন অবাধে সঙ্কুচিতভাবে হিমালয়ের তুষার-ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হয়, তখন ব্রাহ্মণগণের ন্যায় শ্রমণগণও আপনাদের ধর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন এবং হিন্দু নৃপতির ন্যায় বৌদ্ধ নৃপতিও কোন কোন স্থানে আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ, এইরূপ বিভিন্ন আচার, বিভিন্ন ধর্ম্ম-পদ্ধতি ও বিভিন্ন নৃপতির শাসনে থাকিয়া পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া উঠে। মধ্যে দক্ষিণাপথের এক জন নাম্বুরীজাতীয় ব্রাহ্মণ অদ্ভুত বিচার-শক্তি, অদ্ভুত লিপি-কুশলতা ও অদ্ভুত পাণ্ডিত্য বিকাশ করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। ভারতবর্ষ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার লোকাতীত জ্ঞানের নিকট মস্তক অবনত করে, এবং কেহ কেহ তাঁহার তেজোমহিমা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ত্রিলোকগুরু ভবানীপতির অবতার বলিয়া তাঁহাকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলে।

খ্রীষ্টীয় অব্দের আরম্ভ হইতে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা এইরূপ। ইহার পর প্রবল পরাক্রান্ত একটী বিধর্ম্মী জাতি সাগরের জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় ভারতে আসিয়া সমস্ত ভাসাইয়া দেয়। বহু পূর্ব্বে পারসীকগণ একবার ভারতবর্ষে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষের তাদৃশ অনিষ্ট হয় নাই, বাহ্লীকের গ্রীকগণও পঞ্জাব হইতে অযোধ্যার দ্বারে উপনীত হইয়াছিল,

কিন্তু তাঁহাতেও ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল অস্থির থাকে নাই, আরবগণও একবার দলবল সহ উপস্থিত হইয়া সিন্ধুক্ষেত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাও কাসেমের হত্যার পর চিরকাল অপ্রক্ষালিত রহে নাই। খ্রীষ্টের এক হাজার বৎসর পরে যেরূপ দৌরাত্ম্য সংঘটিত হয়, তাহাতে ভারতবর্ষ একপ্রকার সারহীন হইয়া পড়ে। সুলতান মহমুদ দ্বাদশ বার ভারতবর্ষে আসিয়া অনেক অর্থ অপহরণ ও অনেক মনুষ্য নাশ করেন। ভারতের অতুল ধনসম্পত্তি এইরূপে দেশান্তরে নীত হইতে থাকে। মথুরার প্রাসাদের আদর্শে গজনি নগর সুশোভিত হয়, এবং সোমনাথের প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দিরের চন্দনকাষ্ঠময় প্রকাণ্ড কবাট গজনির মাহাত্ম্য বিকাশ করে। এ পর্য্যন্ত মুসলমানগণ কেবল অর্থ-বিলুণ্ঠনেই আসক্ত ছিল, ভারতবর্ষের কোন অংশ হস্তগত করিতে তত যত্ন করে নাই। কিন্তু মুহম্মদ গোরী মধ্য আসিয়ার পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আসিয়া সুলতান মহমূদের অসম্পন্ন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলেন। আর্য্যেরা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন, যতক্ষণ পবিত্র ক্ষত্রিয়-শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে প্রবাহিত ছিল, ততক্ষণ তাঁহারা মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানের অসীম চাতুরীর প্রভাবে অথবা নিয়তির অনন্ত শক্তির মহিমায় তাঁহাদের পরাজয় হইল, দৃষদ্বতীর তীরে ক্ষত্রিয়ের অনন্ত-প্রবাহ শোণিত-সাগরে ভারতের সৌভাগ্য-রবি ডুবিয়া গেল।

মুহম্মদ গোরী বিজয়ী হইয়া আপনার প্রিয় পাত্র কোতোববদ্দীন ইবক্‌কে ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা করিয়া গেলেন। ভারতে মুসলমানের আধিপত্য কোতোব হইতে আরম্ভ হইল। যে ইন্দ্রপ্রস্থ পাণ্ডব-শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ছিল, যে ইন্দ্রপ্রস্থ চৌহান-রবি পৃথ্বীরাজের বিলাস-ভবনে শোভা পাইত, তাহা এক্ষণে মুসলমানের করায়ত্ত হইল। এইরূপে এক রাজ্যের পর আর এক রাজ্য তাহাদের অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত পতাকায় চিহ্নিত হইতে লাগিল, এবং এইরূপে এক বংশের পর আর

এক বংশ দিল্লীর সিংহাসনের অধিকারী হইয়া উঠিল। এই নূতন নূতন বংশের সহিত নূতন নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ও ভারতবর্ষে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। দক্ষিণে রামানুজ শক্তির উপাসনার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বৈষ্ণব মত প্রচার করিলেন, উত্তরে রামানন্দ ও গোরক্ষনাথ রামসীতা ও যোগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে যত্নবান্ হইলেন, মধ্যে কবীর বেদ ও কোরাণ উভয়েরই মস্তকে কলঙ্কের কালিমা মাখাইয়া ঐশ্বরিক-তত্ত্ব ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এই সাম্প্রদায়িক স্রোত ইহাতেও নিরুদ্ধ হইল না। কিছু কাল পরে নদিয়ার একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-যুবক পবিত্র স্বর্গীয় প্রেমের অমৃত প্রবাহে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিলেন। এই প্রেম-প্লাবনে সমস্ত ভারতবর্ষ প্লাবিত হইল। এই সময়ে ইউরোপে মহামতি লুথর জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছু পূর্ব্বে পঞ্জাবে আর একজন দরিদ্র ক্ষত্রিয় যুবক ধর্ম্মজগতে আর এক নূতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে সমুত্থিত হইলেন।

মহামতি নানক যে সময়ে আপনার মত প্রচার করেন, সে সময়ে তাঁহার প্রতিভা-বলে পঞ্জাবে আর একটী নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার বহু পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিপ্লবের সঞ্চার হইয়াছিল। দৃষদ্বতীর তটে হিন্দুদের বিজয়-বৈজয়ন্তী ধরাশায়ী হইলে যে নূতন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করে, তাহার সংশ্রবে এই বিপ্লবের সূপাত্র হইল। ইহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করিল, বেদের মস্তকে পদাঘাত করিল, এবং ধর্ম্মপ্রচারে হিন্দুদিগকে অধঃকৃত করিয়া তুলিল। ইহারা সাহস ও রণদক্ষতায় ক্ষত্রিয়-স্পর্দ্ধী হইয়া লোকের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল, এবং সকলকে আপনাদের ধর্ম্মে অনয়ন করিবার নিমিত্ত যত্নশীল হইয়া উঠিল। ইহাদের মোল্লা, পীর ও সৈয়দগণ আপনাদিগকে হিন্দুদের দেবতা অপেক্ষাও পবিত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং হিন্দুদের ভক্তি, ঈশ্বর-প্রীতি ও জাতি-বিচার সমস্তই পদ-দলিত

করিয়া মুহম্মদের ঈশ্বরত্ব ও কোরাণের মাহাত্ম্য প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন কুসংস্কার আসিয়া মুসলমান ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইল। মুহম্মদ ও তদীয় কোরাণের প্রকৃত তত্ত্ব ভ্রান্তিজালে জড়িত হইয়া পড়িল। এইরূপে আচারের পর আচার, মতের পর মত, অনুশাসনের পর অনুশাসনের আবর্ত্তে পড়িয়া লোকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সম্প্রদায়ের এই ক্ষীণতা ও সাম্প্রদায়িক মতের এই অস্থিরতায় তাহাদের হৃদয় অস্থির হইয়া উঠিল, শান্তি দূরে পলায়ন করিল, দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল, পরিশেষে তাহারা ব্রাহ্মণ ও মোল্লা, মহেশ্বর ও মুহম্মদ, ইহার কিছুতেই তৃপ্তিলাভ না করিয়া নূতনের জন্য সমুত্তেজিত হইয়া উঠিল।

এই উত্তেজনার সময় যিনি ধর্ম্ম বিষয়ে সরলতা ও উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, লোকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া দলে দলে তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। পৌত্তলিকতা ও নানাবিধ কুসংস্কারে রোম যখন ভারাক্রান্ত হয়, এবং রোমের ধর্ম্মান্ধতা যখন উৎসাহ ও উদারতার অভাবে শিথিল হইয়া পড়ে, তখন পরিশুদ্ধ ও উদার ধর্ম্মের জন্য রোম আপনা হইতেই লালায়িত হইয়া উঠে। রোমের পুরোহিতগণ এ সময়ে আপনাদের ধর্ম্ম-মন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠেই নিরুদ্ধ থাকিতেন, ধ্যান ধারণাদি কোন বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র উৎসাহ বা অনুরাগ ছিল না। সহস্র সহস্র দেবতার উপাসনা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে কোন উপাসনাতেই তাঁহাদের হৃদয়ের একাগ্রতা, সরলতা বা সজীবতা লক্ষিত হইত না। এই সময়ে তারতুলিয়ন ও নাক্‌তানতিয়স কিকেরোর ন্যায় বাগ্মিতা ও লুকিয়ানের ন্যায় রসিকতা করিয়া সকলের সমক্ষে এই উপাসনার অসারত্ব প্রতিপন্ন করেন। লোকে ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া অন্য কোন নূতন উপাসনা-পদ্ধতির নিমিত্ত ব্যগ্র হয়। মতের আঘাত প্রতিঘাতে রোম এইরূপ তরঙ্গায়িত হইলে খ্রীষ্টধর্ম্মতত্ত্ব ক্রমে লোকের হৃদয়ে প্রসারিত হইতে লাগিল এবং প্রতিকূলতায় প্রবৃদ্ধতেজ হইয়া পরিশেষে জুপিতরের

ভগ্নদশাপন্ন মন্দিরের শিরোদেশে আপনার বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দিল। ভারতবর্ষও ঐরূপ ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্ম্মের তরঙ্গে আহত হইয়া অনেকাংশে রোমের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এই চাঞ্চল্যের সময়েই নূতন নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, নানকের পূর্ব্বে রামানন্দ প্রভৃতি কতিপয় মনস্বী ব্যক্তি ধর্ম্ম বিষয়ে ভারতবর্ষের স্থল-বিশেষে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রামানন্দের প্রাদুর্ভাব হয়। মুসলমানদের সংশ্রবে ভারতে ধর্ম্ম-বিষয়ে একতা, উদারতা ও নিষ্ঠা অনেকাংশে তিরোহিত হইয়াছিল। রামানন্দ এই একতা, উদারতা ও নিষ্ঠা সঞ্জীবিত করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইলেন। তিনি জাতিভেদ উচ্ছেদ করিয়া সকলকেই সমভাবে আপনার সম্প্রদায়ে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্নে, তাঁতি, চামার, রাজপুত ও জাঠ সকলেই এক শ্রেণীতে নিবেশিত ও এক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া উঠিল। রামানন্দের সমকালে গোরক্ষনাথ নামে আর এক ব্যক্তি পঞ্জাবে যোগের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে আরম্ভ করেন এবং মহাদেবকে আরাধ্য দেবতা করিয়া তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হন। ইহার পর কবীরের আবির্ভাব। কবীর ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়া ধর্ম্মমতের আর এক গ্রাম উপরে আরোহণ করেন। রামানন্দ জাতিভেদ রহিত করিয়াও যে বাহ্য আড়ম্বরের চিহ্ন রাখিয়াছিলেন, কবীর সে চিহ্নেরও উচ্ছেদ করিলেন। তাঁহার মতে বাহ্য আড়ম্বর নিষ্ফল, কেবল একমাত্র অন্তঃশুদ্ধিই ধর্ম্মাচরণের মুখ্য সাধন। তিনি সমুদয় দেব দেবীর উপাসনা-পদ্ধতি অগ্রাহ্য করিয়া কেবল এক মাত্র বিষ্ণুর উপাসনায় সকলকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইহার পর চৈতন্যের অমৃতময় প্রেমের মোহিনী শক্তিতে ভারতবর্ষ বিমোহিত হয়। চৈতন্য জাতিগত পার্থক্য রহিত করিয়া পবিত্র ভক্তি ও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নির্জ্জীব ভারতের হৃদয়ে জীবনী-শক্তি অর্পণ করিলেম, এই সময়ে তৈলঙ্গের বল্লভাচার্য্য নামে এক জন ব্রাহ্মণের উৎসাহে আবার একটী নূতন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত

হয়। বল্লভাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত বিধি অনুসারে পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা নাই, অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ পাইবার প্রয়োজন নাই এবং নির্জ্জন বনে কঠোর তপস্যাতেও ফলোদয় নাই। তাঁহার মতে যাবতীয় সুখসেব্য বিষয় ভোগ করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। বল্লভাচার্য্য এইরূপে ভোগবিলাসের অনুমোদন করিয়া শ্যামসুন্দর গোপালের উপাসনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিলেন। এইরূপে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মন ক্রমেই নূতন নূতন ধর্ম্ম-পদ্ধতির দিকে উন্মুখ হয়। পীর ও মোল্লাদিগের নিগ্রহে নিপীড়িত হইয়া হিন্দুগণ শান্তিলাভের আশায় নূতন নূতন ধর্ম্মতত্ত্বের প্রচার ও তাহার সংস্কার-চেষ্টায় অভিনিবিষ্ট হন। রামানন্দ যাহা উদ্ভাবিত করেন, কবীর তাহা পরিমার্জ্জিত করেন, চৈতন্য তাহাতে তাড়িত বেগ সংযোজিত করেন, পরিশেষে বল্লভাচার্য্য তাহাতে আর একটী নূতন রেখাপাত করিয়া দেন। সেইরূপ ঘাত প্রতিঘাতে, ঘর্ষণে প্রতিঘর্ষণে ভারতের হৃদয় ক্রমেই চাঞ্চল্যের তরঙ্গে দোলায়িত হইয়া পড়ে। উল্লিখিত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণ কোন কোন অংশে ব্রাহ্মণ্য পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা এক একটী নির্দ্দিষ্ট দেবতাকে অধিষ্ঠাত্রী করিয়া তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। রামানন্দের রাম সীতা, গোরক্ষনাথের শিব, কবীরের বিষ্ণু, চৈতন্যের হরি, বল্লভাচার্য্যে গোপাল, ইহাঁরা সকলেই অতীন্দ্রিয়, অনাদি, অনন্ত ও অসীম ঈশ্বর বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পূজিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক মত নানকের সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা গুণে সংস্কৃত ও সংশোধিত হইতে আরম্ভ হয়। রামানন্দ, গোরক্ষনাথ ও কবীর যাহা অসম্পন্ন রাখিয়া যান, নানক তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত অতি উদার পদ্ধতি ও প্রশস্ত ভিত্তিতে স্থাপিত হয়, এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শিখগণ সাহসে ও বীরত্বে পবিত্র ইতিহাসের বরণীয় হইয়া উঠে। গুরু গোবিন্দ সিংহ এই প্রশস্ত ভিত্তি-স্থাপিত প্রশস্ত ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক লঘু গুরু,

ক্ষুদ্র বৃহৎ, স্থূল সূক্ষ্ম, সকলকেই এক ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান করিয়া ভ্রাতৃ-ভাবে আলিঙ্গন করেন এবং সকলের শিরায় শিরায় অনির্ব্বচনীয় উৎসাহ-শক্তি তাড়িত বেগে সঞ্চারিত করিয়াছেন।

জগৎ শেঠ।

অনেকের বিশ্বাস, জগৎ শেঠ এক জন লোকের নাম। পাঠশালার ছেলেরা জগৎ শেঠকে একটী লোক বলিয়াই জানে। আমাদের বিদ্যালয়ে প্রকৃত ইতিহাসের চর্চ্চা হয় না, তাই এইরূপ দুই একটী ভ্রম থাকিয়া যায়। জগৎ শেঠ কোন মানুষের নাম নহে। ইহা একটী উপাধি মাত্র। শ্রেষ্ঠি শব্দের অপভ্রংশে বোধহয় শেঠ হইয়াছে। শ্রেষ্ঠি বৈশ্যদের উপাধি। হিন্দু রাজাদের অধিকার-কালে বৈশ্যেরা ধনরক্ষকের কাজ করিতেন। অসময়ে তাঁহারা রাজাকে টাকা ধার দিতেন। মুসলমান্ নবাবদের অধিকার কলে সেই শেঠেরা ধনরক্ষক হন, সময়ে অসময়ে টাকা ধার দিয়া নবাবের সাহায় করেন। এই সময়ে শেঠদিগের অসীম ক্ষমতা। ধনে, মানে, খ্যাতিতে, ইহারা এই সময়ে ভারতবর্ষের অনেক জমীদারের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বর্ক সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, শেঠদিগের কারবার ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের ন্যায় বিস্তৃত। ইহা অত্যুক্তি নহে। শেঠগণ ভারতবর্ষে ধনকুবের ছিলেন। ইঁহারা ভারতবর্ষের "রথ্চাইল্ড" বলিয়া বর্ণিত হইতেন। এক সময়ে ইহারা আপনাদের ক্ষমতাবলে দিল্লীর আমখাসেও আধি-পত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের অর্থ, ইঁহাদের ক্ষমতা, ইঁহাদের মন্ত্রশক্তি অনেক সময়ে দিল্লীর অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত পতাকা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক প্রধান ঘটনার সহিত শেঠদিগের সংস্রব আছে। শেঠগণ এক সময়ে বাঙ্গালার নবাবকে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং এক সময়ে সেই নবাবের বিরুদ্ধেই উঠিয়া,

তাহাকে হতমান ও হতসর্ব্বস্ব করিয়া শ্বেত পুরুষকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন।

যে শেঠবংশের কথা বলা যাইতেছে, তাহা দুই শত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। রাজপুত হইতে এই বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। মাড়বারীগণ শেঠদিগের মূল। শেঠগণ শ্বেতাম্বরীয় জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত। যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত নাগর ইঁহাদের আদি বাসস্থান। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইঁহাদের আদি পুরুষ হীরানন্দ শাহ অর্থ উপার্জ্জন মানসে পাটনায় আসিয়া বাস করেন। হীরানন্দের সাত পুত্র। ইঁহারা সকলেই ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থলে আপনাদের কারবার চালাইতে আরম্ভ করেন। জ্যেষ্ঠের নাম মাণিকচাঁদ। ইঁনি ঢাকায় আসিয়া বাস করেন। শেঠগণ এই মাণিকচাঁদকেই বাঙ্গালায় আপনাদের বংশের স্থাপন-কর্ত্তা বলেন। ঢাকা এই সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রধান স্থান ছিল। মাণিকচাঁদ এইখানে আপনার ভাগ্য-পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। বাঙ্গালার নবাবী এই সময়ে মুর্শিদকুলি খাঁর হাতে ছিল। মাণিকচাঁদ দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দেখাইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই মুর্শিদকুলির প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। ১৭০৪ অব্দে মুর্শিদ কুলি খাঁ ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে যাইয়া রাজধানী স্থাপন করিলে মাণিকচাঁদ মুর্শিদাবাদে আইসেন। এইখানে তাঁহার ক্ষমতা বাড়িয়া উঠে। মাণিকচাঁদ নবাবের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে রাজ্যের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে থাকে। বাঙ্গালার যে সমস্ত জমীদার ও তহশীলদার নবাব-সরকারে রাজস্ব দিতেন, তাঁহাদের সকলেই মাণিকচাঁদের হাতে টাকা দিতে হইত। ইহা ছাড়া দিল্লীতে প্রতি বৎসর যে দেড় কোটী টাকা রাজস্ব দিতে হইত, তাহাও মাণিকচাঁদের হাত দিয়া যাইত। নবাব অনেক সময়ে নিজের টাকাকড়ি মাণিকচাঁদের ধনাগারে জমা রাখিতেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ দিল্লীর সম্রাট ফরুরোক্‌শেরকে অনুরোধ করিয়া ১৭১৫ অব্দে মাণিকচাঁদকে "শেঠ" উপাধি

দেন। মাণিকচাঁদ উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে নিরস্ত থাকেন নাই শেঠ বংশাবলীর কাগজপত্রে উল্লিখিত আছে, মাণিকচাঁদ পূর্ব্বের ন্যায় নবাবী-পদরক্ষা করিবার জন্য মুর্ষিদকুলি খার বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। যাহাহউক, এই সময় হইতে মাণিকচাঁদ ও তাঁহার সন্তানগণ মুর্ষিদাবাদের শাসন-সমিতির প্রধান সভ্য হন। শাসনসংক্রান্ত সকল বিষয়েই ইঁহাদের আধিপত্য থাকে। ইঁহারা অনেক সময়ে দিল্লীর দরবারে প্রধান প্রধান ওমরাহকে পত্র লিখিয়া আপনাদের মতামত নির্দ্দেশ করিতে থাকেন।

মাণিকচাঁদ নিঃসন্তান ছিলেন। ফতেচাঁদ নামে তাঁহার একটী ভ্রাতৃপুত্রকে তিনি দত্তকপুত্র করেন। ফতেচাঁদও "শেঠ" উপাধি পাইয়াছিলেন। সম্রাট্ ফর্‌রোক্ শেরর ইঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। ১৭২২ অব্দে মাণিকচাঁদের মৃত্যু হয়। ফতেচাঁদ তাঁহার পদ অধিকার করেন। কেহ কেহ কহেন, ১৭২৪ অব্দে ফতেচাঁদ যখন দিল্লীতে উপস্থিত হন, তখন সম্রাট্ মুহম্মদ শাহ তাঁহাকে "জগৎ শেঠ" উপাধি দান করেন। আবার কেহ কেহ কহেন, ফতেচাঁদ ফর্‌রোক্ শেরের নিকট হইতে এই উপাধি প্রাপ্ত হন। যাহা হউক, ফতেচাঁদই যে, সকলের আগে "জগৎ শেঠ" উপাধি পাইয়াছিলেন, ইহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। ফতেচাঁদের বড় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, এবং দিল্লীর দরবারে বড় সুখ্যাতি ছিল। কোন সময়ে মুর্ষিদকুলি খাঁ সম্রাটের বিরাগ-ভাজন হওয়াতে বাঙ্গালার নবাবীপদ ফতেচাঁদকে দিবার কথা হয়। কিন্তু মুর্ষিদকুলি খাঁ শেঠ-বংশের সহায় ছিলেন, এজন্য ফতেচাঁদ এই পদ গ্রহণ করেন নাই; বরং সম্রাটের সহিত নবাবের মিল করিয়া দিয়া উপকারীর প্রত্যুপকার করেন। এ বিষয়ে দিল্লী হইতে যে ফর্ম্মান প্রচার হয়, তাহাতে লেখা ছিল, "ফতেচাঁদের বিশেষ চেষ্টায় ও প্রার্থনায় বাঙ্গালার নবাব দিল্লীর সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হইলেন।" নবাব শাসন-সংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ে ফতেচাঁদের পরামর্শ লইতেন। এই সময় হইতে ফতেচাঁদের সন্তানগণ দিল্লীর

দরবারে প্রসিদ্ধ হন। বাঙ্গালার নবাবকে কোন সময়ে খেলাত দেওয়া আবশ্যক হইলে, সেই সঙ্গে জগৎশেঠকেও খেলাত দেওয়া হইত। বাদশাহের নিকট ফতেচাঁদ মণিখচিত একটী উৎকৃষ্ট সিলমোহর উপহার প্রাপ্ত হন। ইহাতে "জগৎ শেঠ" উপাধি ক্ষোদিত ছিল। শেঠবংশীয়গণ বহুকাল পর্য্যন্ত এই মোহরটী যত্নের সহিত রাখিয়াছিলেন।

মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু হইলে সুজাউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হন। ফতেচাঁদ সুজাউদ্দৌলার মন্ত্রিসভার চারি জন সভ্যের মধ্যে এক জন সভ্য ছিলেন। এই নাবব, ফতেচাঁদের পরামর্শ অনুসারে, চৌদ্দ বৎসর বাঙ্গালার শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহার পর সর্‌ফরাজ খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হইলেও ফতেচাঁদ মন্ত্রিসভার সভ্যের পদ ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু শেষে সর্‌ফরাজের ইন্দ্রিয়পরতা ও যথেচ্ছাচারে ফতেচাঁদ বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। শীঘ্র উভয়ের মধ্যে অসদ্ভাব জন্মিল। ইতিহাস-লেখক অর্ম্মি সাহেব কহেন, ফতেচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ পরম সুন্দরী ছিলের। নবাব তাহার রূপলাবণ্যের বিষয় বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন। ফতেচাঁদ নবাবকে এই অনুচিত কাজ হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা পাইলেন, আত্মসম্মান, আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য নবাবকে আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। দুরাচার নবাব অবলীলায়, অসঙ্কোচে আপনার রাজ্যের এক জন প্রধান ব্যক্তির কথায় উপেক্ষা করিয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। ফতেচাদ নিরূপায় হইলেন। যুবতী পুত্রবধূকে নবাবের গৃহে পাঠান হইল। নবাব ক্ষিয়ৎক্ষণমাত্র নয়নযুগল পরিতৃপ্ত করিলেন। যুবতী অকলঙ্কিত শরীরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই ঘটনায় ফতেচাঁদের হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল। অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুর-বাসিনী বধূ পরধর্ম্মাক্রান্ত পরপুরুষের মুখ দেখাতে ফতেচাঁদ আপনাকে বড় অপমানিত জ্ঞান করিলেন। এ বিরাগ, এ অপমান

ও এ ক্ষোভ তিনি আর ভুলিতে পারিলেন না। ক্ষোভে, রোষে ও অপমানে ফতেচাঁদ আপনার বংশের মঙ্গল-বিধাতা মুর্ষিদকুলি খাঁর বংশধরের পক্ষ ছাড়িয়া আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত মিশিলেন।

কিন্তু শেঠবংশীয়গণ এই ঘটনাটী আর এক ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন, মুর্ষিদকুলি খাঁ মাণিকচাঁদের নিকট সাত কোটী টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। এই টাকা আর তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই। ইহার পর সর্‌ফরাজ্ খাঁ এই টাকার জন্য ফতেচাঁদকে পীড়াপীড়ি করাতে তিনি নবাবকে কিছু কাল অপেক্ষা করিতে কহেন। এই সময়ে আলিবর্দ্দী খাঁ বিহারে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। ফতেচাঁদ এই অবসরে তাঁহার সহিত মিশেন। এই বিদ্রোহের ফল বাঙ্গালার ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। গড়িয়ার যুদ্ধে সর্‌ফরাজ্ নিহত হন, এবং আলিবর্দ্দী, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন।

১৭৪৪ অব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুটী পুত্র, পিতা বাঁচিয়া থাকিতেই, এক একটী পুত্র-সন্তান রাখিয়া, পরলোক গমন করিয়াছিলেন। ফতেচাঁদের জ্যেষ্ঠ পৌত্রের নাম মহাতাব রায়, এবং কনিষ্ঠ পৌত্রের নাম স্বরূপচাঁদ। মহাতাব রায় "জগৎ শেঠ" এবং স্বরূপচাঁদ "মহারাজ" উপাধি পাইয়া, দুই জনেই একত্রে আপনাদের কারবার চালাইতে লাগিলেন। এই সময়ে শেঠদিগের বাণিজ্যলক্ষ্মীর বড় উন্নতি হয় কথিত আছে,তাঁহাদের মূলধন ক্রমে দশ কোটী টাকা হইয়া উঠে। ১৭৪২ অব্দে মরহাট্টা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত মুর্ষিদাবাদ লুঠিয়া লন। ইহাতে শেঠদিগের আড়াই কোটী টাকা অপহৃত হয়। মুসলমান ইতিহাস লেখক (সয়ের মতাক্ষরীণ-প্রণেতা গোলাম হোসেন) কহিয়াছেন, শেঠগণ এক কোটী টাকার বিল দেখিবা মাত্র টাকা দিতে পারিতেন। প্রবাদ আছে, শেঠেরা ইচ্ছা করিলে টাকা সাজাইয়া সুতির নিকট ভাগীরথীর মুখ বুজাইয়া ফেলিতে পারিতেন। নবাবের শাসন-সময়ে টাকা রাখিবার জন্য দেশের সকল স্থানে ক্ষুদ্র ধনাগার ছিল না। জমী-

দারগণ রাজস্ব আদায় করিয়া মুর্শিদাবাদের ধনাগারে জমা করিয়া দিতেন। মুর্শিদকুলি খাঁর প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে রাজস্ব-ঘটিত বার্ষিক বন্দোবস্তের সময় সকল জমীদারকেই আপনাদের হিসাবাদি পরিষ্কার করিবার জন্য মুর্শিদাবাদে শেঠদিগের ব্যাঙ্কে আসিতে হইত। এ সম্বন্ধে বার্টসন সাহেব ১৭৬০ অব্দে যে বিবরণ লিখেন, তাহাতে জানা যায়, জগৎশেঠ শত করা অর্দ্ধমুদ্রা দিয়া মুর্শিদাবাদের টাকশালা হইতে টাকা প্রস্তুত করিয়া লইতেন।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ যখন কাশীমবাজারের কুঠি আক্রমণ করেন, তখন ইংরাজেরা ১২ লক্ষ টাকা দিয়া অব্যাহতি পান। এই টাকা শেঠদিগের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল।

১৭৫৩ অব্দে বিলাতের ডিরেক্টর সভা কলিকাতার কৌন্সিলের অধ্যক্ষকে কলিকাতায় একটী টাকশালা স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কৌন্সিলের অধ্যক্ষ শেঠদিগের ধনবাহুল্যের উল্লেখ করিয়া এই অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ হন। এ সম্বন্ধে তিনি ডিরেক্টর-দিগকে স্পষ্টাক্ষরে লিখেন,"আমরা নবাবকে যত টাকা দিব, জগৎ শেঠ তাহা অপেক্ষা অনেক টাকা দিয়া নবাবকে বশীভূত করিবেন। সুতরাং নবাবের নিকট হইতে টাকশালা স্থাপনের অনুমতি পাইবার সম্ভাবনা নাই।" ইহার পর ডিরেক্টর্ সভার অধ্যক্ষ কলিকাতার কৌন্সিলকে জগৎ শেঠের অজ্ঞাতসারে অতি গোপনে দিল্লীর দর-বার হইতে অনুমতি আনিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ১৭৫৮ অব্দে ইঙ্গরেজেরা কলিকাতায় টাক-শালা স্থাপন করেন। কিন্তু জগৎ শেঠের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কার্য্য করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ হয় নাই। ডগলাস্ নামে এক-জন সমৃদ্ধিপন্ন ব্যবসায়ীর সহিত কোম্পানীর টাকা লেনা দেনা ছিল। কলিকাতায় টাকশালা হওয়ার এক বৎসর পরে ডগলাস্ ইঙ্গ-রেজদের মুদ্রিত টাকা লইয়া কারবার চালাইতে অসম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন "জগৎ শেঠ মুর্শিদাবাদের টাকার মূল্য অনায়াসে

কম করিয়া আপনার কারবার চালাইবেন, কিন্তু তিনি তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ইঙ্গরেজদের মুদ্রিত সিক্কা টাকার মূল্য কম করিতে পারেন না।" শেঠেরা কেমন সমৃদ্ধিপন্ন ও কেমন ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাহা ইহাতে সুন্দর বুঝা যাইতেছে।

১৭৫৬ অব্দে আলিবর্দ্দী খাঁর মৃত্যু হয়। এই অবধি শেঠদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের সম্বন্ধ বাড়িতে থাকে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ ও অবরোধ করিলে শেঠেরাই প্রধানত নবাবের সহিত ইঙ্গরেজদের সৌহার্দ্দ স্থাপনের চেষ্টা পান। ইঙ্গরেজেরা যে সময়ে নবাবের আক্রমণে ভীত হইয়া কলিকাতা হইতে পলাইয়া পলতার নিকট উপস্থিত হন, এবং জাহাজে থাকিয়াই নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার গূঢ় মন্ত্রণা করেন, সেই সময়ে শেঠদিগের সহিত ইঙ্গরেজদিগের বিশিষ্ট সংশ্রবের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ২২এ জুন কলিকাতা নবাবের অধিকৃত হয়। ২২এ আগষ্ট কলিকাতার কৌন্সিল নবাবের সহিত সম্মিলনের অভিপ্রায়ে জগৎ শেঠকে এক খানি পত্র লিখিবার প্রস্তাব করেন।

মীরজাফর প্রভৃতি সেরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতিগণ পুর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে গেলে, বাঙ্গালার নবাবের সহিত জগৎ শেঠের অসদ্ভাব জন্মে। জগৎ শেঠ স্বয়ং চেষ্টা করিয়া দিল্লী হইতে সনন্দ আনিয়া নবাবকে দেন নাই, এই তাঁহার এক অপরাধ। তাঁহার আর এক অপরাধ, নবাব তাঁহাকে বণিক্‌দের নিকট হইতে তিন কোটী টাকা তুলিয়া দিতে বলেন, কিন্তু জগৎ শেঠ মহাতাব রায় ইহাতে এই উত্তর করেন যে, এরূপে টাকা তুলিতে গেলে অতিশয় অত্যাচার হইবে। এই কথা শুনিয়া নবাব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার মুখে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন এবং তাঁহকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। মীরজাফর এই সংবাদ পাইয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, শীঘ্রই পুর্ণিয়া হইতে মুর্ষিদাবাদে আসিলেন, এবং জগৎ শেঠকে কারামুক্ত করিয়া দিবার নিমিত্ত নবাবকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। কিন্তু নবাব

এ অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। জগৎ শেঠ কারাগৃহে অবরুদ্ধ রহিলেন, অতঃপর সিরাজের অদৃষ্টচক্র অধোগামী হওয়ার সূত্রপাত হইল।

অপমানিত হইয়া মহাতাব রায় ইঙ্গরেজদের সহিত মিশিয়া সিরাজ-উদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিতে যথাশক্তি চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ১৭৫৬ অব্দের ২৩এ নবেম্বর কৌন্সিলের সভ্যগণ পূর্ব্বের ন্যায় পলতাতেই থাকিয়া গোপনে চক্রান্ত করিতে থাকেন। তাঁহাদের অনুরোধে মেজর ফিলপাট্রিক্ জগৎ শেঠকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে লিখিত ছিল, 'ইঙ্গরেজেরা সমুদয় বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য কেবল জগৎ শেঠের উপরেই নির্ভর করিতেছেন।' প্রকাশ পাইলে পাছে নবাব তাঁহাদের উপর নিষ্ঠুরাচরণ করেন, এই ভয়ে শেঠেরা প্রকাশ্যভাবে কার্য্য-ক্ষেত্রে নামিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান কর্ম্ম-কর্ত্তা রণজিৎ রায়কে কর্ণেল ক্লাইবের সহিত সমুদয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে অনুমতি দিলেন। ১৭৫৭ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের যে সন্ধিপত্র অনুসারে সিরাজউদ্দৌলা ইঙ্গ্রেজদের সমুদয় প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তাহা এই রণজিৎ রায়ের উদ্যোগেই সম্পন্ন হয়।

ইহার পর ক্লাইব চন্দননগর অধিকার করিলেন। নবাবের সহিত ইঙ্গ্রেজদের আবার যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। এই সময় শেঠেরা ইঙ্গ্রেজ-দের বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গৃহে সিরাজ-উদ্দৌলার পদচ্যুতির ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থে ইঙ্গ্রেজদের বল দ্বিগুণ হইয়া উঠিল, এবং তাঁহাদের প্রভাব ও ক্ষমতা ইঙ্গরেজদের বাঙ্গালায় আধিপত্য লাভের প্রধান সহায় হইল।

এই ষড়যন্ত্রের ফল প্রসিদ্ধ পলাশির যুদ্ধ। ১৭৫৭ অব্দের ৩০ এ জুন (পলাশির যুদ্ধের সাত দিন পরে) জগৎ শেঠের গৃহে ষড়যন্ত্রকারিদের প্রাপ্য বিষয়ের মীমাংসা হইল। এই খানেই শ্বেত ও লোহিতবর্ণ সন্ধিপত্রের মর্ম্ম বাহির হয়। এই খানেই উমীচাঁদের মাথায় বজ্র পড়ে।

ইহাতে শেঠদিগের কি লাভ বা কি ক্ষতি হইয়াছিল, ইতিহাসে

তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। কিন্তু ইঙ্গ্‌রেজ-দরবারে শেঠদিগের সম্মান ও সমাদর যে বাড়িয়া উঠে, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। শেঠদিগের মন্ত্রণা ও অর্থবলেই ইঙ্গ্‌রেজদের আধিপত্য লাভ হয়। ১৭৫৯ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নবাব মীরজাফর ও জগৎ শেঠ মহাতাব রায় কলিকাতায় আইসেন। কেবল নবাবের অভ্যর্থনার জন্য ইঙ্গ্‌রেজেরা ৯০,০০০ টাকা ব্যয় করেন। আর জগৎ শেঠের পরিচর্য্যার জন্য ১৭,৩৭৪ অর্কট মুদ্রা ব্যয়িত হয়।

শেঠেরা ষড়যন্ত্র করিয়া সিরাজের বিনাশ সাধন করিলেন বটে, কিন্তু অতঃপর তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। তাঁহারা যত্ন করিয়া মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন, কিন্তু এখন এই অভিনব নবাবের প্রার্থনা পূরণে একান্ত অসমর্থ হইলেন। মীরজাফর তাঁহাদিগকে টাকার জন্য বারংবার বিরক্ত করিতে লাগিলেন। শেঠেরা তাঁহার প্রার্থনানুরূপ অর্থ দান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না। কিন্তু শীঘ্রই মীরজাফরের কার্য্যকাল শেষ হইয়া আসিল। তিনি পদচ্যুত হইলেন। তাঁহার স্থলে মীরকাসেম বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন-দণ্ড গ্রহণ করিলেন।

মীরকাসেম ১৭৬০ অব্দের অক্টোবর মাসে নবাব হইলেন। তিনি সকল বিষয়েই সমান দক্ষতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শেঠদিগের প্রতিও তাঁহার সৌজন্য বিকশিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে শীঘ্রই এ অনুগ্রহ বিলুপ্ত হইল। জগৎ শেঠ মহাতাব রায়ের কপাল ভাঙ্গিবার উপক্রম হইল। ইঙ্গ্‌রেজদের সহিত মহাতাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। মীর কাসেম এজন্য তাঁহাকে সন্দেহ করিতেন। ইঙ্গ্‌রেজদের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে নবাব তাঁহাকে ও মহারাজ স্বরূপচাঁদকে কারারুদ্ধ করিয়া মুঙ্গেরের দুর্গে আনেন। ইহাতে ইঙ্গ্‌রেজ গবর্ণর ১৭৬৩ অব্দে ২৪এ এপ্রেল নবাবকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখেন, "আমি এইমাত্র অমিয়টের পত্রে অবগত হইলাম, মহম্মদ তকি খাঁ ২১এ তারিখ রাত্রিতে মাহতাব রায় ও স্বরূপচাঁদের গৃহে যাইয়া তাঁহাদিগকে হীরা

ঝিলে আনিয়া সৈন্যগণের পাহারায় রাখিয়াছেন। আমি ইহাতে বড় বিস্মিত হইতেছি। যখন আপনি নবাবী পদ গ্রহণ করেন, তৎকালে আমার, আপনার ও শেঠদিগের সাক্ষাতে স্থির হইয়াছিল যে, আপনি শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে শেঠদিগের পরামর্শ লইবেন, এবং কখনও তাঁহাদিগকে কোন প্রকারে অপদস্থ বা হৃতসর্ব্বস্ব করিবেন না। যখন আমি আপনার সহিত মুঙ্গেরে সাক্ষাৎ করি, তখনও আমি এ সম্বন্ধে এই ভাবে আপনাকে অনেক কথা কহিয়াছিলাম, আপনিও শেঠদিগের কোন অনিষ্ট করিবেন না বলিয়াছিলেন। এখন তাঁহাদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিয়া অবরুদ্ধ করা অন্যায় হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের সম্মানের সম্পূর্ণ হানি হইয়াছে, আমাদেরও সন্ধিবন্ধন শিথিল হইয়াছে, এবং আপনার ও আমার সম্মান বিনষ্টপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই আমাদের দুর্নাম করিবে। পূর্ব্বকার নবাবেরা কেহ কখন শেঠদিগকে এমন অপদস্থ করেন নাই।" ইত্যাদি। কিন্তু গবর্ণরের এই অনুরোধ বিফল হইল। উদয়নালার যুদ্ধে পরাজয়ের পর মীরকাসেম ক্রোধে অধীর হইয়া পাটনায় ইঙ্গ্‌রেজদিগকে হত্যা করিলেন, সেই সঙ্গে মহাতাব রায় ও স্বরূপচাঁদও নৃশংসরূপে নিহত হইলেন।

মহাতাব রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কুশলচাঁদ এবং স্বরূপচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম উদয়চাঁদ। বাদশাহ শাহ আলম্ কুশলচাঁদকে 'জগৎ শেঠ' ও উদয়চাঁদকে "মহারাজ" উপাদি দিলেন। ইঁহারা উভয়েই একত্র হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদের কারবার চালাইতে লাগিলেন।

মীরকাসেমের পর মীরজাফর পুনর্ব্বার বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব লইলেন। ইহার পর অবধি শেঠদিগের অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল। মীরকাসেম যখন মহাতাব রায় ও স্বরূপচাঁদকে কারারুদ্ধ করেন, তখন মহাতাবের কনিষ্ঠ পুত্র শেঠ গোলাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র বাবু মিহিরচাঁদ আপন আপন পিতার সঙ্গে ছিলেন। এই অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতৃদ্বয় শেষে অযোধ্যায় উজীরের হাতে পড়েন। ইঁহাদের কারামুক্তি প্রার্থনা করিলে উজীর বহুসংখ্য অর্থ চাহিলেন। কুশলচাঁদ ও

উদয়চাঁদ এজন্য ক্লাইবকে একখানি অনুনয়-পূর্ণ পত্র লিখিয়া আপনাদের দীনতা ও দুরবস্থার বিষয় জানাইলেন। কিন্তু এই বিনয়-পূর্ণ প্রার্থনায় ক্লাইবের হৃদয় গলিল না। ক্লাইব কঠোরভাবে ১৭৬৫ অব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহাদের পত্রের এই উত্তর দিলেন, "আমি যেরূপ যত্নের সহিত আপনাদের পিতার পক্ষ সমর্থন করিয়াছি এবং এই পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতি যেরূপ সৌহার্দ্দ দেখাইয়া আসিতেছি, তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। এখন আপনাদের প্রতিপত্তি রক্ষার ও সাধারণের উপকারের জন্য আপনাদিগকে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা আপনারা বিশেষরূপে বিবেচনা করিতেছেন না, এজন্য আমার বড় ক্ষোভের উদয় হইতেছে * * আমি দেখিতেছি, আপনাদের সমস্ত ধন আপনাদের ঘরে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। * * আমি জানিয়াছি, যখন জমীদারদিগের নিকট গবর্ণমেণ্টের পাঁচ মাসের খাজানা বাকি রহিয়াছে, তখন আপনারা তাঁহাদের নিকট হইতে আপনাদের পিতার প্রদত্ত ঋণের টাকা আদায়ের জন্য তাঁহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিতে ত্রুটী করেন নাই। আমি কখনই এমন কঠোর কার্য্য-প্রণালীর অনুমোদন করিতে পারি না। আপনারা এখনও সাতিশয় সমৃদ্ধিপন্ন বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে, বুঝি আপনাদের এই অর্থ-কামুকতাই শেষে আপনাদের উন্নতির প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়,এবং আপনারা সকল সময়ে সাধারণের উপকারে উদ্যত বলিয়া আমার যে সংস্কার আছে, তাহাও বুঝি নষ্ট হয়।"

শেঠেরা ইহার পর বৎসর ইঙ্গ্রেজদের নিকট ৫০।৬০ লক্ষ টাকার দাবী করেন। এই টাকার ২১ লক্ষ, মীরজাফর ও কোম্পানীর সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য, মীরজাফরকে দেওয়া হইয়াছিল। ক্লাইব এই ২১ লক্ষ টাকার দেনা স্বীকার করেন, এবং ইহা কোম্পানী ও নবাব উভয়েই সমান অংশে শোধ করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। এই বৎসর কলিকাতার কৌন্সিল শেঠদিগের নিকট আবার দেড় লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিতে উদ্যত হন।

ক্লাইবের যত্নে ১৭৬৫ অব্দে কোম্পানী যখন সম্রাট শাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন, তখন কুশলচাঁদ জগৎ শেঠ কোম্পানীর ব্যাঙ্কর হন। এই সময় কুশলচাঁদের বয়স আঠার বৎসর।

লর্ড ক্লাইব কুশলচাঁদকে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু কুশলচাঁদ ইহা লইতে সম্মত হন নাই। কুশল-চাঁদের মাসিক ব্যয় লক্ষ টাকা ছিল। উনত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। কুশলচাঁদ জীবদ্দশায় আপনাদের পুণ্যক্ষেত্র পরেশনাথ পাহাড়ে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া যান। অত্রত্য অনেকগুলি বিগ্রহ তাঁহার প্রদত্ত অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনেকে অনুমান করেন, কুশলচাঁদের অপরিমিত ব্যয়েই শেঠ-দিগের দৈন্যদশা উপস্থিত। কিন্তু ইহার আর কয়েকটী কারণ আছে। ১৭৭০ অব্দের দুর্ভিক্ষে শেঠেরা বিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর ওয়ারেণ্ হেষ্টিংস্ ১৭৭২ অব্দে গবর্ণমেণ্টের ধনাগার মুর্ষিদাবাদ হইতে কলিকায় উঠাইয়া আনেন। এই জন্য ক্রমে তাঁহাদের দুর-বস্থা হয়। শেঠেরা আপনাদের অবনতির আরও একটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহেন, কুশলচাঁদ বহুসংখ্য অর্থ মাটীতে পুতিয়া রাখিয়াছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তিনি সে কথা কাহাকেও বলিয়া যাইতে পারেন নাই। আর কেহই এ বিষয় অবগত ছিলেন না। সুতরাং যেখানকার টাকা সেইখানেই রহিল। কেহই মাটী হইতে তাহা উঠাইতে পারিলেন না।

ইহার পর শেঠদিগের অধঃপতনের কথা। এ কথা অতি সামান্য। কুশলচাঁদের পুত্র ছিল না। ইনি ভ্রাতৃপুত্র হরকচাঁদকে দত্তকপুত্র করেন। ইঙ্গরেজেরা দিল্লীর দরবারের অনুমতি না লইয়াই ইঁহাকে "জগৎ শেঠ" উপাধি দেন। হরকচাঁদের প্রথমে অর্থের বড় অস-চ্ছলতা হইয়াছিল, শেষে তিনি তাঁহার পিতৃব্য গোলাপচাঁদের সম্পত্তি পাইয়া কিছু সচ্ছল হন। হরকচাঁদ প্রথমে অপুত্রক ছিলেন। পুত্র-

কামনায় কোন বৈরাগীর পরামর্শে জৈনধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। শেষে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রচাঁদ "জগৎ শেঠ" উপাধির অধিকারী হন। ইন্দ্রচাঁদের পর তদীয় পুত্র গোবিন্দচাঁদ পিতৃসম্পত্তি সমুদয় নষ্ট করিয়া ফেলেন। গবর্ণমেণ্টে গোবিন্দচাঁদকে কোন উপাধি দেন নাই। সুতরাং তাঁহারা পাঁচ পুরুষ ধরিয়া যে বহুমানিত "জগৎ শেঠ" উপাধি অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা ইন্দ্রচাঁদের সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়। গোবিন্দচাঁদ কিছু দিন পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত মণিমুক্তাপ্রবালাদি বিক্রয় করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন, শেষে কোম্পানী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের কৃত উপকার মনে করিয়া তাঁহার বার্ষিক ১২,০০০ টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

যাহারা ব্যবসায় করে, সাধারণতঃ তাহাদিগকেই শেঠ বলা যায়। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শেঠ উপাধি-ধারী অনেক লোক বাস করে। ইহাদের সহিত মুর্ষিদাবাদের বিখ্যাত জগৎশেঠের কোন সংশ্রব নাই। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ১৭৫১ অব্দের ৩০ এ মে কলিকাতার কৌন্সিলের সভাপতিকে লিখেন, "আমি শুনিলাম, রামকৃষ্ণ শেঠ নামে এক ব্যক্তি মুর্ষিদাবাদে কর না দিয়া, কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসায় চালাইতেছে। ইহাতে আমি বিস্মিত হইতেছি, এই ব্যক্তি কাহারও ভয়ে ভীত নহে। আমি আপনাকে লিখিতেছি, আপনি একজন চোপদার পাঠাইা তাহাকে ধরিয়া আনিবেন, এবং যত শীঘ্র পারেন, এখানে পাঠাইয়া দিবেন। আমি যেমন লিখিলাম, তদনুসারেই যেন কাজ হয়।" এই পত্র পাইয়া কৌন্সিলের অধ্যক্ষ নবাবকে লিখেন, "রামকৃষ্ণ শেঠ কোম্পানীর দাদন লইয়া দ্রব্যাদি যোগাইয়া থাকে। তাহার নিকট কোম্পানীর অনেক টাকা পাওনা আছে। এজন্য তিনি তাহাকে অবরুদ্ধ করিতে পারেন না।" রেবারেণ্ড্ লঙ্‌ সাহেব কলিকাতার যে শেঠবংশের উল্লেখ করিযাছেন, বোধ হয় এই ব্যক্তি সেই বংশীয়। কিন্তু বিখ্যাত জগৎ শেঠের সহিত

ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। লর্ড ক্লাইবের চন্দননগর আক্রমণ-প্রসঙ্গে ইতিহাস-লেখক অর্ম্মি সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, শেঠদিগের সহিত ফরাসীদিগের বন্ধুত্ব ছিল। মহাতাব রায় ও স্বরূপচাঁদ ফরাসী গবর্ণ-মেণ্টকে দেড় কোটী টাকা ঋণ দিয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস, পলাশির যুদ্ধের পূর্ব্বে শেঠগণ ইঙ্গ্‌রেজদিগকে অনেক টাকা দেন। ব্রিটীশ সৈন্যের তরবারির ন্যায় জগৎ শেঠের মন্ত্রণা এবং জগৎ শেঠের অর্থও মুসলমানকে অপসারিত করিয়া শ্বেতপুরুষকে বাঙ্গালার সিংহা-সনে আরোহিত করিয়াছে। এখন শেঠদিগের সে সমৃদ্ধি, সে গৌরব, সে ক্ষমতা অনন্ত সময়ের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। জগৎ শেঠের বংশধর এখন শ্রীভ্রষ্ট হইয়া সামান্য ভাবে দিনপাত করিতেছেন।

বাঙ্গালীর বীরত্ব।

বাঙ্গালার পূর্ব্বে গৌরব অনেক ছিল, বাঙ্গালীর পূর্ব্ব বীরত্বও অনেক ছিল। আপনাদের পূর্ব্ব গৌরব-কাহিনী শুনিলে লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই, এবং উপকার ভিন্ন অপকার নাই। যাঁহাদের মনোবৃত্তি বিকারগ্রস্ত হইয়াছে, তাঁহারা ইহাতে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্য আমাদের এই প্রয়াস নয়।

রঘুবংশে মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয়-বর্ণনায় বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এই ;—

"সেনা-নায়ক সেই রঘু রণতরী আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উপস্থিত বঙ্গবাসিদিগকে পরাজয় করিয়া গঙ্গার মধ্যস্থ দ্বীপে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিলেন।"

ইহাতে বোধ হইতেছে, কালিদাস যখন রঘুবংশ লিখেন, তখন বাঙ্গালী নৌ-যুদ্ধে পটু ছিল এবং তখন বাঙ্গালী স্বাধীন ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, বালী ও যবদ্বীপেও বাঙ্গালীর জয়-পতাকা উড়িয়া-

ছিল। সমুদ্রযাত্রা ও সামুদ্রিক রাজ্য জয়ে বাঙ্গালী যেমন যোগ্যতা দেখাইয়াছে, এমন ভারতবর্ষের আর কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই। পাল ও সেনবংশের বীরত্বের বিবরণ আজও বাঙ্গালা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। মুঙ্গেরে যে একখানি তাম্রশাসন-পত্র পাওয়া যায়, তাহাতে লিখিত আছে, গৌড়ের অধিপতি দেবপাল দেব মুদ্গগিরিতে (মুঙ্গেরে) শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহার যুদ্ধাশ্ব কাম্বোজ দেশে উপনীত হইয়াছিল। রাজসাহীর অনুশাসন-পত্রেও মহারাজ লক্ষ্মণসেনের এইরূপ দিগ্বিজয়-বর্ণনা দেখা যায়। ইতিহাসের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয় রাজারা অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন; এই গঙ্গাবংশীয়দিগের আদিপুরুষ বাঙ্গালী। তমোলুক ও মেদিনীপুর প্রদেশে ইঁহাদের আবাস ছিল। হণ্টর সাহেব লিখিয়াছেন, বিষ্ণুপুরের ভূপতিগণ মুসলমান হইতে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী পূর্ব্বে নিতান্ত ক্ষুদ্র জাতি ছিল না।

একজন সুপণ্ডিত লেখক বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে যাইয়া, বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সকলেরই পড়া উচিত। বাঙ্গালার ইতিহাসে ইঁহার সরস লেখনী হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে,—

"পাঠানেরাই এতদ্দেশে মুসলমান-জয়পতাকা উড্ডীন করেন। ৩৭২ বৎসর পরে তাঁহাদিগের রাজত্বের শেষ সময়ে, এ দেশের কতদূর তাঁহাদিগের অধিকৃত ছিল, একবার বিবেচনা করিয়া দেখা মন্দ নহে। পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে তাঁহাদিগের ক্ষমতা প্রবিষ্ট হয় নাই; দক্ষিণে সুন্দরবন-সন্নিহিত প্রদেশে স্বাধীন হিন্দু রাজা ছিল; পূর্ব্বে চট্টগ্রাম নোয়াখালী এবং ত্রিপুরা, আরাকানরাজ ও ত্রিপুরাধিপতির হস্তে ছিল; এবং উত্তরে কুচবিহার স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। সুতরাং যে সময়ে পাঠানেরা উড়িষ্যা জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহারা ১,৪০,০০০ পদাতিক ৪০,০০০ অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ কামান দেখাইতে পারিতেন, সে সময়েও এ দেশের অনেকাংশ তাঁহাদিগের হস্তগত হয় নাই।"

এগুলি প্রকৃত ইতিহাসের কথা। বাঙ্গালার এই ইতিহাসের সমালোচনা-প্রসঙ্গে উল্লিখিত কথা উদ্ধৃত করিয়া, এক জন সুবিজ্ঞ সমালোচক অভিমানের সহিত বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালার অধঃপতন এক দিনে ঘটে নাই।" স্বদেশবৎসল বাঙ্গালী, স্বদেশের পূর্ব্বতন গৌরবে উন্নত হইয়া যে সরল ভাবে সে সকল বাক্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন, আজ আমরাও সেই সরল ভাবে সেই সরল বাক্যের পুনরুল্লেখ করিতেছি,—"বাঙ্গালার অধঃপতন এক দিনে ঘটে নাই।"

পাঠানেরা যে, কেবল সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র লইয়া বাঙ্গালা অধিকার করিয়াছে, এ কথা মিথ্যা। বাঙ্গালায় পাঠানের উদয়, স্থিতি ও বিলয় হইয়াছে, তথাপি অনেক স্থানে অনেক বাঙ্গালী আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছেন। ইহার পর মোগলের আধিপত্য সময়েও বাঙ্গালীর বীর্য্য-বহ্নি নিবিয়া যায় নাই। যশোহরের প্রতাপাদিত্যের নাম আমাদের দেশের সকলেই জানেন। প্রতাপাদিত্য কখনও কাপুরুষের ন্যায় আপনার স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেন নাই, এবং কখনও কাপুরুষের ন্যায় দিল্লীর সেনাপতির সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। আমাদের দেশে যে সকল পরাক্রান্ত বার ভুঁইয়ার বিবরণ শুনা যায়, প্রতাপাদিত্যে তাঁহাদের অন্যতম। প্রতাপাদিত্য ব্যতীত আরও অনেক পরক্রমশালী ভুঁইয়ার নাম করা যাইতে পারে। ইঁহাদের দুর্গ ছিল, সৈন্য ছিল, যুদ্ধ-পোত ছিল। ইঁহারা যুদ্ধস্থলে বীরত্ব দেখাইতেন, সাহস দেখাইতেন। ইঁহারা সৈন্য দিয়া, অস্ত্র দিয়া, যুদ্ধ-পোত দিয়া বাদসাহের সাহায্য করিতেন। ইঁহারা গৌড়ের অধিপতির অধীনে থাকিয়া, শেষে আপনাদের ক্ষমতাবলে স্বাধীন হন। ইহাঁরা কাহাকেও কর দিতেন না, বা কাহারও অধীনতা স্বীকার করিতেন না। ইহাঁরা আপনা আপনি স্বাধীন রাজা হইয়া, যুদ্ধের জন্য এবং পর্ত্তুগীজ ও মগ দস্যুদের আক্রমণ নিবারণ জন্য সৈন্য ও সামরিক পোত রাখিতেন। বাঙ্গালী পূর্ব্বে বীরত্ব-শূন্য ছিল না।

আমরা এস্থলে এই বলীবীর্য্যশালী বাঙ্গালী ভূস্বামীদিগের আরও দুই এক জনের নাম করিব। বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জের প্রায় এক মাইল উত্তরবর্ত্তী খিজিরপুরের ঈশাখাঁর বীরত্বের বিবরণ আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর লিখিত কোন বাঙ্গালা ইতিহাসে উঠে নাই। ঈশাখাঁ এই নাম শুনিয়াই অনেকে মনে করিতে পারেন, এ ব্যক্তি পাঠান ছিল, সুতরাং ইহার কথা তুলিয়া বাঙ্গালীর বীরত্বের গৌরব করা অসঙ্গত। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি। ঈশাখাঁর পিতা হিন্দু ছিলেন। তাঁহার নাম কালিদাস। হুসেন শাহের রাজত্ব কালে (খ্রীঃ অব্দ ১৪৯৩-১৫২০) কালিদাস মুসলমান-ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন। সুতরাং ঈশাখাঁ পাঠান নহেন, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর সন্তান। বিশেষ বাঙ্গালী ভূস্বামী *।

ঈশাখাঁ সুবর্ণগ্রামে আধিপত্য করিতেন, সমস্ত পূর্ব্ব বাঙ্গালা তাঁহার অধীনে ছিল। তিনি আসামের অন্তর্গত রাঙ্গামাটীতে, বর্ত্তমান নারায়ণগঞ্জের অপর পারস্থ ত্রিবেণীতে, এবং যে স্থানে লক্ষ্যা নদী ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়াছে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী এগারসিন্ধুতে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রালফফিচ্ নামে এক জন ভ্রমণকারী সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হন। তিনি লিখিয়াছেন, "এই সমস্ত দেশের প্রধান রাজার নাম ঈশাখাঁ। তিনি অন্যান্য অধিপতিদিগের মধ্যে প্রধান, এবং খ্রীষ্টান্‌দিগের পরম বন্ধু। ১৫৮৫ খ্রীঅব্দে দিল্লীশ্বরের সেনানী শাহাবাজ খাঁ অনেক সৈন্যসামন্তের সহিত পূর্ব্ব বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন, কিন্তু ঈশাখাঁর পরাক্রমে তাঁহার এই দেশ জয়ের চেষ্টা বিফল হয়। শাহাবাজ খাঁ পরাভূত হইয়া প্রস্থান করেন। ঈশাখাঁর স্বাধীনতা অটল থাকে। এই সময়ে ঈশাখাঁর জয়-পতাকা গোরাঘাট হইতে সমুদ্র-তট পর্য্যন্ত উড়িয়াছিল।

---

* ঈশা খাঁর পিতা কালিদাস অযোধ্যাবাসী ছিলেন। কিন্তু ঈশা খাঁ বাঙ্গালায় আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করেন। সুতরাং ইঁহাকে বাঙ্গালী ভূস্বামী বলিয়া নির্দ্দেশ করা গেল। (এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণাল, ৪৫ খণ্ড।)

১৫৯৫ খ্রীঅব্দে সম্রাট্ আকবরের আদেশে ক্ষত্রিয় বীর-শ্রেষ্ঠ রাজা মানসিংহ আবার বাঙ্গালায় আসিয়া ঈশাখাঁর এগারসিন্ধুর দুর্গ অবরোধ করেন। ঈশাখাঁ তখন উপস্থিত ছিলেন না, দুর্গের অবরোধ সংবাদ শুনিয়া, অবিলম্বে সৈন্যগণের সহিত এগারসিন্ধুতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ কোন কারণ বশতঃ অসন্তুষ্ট হইয়া, যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইল। ঈশাখাঁ কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি রাজা মানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া কহিলেন, এই যুদ্ধে যে জীবিত থাকিবে, সেই বাঙ্গালা একাকী ভোগ করিবে। মানসিংহ ঈশাখাঁর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু ঈশাখাঁ অশ্বারোহণে যুদ্ধস্থলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী একজন তরুণবয়স্ক যুবক, রাজা মানসিংহ নহেন। মানসিংহের জামাতা। ইঁহার সহিতই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মানসিংহের জামাতা নিহত হইলেন। ঈশাখাঁ মানসিংহকে ভীরু বলিয়া ভৎর্সনা করিয়া, শিবিরে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু শিবিরে আসিতে না আসিতেই সংবাদ আসিল, রাজা মানসিংহ যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সংবাদ পাওয়া মাত্র ঈশাখাঁ অশ্বারোহণে তড়িৎগতিতে সমর-ভূমিতে উপস্থিত হইয়া, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, যাবৎ তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে রাজা মানসিংহ বলিয়া ভালরূপে চিনিতে না পারিবেন, তাবৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। শেষে ঈশাখাঁ ভাল করিয়া চিনিলেন যে, উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী যথার্থই রাজা মানসিংহ। সুতরাং যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথম আক্রমণেই মানসিংহের তরবারি বিনষ্ট হইয়া গেল। ঈশাখাঁ আপনার তরবারি রাজাকে দিলেন, কিন্তু রাজা তাহা গ্রহণ না করিয়া অশ্ব হইতে নামিলেন। তাঁহার প্রতিপক্ষ ঈশাখাঁও অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া, নিরস্ত্র রাজার সহিত মল্ল যুদ্ধে উদ্যত হইলেন। মানসিংহ আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন না। প্রতিদ্বন্দ্বীর উদারতা, সাহস ও বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। ক্ষত্রিয় বীর ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অবমাননা করিলেন না;

ঈশাখাঁকে আপ্যায়িত করিয়া, অনেক উপহার দিয়া বিদায় দিলেন।

ঈশাখাঁ ইহার পর রাজা মানসিংহের সহিত আগরাতে সম্রাট আক্‌বরের নিকট উপনীত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে এই স্থানে কারাগারে অবরুদ্ধ করা হইল। শেষে সম্রাট্ যখন এগারসিন্ধুর দ্বন্দ্বযুদ্ধের বিবরণ শুনিলেন, তখন কালবিলম্ব না করিয়া ঈশাখাঁকে কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে "দেওয়ান" ও "মসনদ্‌ইআলি" উপাধি ও বাঙ্গালার অনেক পরগণা দিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে একজন বাঙ্গালীর এইরূপ বীরত্ব ও সাহসের বিবরণ পাওয়া যায়। এক্ষণে ঈশাখাঁর বংশধরেরা পূর্ব্ব বাঙ্গালার সম্ভ্রান্ত জমীদার বলিয়া গণ্য। কিন্তু তাঁহাদের বংশের সে সাহস, সে বীর্য্য এক্ষণে অনন্ত কালের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

ঈশাখাঁকে ছাড়িয়া দিলেও বলবীর্য্যশালী খাটি হিন্দু বাঙ্গালীর অভাব হইবে না। বিক্রমপুরের কায়স্থবংশীয় চাঁদরায় ও কেদার রায় পরাক্রান্ত ভূস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। যে ঈশাখাঁর বীরত্বে মোগল সেনানী বিস্মিত হন, সেই ঈশাখাঁর সহিত এই দুই ভ্রাতার সর্ব্বদা যুদ্ধ হইত। ঈশাখাঁর সহিত যুদ্ধে চাঁদরায় ও কেদার রায় দীর্ঘকাল আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করেন। বাক্লাচন্দ্রদ্বীপের (বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জেলা) কন্দর্প নারায়ণ রায়, ও সুন্দর বনের সন্নিহিত প্রদেশের মুকুন্দরায়ও বীরত্বে বিখ্যাত ছিলেন। ১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দে রালফফিচ বাক্লাচন্দ্রদ্বীপ দর্শন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণে স্পষ্ট বোধ হয়, বাক্লাচন্দ্রদ্বীপ বর্ত্তমান স্বাধীন রাজাদিগের শাসিত রাজ্য অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না। কন্দর্প নারায়ণের অনেক সমর-পোত ছিল। অদ্যাপি তাঁহার একটী পিত্তলের কামান চন্দ্রদ্বীপে আছে। ফরিদপুরের নিকটবর্ত্তী চরমুকুন্দিয়া নামক স্থানে মুকুন্দরায়ের অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম দিল্লীশ্বরের একজন সেনানীকে যুদ্ধে নিহত করেন। তাঁহার পুত্র শত্রুজিৎ মোগল সম্রাট জাহাঁগীরের অধীনতা স্বীকার করেন নাই।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় বাঙ্গালীদিগের এইরূপ প্রতাপ ছিল। অষ্টদশ শতাব্দীতে আমরা যশোহরের রাজা সীতারামকে দেখিতে পাই। কেহ কেহ সীতারামকে একজন ডাকাইত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা এই কথার অনুমোদন করি না। সীতারাম এক জন পরাক্রান্ত হিন্দু জমীদার। সে সময়ে বাঙ্গালায় আর কেহই সাহসে ও বীরত্বে তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। সীতারামের সেনাপতি মেনাহাতীর নামে অদ্যাপি যশোহরের লোকের হৃৎকম্প হইয়া থাকে। সীতারামের পরাক্রম যখন বাড়িয়া উঠে, তখন বাহাদুর শাহ ও ফরুরোখসয়ের যথাক্রমে দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে যশোহর জেলা দ্বাদশ চাক্‌লায় বিভক্ত ছিল। এই সকল চাক্‌লার অধিস্বামীগণ বাদশাহকে কর দিতেন না। বাদশাহ সীতারামের পরাক্রমের কথা শুনিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকেই এই অবাধ্য জমীদারদিগকে বশীভূত করিতে অনুরোধ করেন। সীতারাম বাদশাহের আদেশ-লিপি পাইয়া, অবিলম্বে অবাধ্য জমীদারদিগকে দমন করিয়া দ্বাদশ চাক্‌লার অধিকারী হন এবং বাদশাহ হইতে এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। ইহার পর সীতারাম বাঙ্গালার নবাবের অধীনতা উচ্ছেদ করিলে. নবাব তাঁহার শাসন জন্য অনেকবার সৈন্য পাঠান, কিন্তু সীতারামের বীরত্বে নবাবের সৈন্য বারংবার পরাভূত হয়। নবাব অবশেষে অনেক সৈন্যের সহিত স্বীয় জামাতা আবুতরাবকে প্রেরণ করেন। মহাপরাক্রম মেনাহাতী সীতারামের অনুপস্থিতিতেই এই সৈন্যদল পরাজয় করেন, এবং নবাব-জামাতা আবুতরাবের ছিন্ন মস্তক আনিয়া, সীতারামকে দেখান। পূর্ব্বে বাঙ্গালী শত্রুর আক্রমণে পলায়ন করিত না।

যে সময়ে আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, সে সময়ে রাজা কীর্ত্তিচাঁদ ও রাজা রামনারায়ণ শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। মস্তাফা খাঁ যখন বিদ্রোহী হইয়া আলিবর্দ্দী খাঁর সৈন্য দল পরিত্যাগ পূর্ব্বক আজিমা-

বাদ আক্রমণ করেন, তখন তথাকার দেওয়ান জৈন উদ্দীন, কীর্ত্তিচাঁদ ও রামনারায়ণের হস্তে সৈন্যাধক্ষ্যতা সমর্পণ করেন। ইঁহারা অন্যান্য মুসলমান সেনাপতির ন্যায় মস্তাফা খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকের মতে সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি দেওয়ান মাণিক-চাঁদ ও মোহনলাল বাঙ্গালী। সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতায় ইঙ্গ্রেজদের দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন মাণিকচাঁদ আক্রমণকারী সৈন্যদলের অধ্যক্ষ ছিলেন। পলাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে মোহনলালের কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাস-পাঠ-কের অবিদিত নাই। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মীর-জাফর বিশ্বাসঘাতক হইয়া সিরাজউদ্দৌলাকে কুপরামর্শ না দিলে, পলাসীর যুদ্ধে জয়ী হওয়া ক্লাইবের পক্ষে দুর্ঘট হইত। বাঙ্গালী এক সময়ে ব্রিটীষ তেজের নিকটেও অবনত হয় নাই।

অধিক উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। যাহা কিছু বলা হইল, তাহাতে বাঙ্গালী ব্রিটিষ অধিকারের পূর্ব্বে কিরূপ ক্ষমতাপন্ন ছিল, বুঝা যাইবে। আমরা এক্ষণে বাঙ্গালীর সাহসের একটি উদাহরণ দিব। ইতিহাস নির্দ্দেশ করে, সূরবংশীয় ফরিদ স্বহস্তে একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র হত্যা করিয়া 'শের শাহ' নাম ধারণ করেন। অস্তাজিলো এক সময়ে এইরূপ পরাক্রম দেখাইয়া 'শের আফগান' নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক অতুললাবণ্যবতী নূরজাহানের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। একাকী একটা বাঘকে মারিয়া ফেলাতে ইতিহাসে এই দুই বীরের সাহসের বড় প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। ফরিদ ও অস্তাজিলে যে সাহস দেখাইয়া ইতিহাসে নাম রাখিয়াছেন, হতভাগ্য বাঙ্গালার একজন হিন্দু যুবকও এক সময়ে সেই সাহস দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাসের পত্রে আজ পর্য্যন্তও তাঁহার নাম পাওয়া যায় না। এই বাঙ্গালী যুবকের নাম উদয়নারায়ণ, বাসস্থান ঢাকার অন্তঃপাতী উলাইল পরগণা। উদয়নারায়ণ মজুমদার-উপাধিক মিত্র-বংশীয়। বাক্লাচন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণের বংশের সহিত ইঁহার

নিকট সম্পর্ক ছিল। কালক্রমে কন্দর্পনারায়ণের বংশ লোপ হইলে, তাঁহাদের সমস্ত ভূসম্পত্তি উদয়নারায়ণের হস্তগত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে মুর্ষিদাবাদের নবাব বংশের এক ব্যক্তি উদয়নারায়ণকে এই অধিকার হইতে বিচ্যুত করেন। উদয়নারায়ণ মুর্ষিদাবাদে যাইয়া নবাবকে ইহা জানাইলে, নবাব কহেন, যদি উদয়নারায়ণ স্বহস্তে একটী ব্যাঘ্র বধ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সমস্ত সম্পত্তি দেওয়া যাইবে। উদয়নারায়ণ বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও সাহসী ছিলেন, নবাবের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না। অবিলম্বে একটী ভয়ঙ্কর প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং অস্ত্র-সঞ্চালন-কৌশলে তাহাকে হত্যা করিয়া, আপন সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। বাঙ্গালী পূর্ব্বে কেবল বলশালী ছিল না, সাহসী বলিয়াও বিখ্যাত ছিল।

ভারতে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের প্রাধান্য।

পাটলীপুত্র-রাজ অশোক ও কাশ্মীর-রাজ কনিষ্কের উৎসাহে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পরিপুষ্টি ও বিস্তৃতি হয়। ধর্ম্মপ্রচারকেরা চারি দিকে যাইয়া অহিংসা ও সাম্যের মহিমা ঘোষণা করিতে আরম্ভ করেন। অশোকের সময়ে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারিত হইয়াছিল। ইহার ছয় শত বৎসর পরে পালিভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম-পুস্তক সকল লিপিবদ্ধ হয়। এই সময়ে ধর্ম্ম-প্রচারকেরা সিংহল দ্বীপ হইতে ব্রহ্মদেশে গমন করেন। খ্রীঃ ৬৩৮ অব্দে শ্যামদেশের অধিবাসিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। ইহার কিছু পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মপ্রচারকেরা যাবায় যাইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন করেন। এইরূপে দক্ষিণ দিকে দেশের পর দেশ যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিকট অবনত-মস্তক হইতেছিল, তখন কতিপয় প্রচারক মধ্য এশিয়া অতিক্রম পূর্ব্বক চীনে যাইয়া

আপনাদের ধর্ম্ম বদ্ধমূল করেন। কনিষ্কের রাজত্ব কালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের জীবনীশক্তি আবার উদ্দীপিত হয়। ধর্ম্মপ্রচারকেরা তিব্বতে, মধ্য এশিয়ার দক্ষিণাংশে ও চীনে গমন করেন। এদিকে পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর ও পূর্ব্বে কোরিয়া পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রসারিত হয়। খ্রীঃ ৩৩২ অব্দে কোরিয়া-বাসিগণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। খ্রীঃ ৫৫২ অব্দে কোরিয়ার প্রচারকেরা জাপানে যাইয়া তদ্দেশীয়দিগকে আপনাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কোনও ধর্ম্ম পৃথিবীতে এত সম্প্রসারিত হয় নাই, কোনও ধর্ম্মের প্রতি পৃথিবীর এত অধিক লোকে আদর ও সম্মান দেখায় নাই। চব্বিশ শত বৎসরের মধ্যে সমস্ত মানব জাতির চতুর্থাংশ বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিস্তৃত হয়। বুদ্ধের সমকালে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরা প্রবল ছিলেন। ব্রাহ্মণের আধিপত্য ও ব্রাহ্মণের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত করিতে কেহই সাহসী হইত না। কেবল মহামতি শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অসমসাহসিকতার পরিচয় দেন। বুদ্ধ ধীরে ধীরে আপনার মত প্রকাশ করেন, ধীরে ধীরে লোকে তাঁহার অনুশাসনের বশবর্ত্তী হয়, এবং শেষে ধীরে ধীরে তদীয় ধর্ম্ম পৃথিবীর অনেক স্থানে ব্যাপিয়া পড়ে। যে ধর্ম্মে সুখ-ভোগের প্রলোভন নাই, অন্তিমে অনন্ত পদ প্রাপ্তির আশা নাই, যে ধর্ম্ম সৃষ্টি-কর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, সমুদয় বিষয়ের বিধ্বংসই যে ধর্ম্মের এক মাত্র উদ্দেশ্য, সেই ধর্ম্ম কি কারণে এত বহুল-প্রচার হইল, কি কারণে ভারতবর্ষের জ্ঞানী লোকের সহিত, মধ্য এশিয়ার নিরক্ষর ও অসভ্য অধিবাসীরা সেই ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। যখন প্রাচীন হিন্দু আর্য্যেরা প্রসন্নসলিলা সিন্ধুসরস্বতীর প্রশস্ত তটে বসিয়া ভক্তিভাবে ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু প্রভৃতি উপাস্য দেবতার উপাসনা করিতেন, তখন তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বরের দিকে তত দৃষ্টি রাখেন নাই। শেষে সময়ের পরিবর্ত্তনে কর্ম্মকাণ্ডের আড়ম্বরের বৃদ্ধি পায়,

ব্রাহ্মণেরা যাগ যজ্ঞের শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া আপনাদের প্রভুত্ব দেখাইতে উদ্যত হন। মাতৃগর্ভে অবস্থান হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, জীব প্রতি মুহূর্ত্তে একএকটী ক্রিয়ার সহিত আবদ্ধ হইতে থাকে। অনেক যজ্ঞের অনেক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়। প্রতিযজ্ঞের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণেরা এই সকল বিষয়ের একমাত্র কর্ত্তা ছিলেন। দশবিধ সংস্কার হইতে সমস্ত যাগ যজ্ঞের ব্যবস্থা তাঁহাদের আয়ত্ত ছিল। ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতিরেকে কোনও পাপ ক্ষালিত হয় না, ব্রাহ্মণ না আসিলে কোনও গৃহস্থ কোনও ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে পারেন না। দৈনন্দিন কার্য্যও ব্রাহ্মণের সাহায্য-সাপেক্ষ। কোন্ সময়ে কোন্ পরিচ্ছদ কি ভাবে পরিধান করা যাইবে, কোন্ বায়ু নিঃশ্বাসে লইতে হইবে, তাহা ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহই জানে না। ইহার পর কোন্ যজ্ঞে কোন্ দেবতার আবাহন করা উচিত, কোন্ দেবতাকে কি কি দ্রব্য উপহার দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা কেবল ব্রাহ্মণেরাই বলিতে পারেন। ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে, যদি পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণে একটু দোষ হয়, পবিত্র অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে একটু অসাবধানতা দেখা যায়, পবিত্র যজ্ঞীয় দ্রব্যের ব্যবহারে একটু ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে গৃহীর সর্ব্বনাশ হইতে পারে। সুতরাং হিন্দুরা সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। হিন্দু ব্যতীত পৃথিবীর আর কোন জাতি কোন সময়ে পুরোহিতের এরূপ বশীভূত হয় নাই। ব্রাহ্মণের এরূপ অনুগত হইলেও হিন্দুরা মানসিক শক্তিতে ন্যূন ছিলেন না। তাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, মার্জ্জিত-বুদ্ধি ও চিন্তাশীল ছিলেন। তত্ত্বজ্ঞানে তাঁহাদের হৃদয় ক্রমে উন্নত ও প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের জটিলতা, যজ্ঞ-স্থলে পশু-হত্যার সময়ে নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা, ইহার উপর ব্রাহ্মণের একাধিপত্য দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন। ক্রমে তাঁহাদের শান্তি তিরোহিত

হইল, ক্রমে তাঁহার কোন নূতন প্রণালীর জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

মহামতি শাক্যসিংহ যখন আপনার ধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন হিন্দুদিগের হৃদয় এইরূপ তরঙ্গায়িত ছিল। এই অশান্তির সময়ে শাক্যসিংহকে হিংসা ও বৈষম্যের মূলোচ্ছেদে কৃতহস্ত দেখিয়া অনেকে আশ্বস্ত হয়। ব্রাহ্মণেরা আপনাদের ধর্ম্মতত্ত্বসকল লুক্কায়িত অবস্থায় রাখিতেন। ধর্ম্ম তাঁহাদের নিকট গোপনীয় সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। যাহাতে বিজাতি ও বিদেশী ইহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, সে বিষয়ে তাঁহারা সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। বুদ্ধ যখন এই সঙ্কুচিত ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, "সকলে সমান" বলিয়া সকলকে সমভাবে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন, স্বজাতি বিজাতি, স্বদেশী বিদেশী, সকলের নিকট যখন আপনার মত প্রকাশ করিলেন, তাঁহার শিষ্যগণ যখন সকল স্থানে সকলের নিকট, তদীয় মতের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে লাগিল, গ্রামে, নগরে, রাজার প্রাসাদে, দরিদ্রের পর্ণ-কুটীরে যখন "সকলে সমান," "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই মহাধ্বনি সমুত্থিত হইল, তখন অনেকে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া বুদ্ধের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। ক্রমে এই সাম্যের মহিমাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম অনেক স্থানে ব্যাপিয়া পড়িল।

ভারতবর্ষে প্রথমে শাক্যসিংহই সাম্যের মহিমা ঘোষণা করেন। শাক্যসিংহের পূর্ব্বে আর কেহই সমস্ত বৈষম্যের বন্ধন উচ্ছেদ পূর্ব্বক সকলকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হন নাই। সকলের প্রতি এইরূপ ভ্রাতৃভাব প্রদর্শিত হওয়াতে সকলের মধ্যে সমবেদনার সঞ্চার হয়। বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ একতাস্থাপন ও এইরূপ সমবেদনার উৎপাদন, বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটী ফল। ইহার পর বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্য মগধ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ হয়। দক্ষিণাপথ আর্য্যাবর্ত্তের সহিত সংযোজিত হইয়া উঠে। চন্দ্রগুপ্ত মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা; অশোক এই সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ-কর্ত্তা। অশোক

অনেক স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারক পাঠাইয়া অনেককে এক ভূমিতে আনয়ন করেন। ইহাতে তাঁহার সাম্রাজ্যের পরিপুষ্টি হয়। এত দিন দক্ষিণাপথ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। দক্ষিণাপথে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবেশ করাতে ক্রমে উহা আর্য্যাবর্ত্তের সহিত একতা-সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া উঠে। সভ্যতার প্রথম অবস্থায় খণ্ড রাজ্য থাকা ভাল, কিন্তু সভ্যতা বদ্ধমূল হইলে বৃহৎ রাজ্যে অনেক উপকার হয়। অশোকের সাম্রাজ্যের বলবৃদ্ধিতে উপকার হইয়াছিল, যেহেতু বক্ট্রিয়ার গ্রীক অথবা অন্য কোন বিদেশীয় রাজা ভারতবর্ষে আসিয়া উৎপাত করিতে সাহসী হয় নাই।

যখন আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবিষ্ট হন, তখন তাঁহারা আপনাদের ভাষার প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন। এদিকে ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী অনার্য্যদিগের ভাষা স্বতন্ত্র ছিল। ক্রমে অনার্য্যেরা আর্য্যদের সহিত সম্মিলিত ও আর্য্যদের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে পরস্পরের কথাবার্ত্তা বুঝিবার জন্য আর্য্যদের ভাষা অনেক অংশে আয়ত্ত করে। এইরূপে আর্য্য ও অনার্য্য ভাষার সংমিশ্রণে একটী স্বতন্ত্র ভাষার উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাবে যখন অনার্য্যদের উন্নতি হয়, যখন শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাদের ভাষাও উন্নত হইয়া উঠে। এইরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের জন্য প্রাকৃত ও পালি ভাষার পরিপুষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত যাগ যজ্ঞে পশু-হত্যা ও সোম প্রভৃতি সুরার ব্যবহারও অল্প হইয়া আইসে।

এদিকে ব্রাহ্মণেরা নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা নানা উপায়ে আপনাদের ধর্ম্ম সঞ্জীবিত করিতেলাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিতে হিন্দুধর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হয় নাই। স্থানে স্থানে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। শ্রমণের ন্যায় ব্রাহ্মণেরাও স্থানে স্থানে সম্পূজিত ও সম্মানিত হইতেছিলেন। অহিংসার পার্শ্বে হিংসার, সাম্যের পার্শ্বে বৈষম্যেরও প্রভাব দেখা যাইতে ছিল। খ্রীঃ ২৪৪ বৎসর পূর্ব্ব হইতে খ্রীঃ ৮০০ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ এক হাজার বৎসরেরও

অধিক কাল উভয় ধর্ম্মের এইরূপ প্রাধান্য ছিল। পরবর্ত্তী দুই শত বৎসরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ক্রমে অবনতি হইয়া আইসে। মহারাজ অশোকের পর ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উন্নতি-স্রোত যখন সঙ্কীর্ণ হয়, তখন যে সকল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এতদিন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন, তাঁহারা বিপুল উৎসাহের সহিত কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহাদের এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। ব্রাহ্মণের বিদ্যা বুদ্ধির মহিমায় ও ক্ষত্রিয়ের অর্থের ক্ষমতায় হিন্দুধর্ম্ম পুনর্ব্বার উন্নত হইতে থাকে। বৌদ্ধের চৈত্য, বৌদ্ধের স্তূপ, বৌদ্ধের মঠ, ভারতবর্ষ প্রায় ছাইয়া ফেলিয়াছিল; ইহার পর বৌদ্ধের অট্টালিকা স্থানে স্থানে শোভা বিকাশ পূর্ব্বক সাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। হিন্দুগণ ইহা দেখিয়া বৃহৎ ও সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। এই সকল মন্দিরে রামায়ণ ও মহাভারতের বীরগণের প্রতিমূর্ত্তির পূজা হইতে লাগিল। লোকে বৌদ্ধ-মন্দিরের পার্শ্বে হিন্দু-মন্দিরের গৌরব দেখিয়া বিস্মিত হইল, এবং বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে রামসীতা, কৃষ্ণার্জ্জুনের প্রতিমূর্ত্তির পূজায় হিন্দুদের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিল। এদিকে হিন্দুরা কোমল ভাষায়, কোমল কণ্ঠে আপনাদের ধর্ম্ম-বীর ও যুদ্ধ-বীরগণের চরিত্র নানা স্থানে গাইতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র লোকে এই মধুর কথা শুনিয়া সন্তৃপ্ত হইতে লাগিল। ইহার উপর হিন্দু যোগীরা স্বার্থ ত্যাগে ও কঠোর ব্রতাচরণে বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে অধঃকৃত করিয়া তুলিলেন। হিন্দু যোগীরা প্রখর রৌদ্রে, প্রবল বর্ষায়, অনাবৃত স্থানে উলঙ্গ অবস্থায় থাকিয়া একান্ত মনে যোগাভ্যাস করিতেন। গ্রীকেরা ইঁহাদের কষ্ট-সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিয়াছিলেন। এখন সাধারণে ধর্ম্মের জন্য ইঁহাদের এইরূপ অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ দেখিয়া, দলে দলে হিন্দুদের পদানত হইতে লাগিল। হিন্দুদের আর একটী সুবিধা ছিল। হিন্দু-সমাজে থাকিয়া সকলেই আপনাদের রুচি ও শক্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন

প্রকারে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিত। কেহ দেবতার পূজা করিত, কেহ একেশ্বরের উপাসনা করিত। কেহ ব্রাহ্মণের ও স্বশ্রেণীর অন্ন ভিন্ন আর কাহারও অন্ন গ্রহণ করিত না, কেহ বা ইচ্ছানুসারে সকলের অন্নই গ্রহণ করিতে পারিত। কিন্তু এ সুবিধা বৌদ্ধ ধর্ম্মে ছিল না। বৌদ্ধদের সকলকেই সৃষ্টি-কর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতে হইত। অবশেষে বৌদ্ধেরা নানাদলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং তাঁহারা সকল শ্রেণীর মনোরঞ্জনে অসমর্থ হওয়াতে হীনবল হইয়া পড়িলেন। এ দিকে ব্রাহ্মণেরা যথোচিত সাহস সংগ্রহ করিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা কিছুতেই বিমুখ হইলেন না। সহস্র সহস্র লোকে তাঁহাদের ক্ষমতা ও একাগ্রতা দেখিয়া বিস্মিত হইল, সহস্র সহস্র লোকে অবনত মস্তকে তাঁহাদের পদ্ধতি গ্রহণ করিতে লাগিল। খ্রীঃ ১,০০০ অব্দে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব কমিল। হিন্দুধর্ম্ম আবার গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল।

বৌদ্ধদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য হিন্দুগণ সকল বিষয়েই আপনাদের শক্তি ও ক্ষমতার পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হন। সুতরাং ধর্ম্ম-বিপ্লবে হিন্দুগণ ক্রমে চিন্তাশীল হইয়া উঠেন, ক্রমে তাঁহারা অভিনব বিষয়ে উদ্ভাবনা দেখাইয়া, সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতে থাকেন। উপনিষদে যে সকল গভীর তত্ত্বের বিবরণ আছে, বোধ হয় তাহাই সমস্ত জগতের আদিম দর্শন শাস্ত্র। ঐ গুলি সে সময়ে বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। মহাভারতের সময়ে দর্শনশাস্ত্রের আবার জীবনীশক্তি লক্ষিত হইলেও তাদৃশ উন্নতি হয় নাই। মহামতি শাক্যসিংহ যখন ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের বিরুদ্ধবাদী হইয়া উঠেন, সকল স্থানে যখন সাম্য ও অহিংসার আদর লক্ষিত হইতে থাকে, তখন ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্রচিন্তায় বুদ্ধকে অধঃকৃত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। হিন্দুদের এইরূপ মানসিক উন্নতিতে দর্শন-শাস্ত্রের উন্নতি হইতে থাকে। এই সময়ে উন্নতাবস্থ ষড়্দর্শনের প্রচার হয়।

স্মৃতি আর্য্যদের আচার-ব্যবহার বিষয়ক গ্রন্থ। বৈদিক সময়ে ইহা পরিপুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এই সময়ে ইহা সংস্কৃত ও সুশৃঙ্খল হয়। এইরূপে ধর্ম্মবিপ্লব-সময়ে প্রায় সকল দিকেই হিন্দুদিগের মানসিক উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ভারতবর্ষের গৌরবের একটী প্রধান সময় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

ইহার পর অন্যান্য বিষয়েও সাধারণের উন্নতি ও অধ্যবসায়ের চিহ্ন দেখা যাইতে থাকে। জ্ঞান-ভাণ্ডারের এক দিকে প্রতিভা ও গবেষণার আলোক বিকাশ পাইলে ক্রমে অন্যান্য দিকেও উহার আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, এবং লোক-সমাজের এক দিকে উদ্যম, অধ্যবসায় ও কার্য্যকারিতার স্রোত প্রবাহিত হইলে, ক্রমে সেই স্রোত সমস্ত সমাজে ব্যাপিয়া পড়ে। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে ভারতবর্ষের ঠিক এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। বুদ্ধ যে বিপ্লবের সূত্রপাত করেন, তাহাতে ভারতের লোক-সমাজ এক হাজার বৎসরেরও অধিক কাল সজীব ও সচেষ্ট ছিল। এই সময়ে সমাজের সকল বিভাগেই অবিচ্ছিন্ন উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সঞ্চার দেখা যাইতেছিল, সকল বিভাগই যেন কোন অনির্ব্বচনীয় তেজের মহিমায় সর্ব্বদা কার্য্যতৎপর ছিল। এই সময়ে হিন্দুরা বিস্তীর্ণ সাগরের তরঙ্গ-মালা অতিক্রম পূর্ব্বক বালী ও যব দ্বীপে আধিপত্য স্থাপন করেন, আরব ও মিশরের সহিত বাণিজ্যব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে আপনাদিগকে বরণীয় করিয়া তুলেন। ইঁহাদের দূতগণ রোমক সম্রাটের নিকট আদর সহকারে পরিগৃহীত হন, ইঁহাদের কার্পাস বস্ত্র, মসলিন, রেসমী কাপড়, নীল, চিনি, হীরক, মুক্তা প্রভৃতি আরব ও মিশরের বণিকগণ গ্রহণ করিয়া আপনাদের দেশ সমৃদ্ধ করিতে থাকেন, এবং ইঁহাদের শাসন-প্রণালীর শৃঙ্খলা ও নগরের পারিপাট্য দেখিয়া বিদেশী ভ্রমণকারীরা ইঁহাদিগকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলেন। এদিকে আর্য্যেরা সারস্বতী শক্তির উপাসনাতেও বিশেষ যত্নপর হন। তাঁহারা জ্ঞানের মহিমায় ক্রমে জগ-

তের শ্রদ্ধাস্পদ হইয়া উঠেন। খ্রীষ্টীয় শাকের প্রারম্ভ হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয়গণ শাস্ত্রালোচনায় আপনাদের অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। বৈদিক সময়ে যজ্ঞাদির শুভ ক্ষণ নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে জ্যোতির্ব্বিদ্যার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছিল, ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে ভিন্ন ভিন্ন আকারের বেদী-নির্ম্মাণপ্রসঙ্গে জ্যামিতি ও গণিত বিদ্যারও যৎসামান্ত উন্নতি হইয়াছিল এবং স্বরসংযোগে বেদগান-সময়ে মন্ত্রের উচ্চারণ-বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রসঙ্গে ব্যাকরণেরও কিঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু এই সময়ে প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে জ্যোতিষ ও গণিতের অনুশীলন আরম্ভ হয়। বরাহমিহির এই সময়ে জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। আর্য্যভট্ট এই শাস্ত্রের উৎকর্ষ বিধানে যত্নশীল হন। ভাস্করাচার্য্য ও তদীয় দুহিতা লীলাবতী গণিতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। চরক ও সুশ্রুতের চিকিৎসাবিদ্যার ভূয়সী উন্নতি হয়। কালিদাস অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, অত্যুৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া সকলের বরণীয় হন। অমরসিংহ অভিধান সঙ্কলন পূর্ব্বক সাহিত্য আলোচনার পথ সুগম করিয়া দেন। এই রূপে ভারতবর্ষের এই গৌরবের সময়ে সকল বিষয়েরই ক্রমোৎকর্ষ হইতে থাকে। আরবেরা ভারতবর্ষ হইতে জ্ঞান-রত্ন আহরণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করেন। ক্রমে রোমে উহার আলোক প্রসারিত হয়। এই সময়ে ইঙ্গলণ্ড ও ফ্রান্স অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, এবং এই সময়ে জর্ম্মণীর নিরক্ষর অসভ্যগণ আপনাদের আরণ্য ভূখণ্ডে মৃগয়ার আমোদে পরিতৃপ্ত হইতেছিল।

হিউয়েন্থ সাঙ্গের ভারত-ভ্রমণ।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীনদেশে বদ্ধমূল হইলে তদ্দেশীয় ধর্ম্ম-প্রচারকগণ আপনাদের দেশীয় ভাষায় ধর্ম্মপুস্তক সমূহের অনুবাদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থল। কপিলবস্তু,

বুদ্ধগয়া, শ্রাবস্তী বৌদ্ধদিগের পরম পবিত্র তীর্থ। সুতরাং পবিত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের সংগ্রহ মানসে চীন-দেশীয় বৌদ্ধগণ ভারতবর্ষে আসিতে উদ্যত হন। চীন হইতে ভারতবর্ষে স্থল-পথে আসিতে হইলে অনেক দুর্গম স্থান অতিক্রম করিতে হয়। বৃক্ষ-লতাশূন্য বিস্তীর্ণ মরুভূমি, তুষার-মণ্ডিত দুরারোহ পর্ব্বত, অন্ধকারময় সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট পদে পদে পথিকের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু অধ্যবসায়-সম্পন্ন চীন-দেশীয়গণের অধ্যবসায় বিচলিত হইল না। তাঁহারা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনেও প্রস্তুত হইয়াছিলেন, পথের এই দুর্গমতা তাঁহাদের নিকট সামান্য বোধ হইল। প্রথমে কয়েক জন স্বদেশ হইতে বাহির হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। কেহ কেহ গোবি মরুভূমিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, কেহ কেহ অগম্য স্থানে উপনীত হওয়াতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। সাহসী পরিব্রাজক চিটেওয়ান্ খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষে আসিলেন বটে, কিন্তু সাধারণের নিকট আপনার অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পরিচয় দিতে পারিলেন না। তাঁহার গ্রন্থ বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হইয়া গেল। অবশেষে খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে একটী ক্ষুদ্র দল বহু কষ্টে বহু বাধা অতিক্রমপূর্ব্বক সপ্তসিন্ধুর প্রসন্ন-সলিল-বিধৌত ভূখণ্ডে উপস্থিত হইলেন। এই ক্ষুদ্র দলে পাঁচ জন শ্রমণ ছিলেন। ইঁহাদের অধিনায়কের নাম ফাহিয়ান। ফাহিয়ান খ্রীঃ ৩৯৯ অব্দ হইতে খ্রীঃ ৪১৪ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ইঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত। ফাহিয়ানের পর হিউয়েন্থসাঙ্গ ও সংযুনের ভ্রমণ-বিবরণ প্রকাশিত হয়। এই দুই জন শ্রমণ খ্রীঃ ৫১৮ অব্দে চীনের সম্রাট্-পত্নী কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইহার এক শত বৎসর পরে আর এক জন ধর্ম্মবীর স্বদেশ হইতে ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। ইনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিদর্শনে এবং নানা শাস্ত্রপাঠে ভূয়োদর্শিতা সংগ্রহপূর্ব্বক

স্বদেশে যাইয়া সাধারণের সম্পূজিত হইয়াছিলেন। ইহাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত গবেষণা ও দূরদর্শিতায় পরিপূর্ণ। ইনি ভারতবর্ষের তদানীন্তন অবস্থা যথাযথ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সাধনা যেমন বলবতী ছিল, সিদ্ধিও তেমনি মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছিল। ইনি আপনাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে বহুদর্শিতা লাভের জন্য বিঘ্ন-বিপত্তি-পূর্ণ সময়ে রাজার অজ্ঞাতসারে, রাজকীয় আদেশের বিরুদ্ধে স্বদেশ হইতে যাত্রা করেন, এবং শেষে অভীষ্ট বিষয় সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজদত্ত সম্মানে গৌরবান্বিত হন। চীনের এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অবিচলিত-হৃদয় ধর্ম্ম-বীরের নাম হিউয়েন্থ সাঙ্গ।

হিউয়েন্থ সাঙ্গ চীন দেশের কোন একটী উপবিভাগের নগরে খ্রীঃ ৬০৩ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে চীন সাম্রাজ্য দীর্ঘকাল-স্থায়ী অন্তর্বিদ্রোহে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার পিতা কোন রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, শেষে কাজ ছাড়িয়া আপনার সন্তান-চতুষ্টয়কে শিক্ষা দিতে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। এই চারি সন্তানের মধ্যে দুইটী বাল্যকালেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সার-গ্রাহিতার জন্য প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ইহাদের অন্যতরটী হিউয়েন্থ সাঙ্গ।

হিউয়েন্থ সাঙ্গ প্রথমে একটী বৌদ্ধ মঠে বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। এই সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটেও তিনি অনেক বিষয় শিখিয়াছিলেন। যাহা হউক, বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিসমাপ্ত করিয়া, হিউয়েন্থ সাঙ্গ বৌদ্ধ যতির শ্রেণীতে নিবেশিত হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স তের বৎসর।

পরবর্ত্তী সাত বৎসর হিউয়েন্থ সাঙ্গ ভ্রাতার সহিত প্রধান প্রধান তত্ত্ববিৎ ও প্রধান প্রধান অধ্যাপকের উপদেশ শুনিবার জন্য এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। সর্ব্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ থাকাতে তাঁহার নির্জ্জন-পাঠের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছিল। সময়ে সময়ে তিনি দূরতর স্থানের নির্জ্জন প্রদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু এইরূপ অশান্তিতে—বিদ্রোহের এইরূপ বিঘ্ন-বিপত্তি-পূর্ণ সময়েও হিউয়েন্থ সাঙ্গ অধ্যয়ন হইতে বিরত হন নাই। শাস্ত্রালোচনা তাঁহার একটী পবিত্র আমোদ ছিল। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেই খানেই কোন নূতন বিষয় শিখিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছেন। কুড়ি বৎসর বয়সে হিউয়েন্থসাঙ্গ বৌদ্ধ পুরোহিতের পদে আরূঢ় হন। এই নবীন বয়সে তিনি জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় স্বদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম-পুস্তক, বুদ্ধের জীবনী ও উপদেশ এবং স্বদেশের দর্শনশাস্ত্র সমস্তই তাঁহার আয়ত্ত হইয়াছিল। তিনি চীনের প্রধান প্রধান শাস্ত্রালোচনার স্থানে, ছয় বৎসর কাল অবিচ্ছিন্নভাবে প্রধান প্রধান তত্ত্ববিদ্‌গণের পাদতলে বসিয়া ধর্ম্মোপদেশে নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে এই সকল তত্ত্ববিৎ তাঁহার সমুদয় প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হইলেন। বুদ্ধ যেমন জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, হিউয়েন্থসাঙ্গ তেমনি অনেকের ছাত্রত্ব গ্রহণ করিলেন, কিন্তু কোথাও প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার সন্দেহ দূর হইল না; বরং অনুবাদ পাঠে সন্দেহ অধিকতর বদ্ধমূল হইল। তিনি মূল গ্রন্থ পড়িবার জন্য ভারতবর্ষে আসিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন ফাহিয়ান প্রভৃতি যে সকল পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, হিউয়েন্থসাঙ্গ তাঁহাদের গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন। এখন তিনিও এই সকল পরিব্রাজকের ন্যায় ভারতবর্ষে আসিয়া মূল ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, চীন সাম্রাজ্য অন্তর্ব্বিদ্রোহে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কেহ সাম্রাজ্যের সীমান্তভাগ অতিক্রম করিতে পারিত না। এই সময়ে হিউয়েন্থ সাঙ্গ এবং আর কয়েক জন পুরোহিত পরিভ্রমণে বাহির হইবার জন্য সম্রাটের নিকটে আবেদন করিলেন। আবেদন অগ্রাহ্য হইল। হিউয়েন্থ সাঙ্গের সতীর্থগণ নিরস্ত হইলেন।

কিন্তু হিউয়েন্থ সাঙ্গ ভারতবর্ষে আসিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্খলিত হইল না। তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালনে উদ্যত হইলেন।

খ্রীঃ ৬২৯ অব্দে ছাব্বিশ বৎসর বয়সে হিউয়েন্থসাঙ্গ এইরূপ অবিচলিত হৃদয়ে বুদ্ধের পবিত্র নাম স্মরণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে যাত্রা করিলেন। তিনি প্রথমে পীত নদীর (হোয়াং হো) তীরে আসিলেন। এই স্থানে ভারতবর্ষ-যাত্রিগণ একত্র হইয়া থাকে। স্থানীয় শাসন-কর্ত্তা সকলকে সীমান্তভাগ অতিক্রম করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিউয়েন্থ সাঙ্গ অপরাপর বৌদ্ধদিগের সাহায্যে শান্তি-রক্ষকগণের দৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। অবিলম্বে চরগণ তাঁহার অনুসন্ধানে প্রেরিত হইল। কিন্তু এই তরুণবয়স্ক বৌদ্ধ যতি কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এরূপ অসাধারণ অধ্যবসায় এবং এরূপ অবিচলিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞার নিদর্শন দেখাইলেন যে, কর্ত্তৃপক্ষেরা আর কোনরূপ আপত্তি না করিয়া তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। এপর্য্যন্ত দুই জন বন্ধু তাঁহার সঙ্গে আসিতেছিলেন। এই খানে তাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। হিউয়েন্থ সাঙ্গ পরিচালক-বিহীন ও বন্ধু-বিহীন হইয়া পড়িলেন। তিনি ভক্তিভাবে উপাসনা করিয়া আপনার বল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে এক ব্যক্তি তাঁহার পথ-প্রদর্শক হইতে সম্মত হইল। হিউয়েন্থসাঙ্গ ইহার সঙ্গে নিরাপদে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই পথপ্রদর্শকও মরুভূমির নিকটে আসিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল। এখন আরও পাঁচটী গুম্বজ অতিক্রম করা বাকি ছিল। প্রতি গুম্বজে রক্ষিগণ দিবারাত্রি পাহারা দিত। এদিকে সুবিস্তৃত মরুভূমিতে অশ্বের পদচিহ্ন বা কঙ্কাল ব্যতীত পথ-জ্ঞাপক অন্য কোন চিহ্ন ছিল না। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হিউয়েন্থ সাঙ্গ বিচলিত হইলেন না। তিনি মৃগতৃষ্ণিকায় বিভ্রান্ত হইয়াও ধীরভাবে প্রথম গুম্বজের নিকট উপনীত হইলেন। এইখানে রক্ষিবর্গের নিক্ষিপ্ত বাণে তাঁহার প্রাণ-বায়ুর অবসান হইতে পারিত,

কিন্তু একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ এই স্থানের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সাহসী তীর্থযাত্রীকে যাইতে অনুমতি করিলেন, এবং অন্যান্য গুম্বজে যাইতে ইঁহার কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য তত্রত্য অধ্যক্ষদিগের নামে এক একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন। হিউয়েন্থ সাঙ্গ গুম্বজ সকল অতিক্রম করিয়া, আর একটী মরুভূমিতে উপস্থিত হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই খানে তিনি পথহারা হইয়া পড়িলেন। যে চর্ম্ম-ভাণ্ডে করিয়া তিনি জল আনিতে ছিলেন, হঠাৎ তাহা ফাটিয়া গেল। হিউয়েন্থসাঙ্গ পথহারা হইয়া সেই ভীষণ মরুভূমিতে জলের অভাবে বড় কষ্টে পড়িলেন। তাঁহার অটল সাহস ও অধ্যবসায় এতক্ষণে বিচলিত-প্রায় হইল। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। অকস্মাৎ তাঁহার গতিরোধ হইল। অকস্মাৎ যেন কোন অভাবনীয় শক্তির প্রভাবে তাঁহার সাহস ও অধ্যবসায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। হিউয়েন্থসাঙ্গ কহিলেন, "আমি শপথ করিয়াছি, যাবৎ ভারতবর্ষে উপনীত না হই, তাবৎ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। তবে কেন আমার এমন দুর্ম্মতি হইল? কেন আমি ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম? পশ্চিমে যাইতে প্রাণ যায়, তাহাও ভাল। তথাপি জীবিত অবস্থায় পূর্ব্বদিকে ফিরিব না।" হিউয়েন্থসাঙ্গ আবার পশ্চিম দিকে ফিরিলেন, এক বিন্দু জলপান না করিয়া চারি দিন পাঁচ রাত্রি সেই ভয়ঙ্কর মরুভূমি দিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে কেবল পবিত্র ধর্ম্ম-পুস্তক হইতে উপদেশ সকল আবৃত্তি করিয়া হৃদয়ের শান্তি সম্পাদন করিতেন। তরুণবয়স্ক ধর্ম্মবীর এইরূপে কেবল ধর্ম্মোপদেশের বলে বলীয়ান্ হইয়া, একটী বৃহৎ হ্রদের তটে সমুপস্থিত হইলেন। এই জনপদ তাহাদিগের অধিকৃত। তাতারেরা হিউয়েন্থসাঙ্গকে আদর সহকারে গ্রহণ করিল। এক জন তাতার ভূপতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি হিউয়েন্থ সাঙ্গকে আপনার লোকদিগের ধর্ম্মোপদেষ্টা করিয়া রাখিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। হিউয়েন্থ সাঙ্গ ইহাতে সম্মত হইলেন না। তাতার

ভূপতি শেষে বড় পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হিউয়েন্থ সাঙ্গের হৃদয় বিচলিত হইল না। হিউয়েন্থসাঙ্গ দৃঢ়তার সহিত কহিলেন, "ভূপতির ক্ষমতা আছে, কিন্তু আমার মন এবং আমার ইচ্ছার উপর তিনি কোনও ক্ষমতা স্থাপন করিতে পারেন না।" এইরূপে আবদ্ধ হইয়া, হিউয়েন্থসাঙ্গ তাতার রাজ্যে আপনার দেহ পাত করিবার জন্য পান-আহার হইতে বিরত হইলেন। তাতার ভূপতি এই দরিদ্র ব্যক্তিকে আপনার মতে আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। হিউয়েন্থ সাঙ্গ এক মাস কাল এই ভূপতির রাজ্যে আবদ্ধ ছিলেন, এক মাস কাল ভূপতি ও তদীয় পারিষদগণ আপনাদের পবিত্র-স্বভাব অতিথির নিকট ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়াছিলেন। এখন তাতার-রাজের আদেশে বহুসংখ্য অনুচর হিউয়েন্থ সাঙ্গের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইল। যে চব্বিশ জন রাজার অধিকার দিয়া, এই তীর্থযাত্রীর দল যাইবে, তাতার ভূপতি তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে এক এক খানি পত্র দিলেন। হিউয়েন্থ সাঙ্গ এই অনুচরগণের সহিত অনেক গুলি তুষার-মণ্ডিত দুর্গম গিরি অতিক্রম পূর্ব্বক বক্ত্রিয়া ও কাবুলীস্তান দিয়া ভারতবর্ষে উপনীত হন। এই সকল তুষারসমাচ্ছাদিত পর্ব্বত-শ্রেণী অতিক্রম করিতে সাত দিন লাগিয়াছিল। ইহার মধ্যে তাঁহার চৌদ্দ জন অনুচর নষ্ট হয়।

হিউয়েন্থ সাঙ্গ মধ্য এশিয়ায় সভ্যতার উন্নতি দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। এই ভূখণ্ড আদিম আর্য্য জাতির আদি নিবাস-ভূমি। প্রাচীন আর্য্যগণ এই স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। লোকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা ব্যবহার করিত। স্থানে স্থানে বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল মঠে বৌদ্ধ ধর্ম্ম-পুস্তক সকল অধীত হইত। কৃষিকার্য্যের অবস্থা ভাল ছিল। ধান্য, যব, আঙ্গুর প্রভৃতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইত। অধি-

বাসীরা রেশম ও পশমের পরিচ্ছদ পরিধান করিত। প্রধান প্রধান নগরে সঙ্গীত-ব্যবসায়ীরা গান-বাদ্যে আসক্ত থাকিত। এই জনপদে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই প্রাধান্য ছিল, স্থানে স্থানে অগ্নির উপাসনাও হইত। প্রাচীন সময়ে গ্রীসের রাজধানী এথেন্স যেমন বিদ্যা ও সভ্যতার প্রধান স্থান বলিয়া সমস্ত ইউরোপে সম্মানিত হইত, এ সময়ে মধ্য এশিয়ায় সমরকন্দ নগরেরও তেমনি প্রতিপত্তি ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসীরা সমরকন্দ-বাসিদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিত। বিষয়-প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে মধ্য এশিয়ার অবস্থা এখানে বর্ণিত হইল। হিউয়েন্থ সাঙ্গ যেখানে গিয়াছেন, যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তৎসমুদয়েরই বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। দূর-দর্শিতার গভীরতায়, ভাবের উচ্চতায় ও বর্ণনার প্রাঞ্জলতায় তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অতি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হওয়াতে ঐতিহাসিক ক্ষেত্র অভিনব প্রশান্ত জ্যোতিতে আলোকিত হইয়াছে।

হিউয়েন্থ সাঙ্গ মধ্য এশিয়া অতিক্রম পূর্ব্বক কাবুল দিয়া, পুরুষপুরে (পেশাবর) উপনীত হন, এবং এই স্থান হইতে কাশ্মীরে গমন করেন। ইহার পর তিনি পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চল অতিক্রম পূর্ব্বক মগধে উপস্থিত হন। এত দিনে এই অধ্যবসায়-সম্পন্ন ধর্ম্ম-বীরের বাসনা চরিতার্থ হয়। বিদেশী ধর্ম্মবীর আপনাদের পবিত্র তীর্থ—কপিলবস্তু শ্রাবস্তী, বারাণসী, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি দর্শন করিলেন, মধ্য ভারতবর্ষের অনেক স্থান দেখিলেন, বাঙ্গালায় যাইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থার অনুসন্ধান লইলেন, দক্ষিণাপথ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ভূয়োদর্শিতা সংগ্রহ করিলেন; একে একে ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় প্রধান স্থানই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, তিনি প্রধান প্রধান স্থানে প্রধান প্রধান লোকের সহিত আলাপ করিয়া, এবং প্রধান প্রধান সংস্কৃত ও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থ সকল পড়িয়া ক্রমে জ্ঞানী ও বহুদর্শী হইয়া উঠিলেন। সহায়-সম্পন্ন লোকে যাহা করিতে পারেন নাই, একটী অসহায়, বিদেশী দরিদ্র যুবক আপ-

নার সাহস ও উদ্যম, ইহার উপর আপনার অসাধারণ ধর্ম্ম-নিষ্ঠার বলে তাহা সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। দক্ষিণাপথ হইতে হিউয়েন্থ সাঙ্গ সিংহল দ্বীপে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু কাঞ্চীপুরে (কঞ্চিবিরম) আসিয়া শুনিলেন, সিংহল দ্বীপ আভ্যন্তরীণ সংগ্রামে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য তিনি সিংহলে গেলেন না, কঞ্চি-বিরম হইতে করমণ্ডল উপকূল দিয়া কিয়দ্দূর আসিয়া, দক্ষিণাপথ অতি-ক্রম পূর্ব্বক মলবার উপকূলে উপস্থিত হইলেন এবং সেখান হইতে সিন্ধুনদ দিয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান প্রধান নগর দর্শন পূর্ব্বক মগধে প্রত্যাগমন করিলেন। হিউয়েন্থ সাঙ্গ এই স্থানে তাঁহার সদাশয় বন্ধুগণের সহিত কিছু দিন একত্র বাস করিয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করেন। ইহার পর এই পরিব্রাজক স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি পঞ্জাব ও কাবুলীস্তান দিয়া মধ্যে এশিয়ার উন্নত ভূখণ্ডে আসিলেন এবং তুর্কীস্তান, কাসগড়, ইয়ারকন্দ ও খোটানের রাজধানীতে কিছু কাল থাকিয়া, ষোল বৎসর কাল ভ্রমণ, অধ্যয়ন, ও বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রামের পর খ্রীঃ ৬৪৫ অব্দে অপনার গরীয়সী জন্ম ভূমিতে পদার্পণ করিলেন।

এইরূপে সদাশয় ধর্ম্মবীরের ভ্রমণ-কার্য্য সমাপ্ত হইল, এইরূপে সদাশয় ধর্ম্মবীর গৌরব-শ্রীতে সমুন্নত হইয়া, দীর্ঘকালের পর স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি চারি দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্রাট্ এই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি-শালী দরিদ্র পরি-ব্রাজকের উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটী করিলেন না। এক সময়ে চরগণ যাঁহার অনুসন্ধানে প্রেরিত হইয়াছিল, সশস্ত্র শান্তিরক্ষকগণ যাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ পাইয়াছিল, তিনি এখন প্রভূত সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইলেন। চীনের রাজধানীতে তাঁহার প্রবেশ-সময়ে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। রাজপথ সকল কার্পেটে আচ্ছাদিত হইল, তাহার উপর সুগন্ধি পুষ্প সকল শোভা বিকাশ করিতে লাগিল, স্থানে স্থানে জয়-পতাকা সকল বায়ু-

ভয়ে প্রকম্পিত হইতে লাগিল, সৈনিক পুরুষেরা পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল, প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা আপনাদের বিখ্যাত পরিব্রাজককে অভিনন্দন করিয়া আনিতে গেলেন। দরিদ্র ধর্ম্মবীর আপনার কৃতকার্য্যতার গৌরবে উন্নত হইলেও বিনম্রভাবে এই মহোৎসবের মধ্যে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের বৌদ্ধ পুরোহিতগণ তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। হিউয়েন্থ সাঙ্গ বুদ্ধের স্বর্ণ, রৌপ্য ও চন্দনকাষ্ঠময় প্রতিমূর্ত্তি এবং ৬৫৭ খানি গ্রন্থ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সম্রাট্ ইহাতে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া, আপনার সুসজ্জিত প্রাসাদে তাঁহাকে যথোচিত সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও গুণের প্রশংসা করিয়া, তাঁহাকে সাম্রাজ্যের একটী প্রধান কর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হিউয়েন্থ সাঙ্গ বিনীতভাবে ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া, বুদ্ধের জীবনী ও নিয়মাবলীর পর্য্যালোচনায় আপনার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার জন্য একটী মঠ নির্দ্দিষ্ট হইল। এই স্থানে তিনি অপরাপর বৌদ্ধ পুরোহিতগণের সহিত একত্র হইয়া, ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত পুস্তক সমূহের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শীঘ্র লিখিত ও প্রকাশিত হইল। কিন্তু সংস্কৃত পুঁথি সমূহের অনুবাদে তাঁহার অনেক দিন লাগিয়াছিল। কথিত আছে, হিউয়েন্থ সাঙ্গ বহুসংখ্য সতীর্থের সাহায্যে ৭৫০ খানি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই সকল গ্রন্থ ১,৩৩৫ খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছিল। অনুবাদ-সময়ে তিনি প্রায়ই গ্রন্থের দুরূহ অংশের অর্থ পরিগ্রহের জন্য নির্জ্জনে চিন্তা করিতেন। চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মুখমণ্ডল হঠাৎ প্রসন্ন হইত, হঠাৎ যেন কোন অচিন্ত্যপূর্ব্ব আলোকে তাঁহার নেত্রদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। ঘোর অন্ধকারময় স্থানে পরিভ্রমণ সময়ে পথিক সহসা সূর্য্যের আলোক পাইলে যেমন প্রফুল্ল হয়, হিউয়েন্থ সাঙ্গ চিন্তা করিতে

করিতে দুরূহ অংশের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া, তেমনি প্রফুল্ল হইতেন।

এইরূপে ধর্ম্ম চিন্তা, গ্রন্থ প্রণয়ন ও গ্রন্থ প্রচার করিয়া, হিউয়েন্থ সাঙ্গ ক্রমে ঐহিক জীবনে চরম সীমায় উপনীত হইলেন। তিনি মৃত্যু-সময়ে আপনার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিলেন, এবং আত্মীয় ও বন্ধুদিগকে ডাকিয়া, তাঁহাদের নিকট বিদায় লইলেন। এই অন্তিম সময়েও তাঁহার প্রসন্নতার কোন ব্যত্যয় হয় নাই। তিনি প্রশান্তভাবে কহিলেন, "সৎকার্য্য প্রযুক্ত আমি যে কিছু প্রশংসা পাইতে পারি, তাহা কেবল আমার নিজের প্রাপ্য নয়। অপরাপর লোকেও তাহার অংশ পাইবার যোগ্য।" খ্রীঃ ৬৬৪ অব্দে হিউয়েন্থ সাঙ্গের মৃত্যু হয়। প্রায় এই সময়ে বিজয়োন্মত্ত মুসলমানেরা প্রাচ্য ভূখণ্ড নর-শোণিতে রঞ্জিত করিতেছিল, এবং এই সময়ে জর্ম্মণীর অন্ধকারময় আরণ্য প্রদেশে খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোক ধীরে ধীরে বিকাশ পাইতেছিল।

হিউয়েন্থ সাঙ্গের সময়ে ভারতবর্ষে হিন্দু ও বৌদ্ধ, উভয় ধর্ম্মেরই প্রাধান্য ছিল। হিন্দু দেব-মন্দিরের পার্শ্বে বৌদ্ধ মঠ আপনার গৌরব রক্ষা করিতেছিল। ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়েই নিরাপদে ও নিরুদ্বেগে আপনাদের ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন। বৌদ্ধ উপাসক-সমূহ 'সঙ্ঘ' নামে অভিহিত হইত। হিউয়েন্থসাঙ্গ যে পথে ভারতবর্ষে উপনীত হন, সে পথের পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা উন্নত ছিল। কপিশা রাজ্যে (বর্ত্তমান কাবুলীস্তান) একজন ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন। এইখানে এক শতটী মঠে ছয় হাজার শ্রমণ থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্য দেব-মন্দির ছিল। সন্ন্যাসিগণ কেহ উলঙ্গ অবস্থায় থাকিত, কেহ সমস্ত দেহে ভস্ম মাখিত, কেহবা কপাল-সমূহ অলঙ্কারের ন্যায় ধারণ করিত। পেশাবর এই কপিশা রাজ্যের অধীন ছিল। এই স্থানে মহারাজ অশোক ও কনিষ্কের নির্ম্মিত বহুসংখ্য ভগ্ন মঠ ও স্তূপ,

কালের অনন্ত শক্তির পরিচয় দিতেছিল। কাশ্মীরের রাজা হিন্দু-ধর্ম্মের পরিপোষক ছিলেন, সুতরাং এই রাজ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। থানেশ্বর ও মথুরায় হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মেরও প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছিল। হিউয়েন্থ সাঙ্গ কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ক্ষত্র বীরগণের বৃহদাকার কঙ্কাল-সমূহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কান্যকুব্জ রাজ্য বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। বৈশ্যবংশীয় হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য এই স্থানের অধিপতি ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেক রাজ্য আপনার জয়-পতাকায় শোভিত করেন। ভারতবর্ষের আঠার জন রাজা তাঁহার করদ হন। মহারাষ্ট্র-রাজ পুলকেশ ব্যতীত সাহসে ও পরাক্রমে ভারতবর্ষে শিলাদিত্যের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। শিলাদিত্য বৌদ্ধধর্ম্মের এক জন প্রধান পরিপোষক ছিলেন। তিনি এই ধর্ম্মের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করেন। অযোধ্যায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া উঠিতেছিল। প্রয়াগে হিন্দুধর্ম্মে-রই প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছিল। শ্রাবস্তীতে বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমে অবনতি হইতেছিল। হিউয়েন্থ সাঙ্গ বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবস্তুর ভগ্না-বশেষ দেখিয়া দুঃখিত হন। বুদ্ধ বারাণসী প্রভৃতি যে কয়েকটী নগরে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ে ব্রাহ্মণ-দিগের ক্ষমতা ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছিল। বৈশালী ভগ্নদশাপন্ন এবং উহার মঠ সকল পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। মগধের পঞ্চাশটি মঠে দশ সহস্র শ্রমণ বাস করিতেন। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদিগের বহুসংখ্য দেব-মন্দির ছিল। যে প্রাচীন পাটলীপুত্র এক সময়ে সুরাজকতা ও সমৃদ্ধির মহিমায় ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যকে অধঃকৃত করিয়াছিল, কালের কঠোর আক্রমণে এই সময়ে তাহার পূর্ব্ব গৌরব সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ইহার বহুসংখ্য অট্টালিকা ও বহুসংখ্য মঠের ভগ্নাবশেষ প্রায় চৌদ্দ মাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছিল। হিউয়েন্থ সাঙ্গ যখন বুদ্ধ গয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন নালন্দায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। নালন্দা গয়ার নিকটে। কেহ কেহ বর্ত্তমান

বড়গাঁওকে প্রাচীন নালন্দা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহাহউক, নালন্দা বৌদ্ধদিগের পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, এই স্থানে একটী আম্র-কানন ছিল। কোন ধনাঢ্য বণিক উহা বুদ্ধকে দান করেন। বুদ্ধ এই আম্র-কাননে অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ক্রমে এই স্থানে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ধর্ম্মপরায়ণ বৌদ্ধ নৃপতিগণের দানশীলতায় ক্রমে এই বিদ্যা-মন্দির সম্প্রসারিত ও উন্নত হইয়া উঠে। নালন্দার সঙ্ঘারাম এই সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রধান বৌদ্ধবিদ্যালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বৌদ্ধদিগের আঠারটী ভিন্ন ভিন্ন দলের দশ হাজার শ্রমণ এইখানে থাকিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসা বিদ্যার আলোচনা করিতেন। মনোহর বৃক্ষবাটিকায় এই সঙ্ঘারাম পরিশোভিত ছিল। ছয়টী চারিতল বৃহৎ অট্টালিকায় শিক্ষার্থিগণ বাস করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য এক শতটী গৃহ ছিল। এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞদিগের পরস্পর সম্মিলনের জন্য মধ্যস্থানে অনেকগুলি বড় বড় ঘর সুসজ্জিত থাকিত। মহারাজ শিলাদিত্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থিদিগের আহার, পরিধেয় ও ঔষধাদির সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। নগরের কোলাহল এই স্থানের শান্তি ভঙ্গ করিত না, সাংসারিক প্রলোভন ইহার পবিত্রতা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইত না। শিক্ষার্থিগণ এই পবিত্র শান্তি-নিকেতনে প্রশান্তভাবে শাস্ত্রচিন্তায় নিবিষ্ট থাকিতেন। নালন্দার সঙ্ঘারাম কেবল বাহ্যসৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না, আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যেও ইহা ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ইহার শিক্ষকগণ জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং ইহার শিক্ষার্থগণ শাস্ত্রালোচনা ও শাস্ত্র-চিন্তায় ভারতবর্ষে প্রতিপত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এই প্রসিদ্ধ বিদ্যা-মন্দিরের প্রধান অধ্যাপকের নাম শীলভদ্র। ইনি কেবল বয়সে বৃদ্ধ ছিলেন না, শাস্ত্রজ্ঞানেও বৃদ্ধ বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মানিত ছিলেন। সমস্ত শাস্ত্রই ইঁহার

আয়ত্ত ছিল। অসাধারণ ধর্ম্ম-পরতায়, অসাধারণ অভিজ্ঞতায় এবং অসাধারণ দূরদর্শিতায় এই বর্ষীয়ান্ পুরুষ নালন্দার সঙ্ঘারাম অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

হিউয়েন্থসাঙ্গ ভারতীর এই লীলা-ভূমিতে যাইতে নিমন্ত্রিত হন। তিনি অভিজ্ঞতা-সংগ্রহ মানসে যেরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া, ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাহা শ্রমণদিগের অবিদিত ছিল না। নালন্দার শ্রমণগণ এই প্রসিদ্ধ পরিব্রাজকের পরিচয় লইতে সাতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। এজন্য তাঁহারা হিউয়েন্থসাঙ্গকে আদর সহকারে আহ্বান করিলেন। চারি জন অভিজ্ঞ শ্রমণ নিমন্ত্রণ-পত্র লইয়া হিউয়েন্থ সাঙ্গের নিকটে উপস্থিত হইলেন। হিউয়েন্থ সাঙ্গ বিনম্রভাবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত নালন্দায় আসিলেন। সঙ্ঘারামে প্রবেশ-সময়ে দুই শত জ্ঞান-বৃদ্ধ শ্রমণ আপনাদের প্রসিদ্ধ অতিথিকে যথো-চিত অভ্যর্থনাসহকারে গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের পশ্চাতে বহুসংখ্য বৌদ্ধ, কেহ ছত্র ধরিয়া, কেহ নিশান উড়াইয়া, কেহ সুগন্ধি পুষ্প সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া, কেহ বা গম্ভীরস্বরে অতিথির প্রশংসা-গীতি গাইয়া, তাঁহাকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন। এইরূপ আদর ও সম্মানের সহিত পরিগৃহীত হইয়া, হিউয়েন্থসাঙ্গ প্রথমে সঙ্ঘারামের শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যক্ষের নিকটে আসিলেন। শীলভদ্র বেদীতে বসিয়াছিলেন; হিউয়েন্থসাঙ্গ বেদীর সম্মুখে আসিয়া বিনয়-নম্রতার সহিত বর্ষীয়ান্ পুরুষকে অভিবাদন করিলেন। এই অবধি হিউয়েন্থসাঙ্গ শীলভদ্রের শিষ্য-শ্রেণীতে নিবেশিত হন। সঙ্ঘারামের একটী উৎকৃষ্ট গৃহে তাঁহাকে স্থান দেওয়া হয়, দশ জন শ্রমণ নিয়ত তাঁহার শুশ্রূষা করিতে থাকেন, মহারাজ শিলাদিত্য তাঁহার দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। হিউয়েন্থসাঙ্গ এইরূপে সকলের আদরণীয় হইয়া, পাঁচ বৎসর নালন্দার সঙ্ঘারামে ছিলেন, পাঁচ বৎসর মহাপ্রাজ্ঞ শীলভদ্রের পাদমূলে বসিয়া, পাণিনির ব্যাকরণ, ত্রিপিটক ও ব্রাহ্মণ-দিগের সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

এখন এই পবিত্র বিদ্যা-মন্দিরের পূর্ব্বতন সৌন্দর্য্য নাই, কালের কঠোর আক্রমণে নালন্দা এখন ভগ্নদশায় পতিত রহিয়াছে।

হিউয়েন্থসাঙ্গ নালন্দা হইতে বাঙ্গালা, দক্ষিণাপথ ও মধ্যভারতবর্ষে গমন করেন। এই সকল জনপদের কোথাও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য, কোথাও বা বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি পরিলক্ষিত হয়। আসামে হিন্দু-ধর্ম্মের প্রাতুর্ভাব ছিল। এই স্থানের অধিপতি ব্রাহ্মণ। ইনি 'কুমার' বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুমার, শিলাদিত্যের করদ ছিলেন। তাম্রলিপ্ত (তমোলুক) একটী প্রধান বন্দর ছিল। হিউয়েন্থসাঙ্গ এই স্থানে বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রের অবস্থা উন্নত ছিল। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর মরহাট্টাগণ বর্ত্তমান সময়ের মারহাট্টাদিগের ন্যায় খর্ব্বকায় ও কদাকার ছিল না। তাহারা রাজপুতদিগের ন্যায় দীর্ঘকায়, সরল-স্বভাব, সাহসী ও বলিষ্ঠ ছিল। কোপন-স্বভাব হইলেও তাহারা কৃতজ্ঞতা হইতে বিচ্যুত হইত না। তাহারা মিত্রের সাহায্য করিতে এবং শত্রুর অনিষ্ট করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তাহাদের এতদূর আত্ম-সম্মান-বোধ ছিল যে, শত্রুকে পূর্ব্বে না জানাইয়া, তাহার অপকারে অগ্রসর হইত না। তাহারা পলায়িতের পশ্চাদ্ধাবিত হইত, কিন্তু শরণাগতের উপকার করিত। তাহাদের সেনাপতিরা যুদ্ধে পরাজিত হইলে নারীজাতির পরিচ্ছদ পরিত, এবং প্রায়ই আত্মহত্যা করিয়া, আত্মাবমাননার শান্তি করিত। তাহারা যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে মদিরাপানে উন্মত্ত হইত, এবং আপনাদের হস্তী গুলিকেও এইরূপে প্রমত্ত করিয়া তুলিত। যুদ্ধোন্মত্ত থাকিলেও মরহাট্টারা শাস্ত্রালোচনায় অমনোযোগী ছিল না। তাহারা যথানিয়মে বিদ্যাভাস করিত। মরহাট্টাদের প্রায় অর্দ্ধাংশ বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। ক্ষত্রিয়রাজ পুলকেশ এই সময়ে মহারাষ্ট্রে আধিপত্য করিতেছিলেন। ইনি যেমন উদার-স্বভাব, তেমনি অভিজ্ঞ ছিলেন। ইঁহার দান-শক্তির অবধি ছিল না। প্রজারঞ্জকতা-গুণে ইনি সাধারণের বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

প্রজারা কায়মনোবাক্যে ইঁহার আদেশ পালন করিত। মহারাজ শিলাদিত্য অনেক স্থান আপনার বিজয়-পতাকায় শোভিত করেন, কিন্তু মহারাষ্ট্র-রাজ পুলকেশকে তিনি পরাজিত করিতে পারেন নাই।

হিউয়েন্থসাঙ্গ ভারতবর্ষীয়দিগের সরলতা ও সাধুতার প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়েরা প্রবঞ্চনা বা কোন বিষয় জাল করিত না। তাহারা শপথ দ্বারা আপনাদের প্রতিশ্রুতি দৃঢ়তর করিত, এবং কোনরূপ পাপ করিলে পরলোকে কঠোর শাস্তিভোগের আশঙ্কায় ভীত থাকিত। তাহাদের আচার ব্যবহার সরল ও ভদ্র এবং তাহাদের স্বভাব শান্ত ও নম্র ছিল। হিন্দুদের বিচার-কার্য্য সাতিশয় সরলভাবে সম্পন্ন হইত। কঠোরতম শাস্তি ছিল না। বিদ্রোহিদিগের প্রাণদণ্ড হইত না, তাহারা কেবল যাবজ্জীবন কারাবদ্ধ থাকিত। বেত্রাঘাত বা অন্য কোনরূপ দৈহিক শাস্তি প্রদানের নিয়ম ছিল না। কিন্তু যাহারা ন্যায়ের অন্যথাচরণ করিত, বিশ্বস্ততা হইতে বিচ্যুত হইত, কিংবা পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে ঔদাসীন্য দেখাইত, তাহাদের হস্তপদ বা নাসাকর্ণ ছেদন করা হইত। প্রকাশ্য স্থানে সাধারণের সমক্ষে দণ্ড বিধান করা হইত না। দোষ স্বীকার করাইবার জন্য বেত্রাঘাতের নিয়ম ছিল না। যদি অপরাধী সরলভাবে আপনার দোষ স্বীকার করিত, তাহা হইলে তাহার প্রতি যথাযোগ্য দণ্ড বিহিত হইত। কিন্তু যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া আপনার দোষ গোপন করিত, তাহা হইলে উত্তপ্ত জল, অগ্নি, গুরুতর ভার বা বিষ প্রয়োগ দ্বারা তাহার দোষাদোষ নির্দ্ধারিত হইত।

মেগাস্থিনিসের ন্যায় হিউয়েন্থসাঙ্গও ভারতবর্ষে অনেক গুলি খণ্ড রাজ্য দেখিয়াছেন। এক হিন্দুস্থানেই এইরূপ ৭০টী ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। প্রতি রাজ্যের রাজারা আপনাদের ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন। ভারতবর্ষ বিভিন্নজাতীয় লোকের আবাস-ভূমি।

এই সকল লোকের ভাষা ও আচার ব্যবহারও বিভিন্ন। ইহার উপর সমুন্নত পর্ব্বত, বেগবতী তরঙ্গিণী, সুবিস্তৃত অরণ্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক অন্তরায়ে জনপদ গুলি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। এই সকল কারণে প্রাচীন সময়ে অনেক খণ্ড রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। এই খণ্ড রাজ্যের কোন ভূপতি যদি পুরু বা চন্দ্রগুপ্ত, অশোক বা শিলাদিত্যের ন্যায় পরাক্রান্ত হইতেন, তাহা হইলে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহ আপনার অধীনে আনিয়া সম্রাটের গৌরবান্বিত পদে আরোহণ করিতেন।

উদার-স্বভাবে বৌদ্ধ ভূপতিদিগের প্রবর্ত্তিত নিয়ম অনুসারে রাজ্যের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। লোকে কোন প্রকার গুরুতর কর-ভারে নিপীড়িত হইত না, কেহ কাহাকে অমনি খাটাইয়া লইত না। যাহারা অট্টালিকা নির্ম্মাণে বা অন্য কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইত, তাহারা আপনাদের পরিশ্রমের হার অনুসারে বেতন পাইত। জনসাধারণ আপনাদের পুরুষানুগত স্বত্বে কখনও বঞ্চিত হইত না। তাহারা আপনাদের ভরণ-পোষণের জন্য কৃষি-কার্য্য করিত। কৃষক উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিয়া আর সমুদয় আপনারা রাখিত। বাণিজ্য-ব্যবসায়িদিগকে কুৎ ঘাটে সামান্য রকম কর দিতে হইত। সৈনিকেরা কেহ কেহ রাজ্যের সীমান্ত ভাগ, কেহ কেহ রাজপ্রসাদ রক্ষা করিত। প্রয়োজন অনুসারে সৈন্য সংখ্যা বর্দ্ধিত হইত। পুরস্কার দিবার প্রতিশ্রুতি করিয়া, সাধারণকে সৈনিক-শ্রেণীতে নিবেশিত করা যাইত।

রাজকীয় ভূমি হইতে যে রাজস্ব পাওয়া যাইত, তাহার চারিভাগ হইত। এক ভাগ রাজ্য ও ধর্ম্ম-সম্মত কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ থাকিত, দ্বিতীয় ভাগ মন্ত্রী ও শাসন-সমিতির কর্ম্মচারিগণের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য দেওয়া যাইত, তৃতীয় ভাগ জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও প্রতিভা-শালিদিগকে পুরস্কার দিবার জন্য রাখা হইত, এবং চতুর্থ ভাগ "সন্তোষ-ক্ষেত্রের" ব্যয় নির্ব্বাহার্থ জমা থাকিত। সকল শাসন-

কর্ত্তা, শান্তি-রক্ষক ও রাজকীয় কর্ম্মচারী, আপনাদের ভরণ-পোষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমি পাইতেন।

সন্তোষ ক্ষেত্রের উৎসব ভারতের ইতিহাসের একটী প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে,—যখন মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ব্বে ও পশ্চিমে অনেক রাজ্য আপনার বিজয়-পতাকায় পরিশোভিত করিতেছিলেন, যখন মহাবীর পুলকেশ আপনার অসাধারণ ভুজবলের মহিমায় মহারাষ্ট্র রাজ্যের স্বাধীনতার গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন, জ্ঞান-বৃদ্ধ শীলভদ্র যখন আপনার অপূর্ব্ব জ্ঞান-গরিমায় নালন্দার সঙ্ঘারাম গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতেছিলেন, তখন মহারাজ শিলাদিত্য হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে একটী মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন। প্রয়াগের পাঁচ ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড এই মহোৎসবের ক্ষেত্র ছিল। দীর্ঘকাল হইতে এই ভূমি "সন্তোষ-ক্ষেত্র" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গ ফীট পরিমিত ভূমি গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানের বৃহৎ বৃহৎ গৃহে স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাস ও রেসমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্য স্তূপাকারে সজ্জিত থাকিত। এই বেষ্টিত স্থানের নিকটে ভোজন-গৃহ সকল বাজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শোভা পাইত। এই সকল ভোজন-গৃহের এক একটীতে একবারে প্রায় সহস্র লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্ব্বে সাধারণ্যে ঘোষণা দ্বারা ব্রাহ্মণ শ্রমণ, নিরাশ্রয় দুঃখী, পিতৃ মাতৃহীন, আত্মীয় বন্ধুশূন্য নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রয়াগে আসিয়া দান গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইত। মহারাজ শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজগণের সহিত এই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভী-রাজ ধ্রুবপতু এবং আসাম-রাজ কুমার এই করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। এই দুই করদ রাজার ও মহারাজ শিলাদিত্যের সৈন্য

সন্তোষ-ক্ষেত্রের চারি দিক বেষ্টন করিয়া থাকিত। ধ্রুবপতুর সৈন্যের পশ্চিমে বহুসংখ্য অভ্যাগত লোক আপনাদের তাম্বু স্থাপন করিত। এইরূপ শৃঙ্খলা বিশেষ পারিপাট্যশালী ও সুবুদ্ধির পরিচায়ক ছিল। বিতরণ-সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে সন্তোষ-ক্ষেত্রের রাশীকৃত ধন দুষ্ট লোকে আত্মসাৎ করিতে পারে, এই আশঙ্কায় ইহার সকল দিক সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত করা হইত। এই ক্ষেত্র গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-স্থলের অব্যবহিত পশ্চিমে ছিল। শিলাদিত্য আপনার সৈন্যগণের সহিত গঙ্গার উত্তর তীরে থাকিতেন। ধ্রুবপতু ক্ষেত্রের অব্যবহিত পশ্চিমে এবং ক্ষেত্রে ও অভ্যাগত দলের মধ্যভাগে সৈন্য স্থাপন করিতেন। আর কুমার যমুনার দক্ষিণ তটে আপনাদের সৈনিক দল রাখিতেন।

অসীম আড়ম্বরের সহিত উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইত। শিলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবমাননা করিতেন না। তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়কেই আদর সহকারে আহ্বান করিতেন, এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দু দেব-মূর্ত্তি উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। এই দিনে সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত হইত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য অতিথি অভ্যাগতদিগকে দেওয়া যাইত। দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণু ও তৃতীয় দিনে শিবের মূর্ত্তি মন্দিরের শোভা বিকাশ করিত। প্রথম দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্দ্ধাংশ এই এক এক দিনে বিতরণ করা হইত। চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দান-কার্য্য আরম্ভ হইত। কুড়ি দিন ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা, দশ দিন ব্যাপিয়া হিন্দু দেবতা-পূজকেরা, এবং দশ দিন ব্যাপিয়া উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্য্যন্ত দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃমাতৃহীন ও আত্মীয় বন্ধু-শূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা হইত। সমুদয়ে ৭৫ দিন পর্য্যন্ত উৎসবের কার্য্য চলিত। শেষ দিনে মহারাজ শিলাদিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণি-মুক্তা-খচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরশোভী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ পরি-

গ্রহ করিতেন। এই মহামূল্য আভরণ-রাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত। চীর ধারণ করিয়া মহারাজ শিলাদিত্য যোড়হাতে গম্ভীর স্বরে কহিতেন, "আজ আমার সম্পত্তি রক্ষার সমুদয় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষ-ক্ষেত্রে আজ আমি সমুদয় দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট পুণ্য সঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপ দান করিবার জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রাখিব।" এইরূপে পুণ্যভূমি প্রয়াগে সন্তোষ-ক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্ত হস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্য রক্ষা ও বিদ্রোহদমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত।

পবিত্র প্রয়াগে পবিত্র-সভাব চীনদেশীয় শ্রমণ হিউয়েন্থ সাঙ্গ এইরূপ মহোৎসব দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ মহোৎসবের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভারতের প্রাচীন নৃপতিগণ আপনাদিগকে অনন্ত সন্তোষ এবং অন্তিমে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজারা ধর্ম্মসঞ্চয় মানসে প্রতি পঞ্চম বর্ষে এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু ইহার সহিত রাজনৈতিক বিষয়েরও কিয়দংশে সংশ্রব ছিল। ভারতের রাজগণ এই সময়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের একান্ত আয়ত্ত ছিলেন। ইঁহাদিগকে সকল সময়ে এই উভয় দলের পরামর্শ অনুসারে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইত। যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষের আবির্ভাব না হয়, এবং যাহাতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা সর্ব্বদা রাজ্যের মঙ্গল চিন্তা করেন, তৎপ্রতি রাজাদের দৃষ্টি ছিল। এই উৎসবে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই সমান আদরের সহিত ধন দান করা হইত, উভয়েই সমান আদরের সহিত পরিগৃহীত হইতেন। এজন্য ইঁহার সর্ব্বদা দান-বীর রাজার কুশল কামনা করিতেম এবং যে রাজ্যে এমন অসাধারণ ধর্ম্ম-কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সে রাজ্যের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। এদিকে সাধারণেও এই অসাধারণ ব্যাপার

দেখিয়া রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। এই রূপে রাজা সাধারণের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতেন। ইহার পর যে সকল সাহসী দস্যু রাজার ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া শেষে রাজ-সিংহাসন গ্রহণে উদ্যত হয়, তাহারা সন্তোষ-ক্ষেত্রের দানে রাজার অর্থাভাব প্রযুক্ত আপনাদের সাহসিক কার্য্যে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট থাকিত। রাজনৈতিক ফল যাহাই হউক না কেন, সন্তোষ-ক্ষেত্রের উৎসবে আর্য্য-কীর্ত্তির মহিমা অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম হয়। যদি ভারতবর্ষ যবনের পর ইঙ্গ্‌রেজের পদানত না হইত, যদি বৈদেশিক সভ্যতা-স্রোত ভারতের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে গড়াইয়া না পড়িত, ভারতের সন্তানগণ যদি আপনাদের জাতীয়ভাব হইতে বিচ্যুত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, আজও ভারতবর্ষে এই প্রাচীন আর্য্য-কীর্ত্তির অপূর্ব্ব আড়ম্বর দেখা যাইত, এবং আজও এই অপূর্ব্ব দানশীলতার অপার মহিমায় ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এক হইয়া একই আহ্লাদ ও আমোদের তরঙ্গে দুলিতে থাকিত।

ভারতে মুদ্রণ-স্বাধীনতা।

মুদ্রণ স্বাধীনতা সভ্যতার ইতিহাসের একটী প্রধান অঙ্গ। ইঙ্গ্‌রেজ গবর্ণমেণ্ট ভারতে এই স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিয়া অক্ষয় ও অনন্ত কীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন। ইঙ্গ্‌লণ্ড যে অপ্রতিহত প্রতাপের বলে বিশাল বারিধি লঙ্ঘন করিয়া, সমুন্নত পর্ব্বত অতি-ক্রম করিয়া, ভয়াবহ অরণ্য অতিবাহন করিয়া, নানা দেশে আপ-নার স্বাধীনতার বিজয়-পতাকা উড়াইয়া দিয়াছেন, যে প্রতাপ প্রথমে ধীরে ধীরে ভারতের এক দেশে প্রবিষ্ট হয়, নীরবে গতি

প্রসারিত করে, পরিশেষে বাধা-প্রভাবে প্রবৃদ্ধতেজ হইয়া ভারতের সমুদয় স্থান অধিকার পূর্ব্বক আপনার অসীম শক্তির মহিমায় গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষকে নবীন উপাদানকে নবীনতর করিয়া তুলিয়াছেন। আজ যে উন্নতির তরঙ্গ ভারতের চারি দিকে নাচিয়া বেড়াইতেছে, সেই উন্নতির মূল সূত্র ধরিয়া বিবেচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে, উচ্চশিক্ষা ও মুদ্রণ-স্বাধীনতা দান ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান সৎকার্য্য। এই সৎকার্য্যে ইঙ্গরেজ ভারতবর্ষের অনন্ত আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন। আমরা ইঙ্গরেজের কৃত এই উপকার কখনও ভুলিতে পারিব না, এবং কখনও এই উপকার অসম্মান বা অগৌরব করিয়া আপনাদিগকে কলঙ্কিত করিব না।

ভারতে মুদ্রণ-স্বাধীনতার ইতিহাস বৈচিত্র্য-পূর্ণ। এই বিচিত্র ঐতিহাসিক কাহিনী বিবৃত করিবার পূর্ব্বে প্রাচীন কালে অন্যান্য দেশে এসম্বন্ধে কি কি নিয়ম ছিল, সংক্ষেপে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহাতে উপস্থিত বিষয়ের বৈচিত্র্য অধিকতর পরিস্ফুট হইবে।

অতি প্রাচীন কালে ব্যবস্থাপকগণ সমাজরক্ষার্থ যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই নিতান্ত কঠোর ও পক্ষপাত-দূষিত বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন ভারত, গ্রীস ও রোম প্রভৃতি দেশে ইহার উদাহরণ বিরল নয়। লাইকরগস্ প্রভৃতি ব্যবস্থাপকগণের মতে সামান্য চৌর্য্যাদি অপরাধেও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছেদন বা প্রাণদণ্ডাদি অবিহিত ছিল না। অধিকাংশ বিষয়েই সমদর্শিতা, উদারতা বা অপক্ষপাতিতা প্রদর্শিত হয় নাই। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বর্ণকে উচ্চ পদে আরোহিত করা এবং শূদ্রকে একবারে অতল সাগরে নিমজ্জিত করা হইয়াছিল। শাক্যসিংহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সকলকে তুল্যরূপে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিয়া যে উদারতার পরিচয় দিয়াছেন, মনু তাহা দেখাইতে

পারেন নাই। তৎকালের ব্যবস্থাপকদিগের বুদ্ধি তাদৃশ মার্জ্জিত ছিল না বলিয়া হউক, অথবা তদানীন্তন সমাজ মার্জ্জিতবুদ্ধি-মূলক উৎকৃষ্ট বিধির যোগ্য হয় নাই, এই ভ্রান্তিতেই হউক, অনেক নিষ্ঠুর বিধি প্রণীত ও অনেক নিষ্ঠুর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সক্রেতিস এই নিষ্ঠুরতা ও অনুদারতার মহিমায় হেমলক পানে মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন এবং গালিলিও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া নীরবে গম্ভীর ভাবে জগতের কার্য্য-কারণ-চিন্তায় নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে পুস্তক পত্রিকা প্রভৃতির প্রচার সম্বন্ধেও এইরূপ কঠোর নিয়ম ব্যবস্থাপিত হইত। গ্রীস ও রোম প্রভৃতির ইতিহাস পাঠ করিলে ইহা সুস্পষ্ট রূপে জানিতে পারা যায়। কিন্তু এবিষয়ে ভারতীয় আর্য্যগণের সমধিক উদারতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এরূপ কঠোর নিয়মের কোন আভাস পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই গ্রন্থ-প্রণয়ন ও নিয়ম ব্যবস্থাপনের ভার ছিল। এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের প্রভুত্বের পরিসীমা ছিল না। এ সম্বন্ধে কেহই তাঁহাদিগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। সুতরাং তাঁহারা যে গ্রন্থ রচনা করিতেন, তাহার বিরুদ্ধে কাহারও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা ছিল না। রাজাকে তাঁহাদের শাসন অনুসারে চলিতে হইত। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাদিই ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার ভিত্তি স্বরূপ ছিল। এই অবিসংবাদিত আধিপত্য অপরের হস্তে সমর্পণ করিতে তাঁহারা একান্ত অনিচ্ছু ছিলেন। লব্ধশক্তি গর্ব্বিত ব্যক্তি মাত্রেরই এই অনিচ্ছা স্বভাবত হইয়া থাকে। এই অনিচ্ছা প্রযুক্ত তাঁহারা রাজদ্বারে স্বমত-বিরোধী গ্রন্থ-লেখকদিগের দণ্ডবিধান করিতেন না। তাঁহারা এ পথে না গিয়া স্বয়ং বিরুদ্ধবাদী চার্ব্বাক বৌদ্ধাদির মত খণ্ডন পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থ সাধারণের মধ্যে অনাদৃত ও অপ্রচলিত করিবার চেষ্টাকেই শ্রেয় জ্ঞান করিতেন। এই চেষ্টা হইতেই

বোধ হয় দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য দেশের প্রাচীন সমাজের ইতিহাস পাঠে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীসের মধ্যে এথেন্স নগরই বিদ্যা, বুদ্ধি, মনস্বিতা ও তেজস্বিতাদি গুণে অন্যান্য নগর অপেক্ষা অধিকতর উন্নত হইয়াছিল। আমরা এই এথেন্সে পাই, দুই প্রকারের লেখা মাজিষ্ট্রেটদিগের নিকটে দণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচিত হইত। এক, প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরোধী; অপর, ব্যক্তি বিশেষের গ্লানি-কর। সুপ্রসিদ্ধ প্রেতগোরাসের গ্রন্থ প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূত ছিল। প্রেতগোরাস কোন একটী বিষয় লিখিতে গিয়া প্রথমেই কহিয়াছিলেন, তিনি দেবতাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন। ঐশ্বরিক তত্ত্বে এইরূপ অনভিজ্ঞতার অপরাধে খ্রীঃ পূঃ ৪১১ অব্দে তাঁহার বিচার হয়। বিচারে তিনি নির্ব্বাসিত হন এবং তাঁহার গ্রন্থ অগ্নিমুখে নিক্ষিপ্ত ও ভস্মীকৃত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ কতকগুলি সংযোগান্ত নাটক। এই সকল গ্রন্থে * জীবিত ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র অতি কুৎসিত ভাবে অভিনীত হইত। এজন্য আইন অনুসারে ইহার অভিনয় নিষিদ্ধ হয়। অভিনয় নিষিদ্ধ হইলেও গ্রন্থগুলি পূর্ব্ববৎ অবস্থাতেই ছিল। উহা বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয় নাই। লোকে এই সকল নাটক অভিনয় করিতে পারিত না বটে, কিন্তু অবলীলাক্রমে পাঠ করিতে পাইত। প্লেতো অকুণ্ঠিত ভাবে তাঁহার একজন প্রধান শিষ্যকে এই শ্রেণীর এক খানি অপকৃষ্ট নাটক পাঠ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন এবং এণ্টিয়কের প্রসিদ্ধ বাগ্মী, গ্রন্থকার ও ধর্ম্ম-প্রচারক ক্রাইসস্তোম্

---

* বিয়োগান্ত নাটকের অনেক পরে এথেন্সে সংযোগান্ত নাটকের গৌরব হয়। খ্রীঃ পূঃ ৪৬০ অব্দ পর্য্যন্ত এথেন্সে এই বিষয়ের একজনও প্রধান কবি বর্ত্তমান ছিলেন না। মাগনেস, ক্রাতিনস, প্রভৃতি কবি খ্রীঃ পূঃ ৪৬০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। আরিস্তোফেনেসের কাব্য খ্রীঃ পূঃ ৪২৭ অব্দে লিখিত হয়। এই সকল কবির প্রণীত সংযোগান্ত নাটক গ্রীসে অভিনীত হইত।

অকুণ্ঠিত ভাবে প্লেতোর অনুমোদিত উক্ত নাটকের অধ্যয়নার্থ বহু রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

এথেন্সবাসীরা এইরূপে স্বরাজ্য-প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরোধী ও ব্যক্তিবিশেষের গ্লানিকর গ্রন্থাদি প্রচারের আংশিক নিষেধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু সম্প্রদায়বিশেষের দুর্নীতি-বিধায়ক গ্রন্থাদির প্রতি তাহারা তাদৃশ কঠোর ভাব প্রদর্শন করে নাই। এপিকিউরীয়দিগের ভোগ-তৃষ্ণা, কাইরিনেয়িকদিগের দৈহিক সুখেচ্ছা ও কাইনিকদিগের * অসামাজিক দুরাচার দমনে এথেনীয়দিগের কঠোর বিধি প্রয়োজিত হইত কি না, ইতিহাস তদ্বিষয়ে মৌনাবলম্বী হইয়া রহিয়াছে। পুরাবৃত্ত এইরূপ নীরবে থাকাতে বোধ হয়, পূর্ব্বে এথেন্স নগরেও এই সকল সম্প্রদায়ের অপসিদ্ধান্ত ও অশ্রদ্ধেয় মতের সমর্থক গ্রন্থ সকল প্রচলিত ছিল।

স্পার্টা শাস্ত্রানুশীলন বিষয়ে এথেন্সের ন্যায় উন্নত ছিল না। স্পার্টা-

---

* এপি কুরস্ খ্রীঃ পূঃ ৩৪২ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া খ্রীঃ পূঃ ২৭০ অব্দে মানব-লীলা সম্বরণ করেন। তিনি মনে করিতেন, অন্যান্য পদার্থের ন্যায় দেব দেবীগণও পরমাণু-সমষ্টি। তাঁহারা সর্ব্বদা সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করেন। এই সুখ সচ্ছন্দের হানি হয় বলিয়া তাঁহারা পৃথিবীর বিষয়ে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করেন না। মিল্টন উল্লেখ করিয়াছেন, শারীরিক সুখ ও অযত্ন-সম্ভূত সচ্ছন্দতাই এপিকুরসের সার ধর্ম্ম। এপিকুরসের মতাবলম্বী দিগকে "এপিকুরীয়র" কহে।

কাইরেনবাসী আরিস্তিপাস্ "কাইরিনেয়িক" সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার মতে শারীরিক সুখ-সম্ভোগ লজ্জাকর নহে। কিন্তু যখন তখন উহা পরিত্যাগ করিতে না পারাই অত্যন্ত লজ্জাকর। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য উভয়ই সমভাবে মানব জাতির সুখোৎপাদনে সমর্থ। আরিস্তিপাস খ্রীঃ পূঃ ৩৭০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

এথেন্স-বাসী আন্তিস্থিনেস নামে সক্রেতিসের একজন শিষ্য "কাইনিক" সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এথেন্স নগরে "কাইনোসারগস" নামে একটী বিদ্যালয় ছিল। আন্তিস্থিনেস এই বিদ্যালয়ে বিদেশিনীর গর্ভজাত সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতেন। "কাইনোসার্গস" বিদ্যালয় হইতে এই সম্প্রদায়ের নাম "কাইনিক" হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহাদের রীতি পদ্ধতি কুক্কুরের আচারের ন্যায় ছিল; এই জন্য ইহাদিগকে "কাইনিক" বলিত। কাইনিকদিগের মত ও ষ্টোয়িকদিগের মত প্রায় এক প্রকার।

বাসীরা কেবল সামরিক কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিত। অসামান্য বীরত্ব, অলৌকিক সাহস, অতুল রণ-শিক্ষায় স্পার্টা আজ পর্য্যন্ত বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এই সমর-ব্যবসায়ই স্পার্টা-বাসিদিগকে শাস্ত্রানুশীলনে একরূপ বিমুখ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপক লাইকর্গসের শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রানুশীলন-চেষ্টাও ইহাদের হৃদয় উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে শোভিত করিতে সমর্থ হয় নাই। লাইকর্গস নিজে বিদ্বান্, বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্যার মর্য্যাদা-রক্ষক ছিলেন। তিনি প্রথমে হোমরের মহাকাব্য আয়োনিয়া হইতে গ্রীসে আনিয়া প্রণালীবদ্ধ করেন; এবং তিনিই প্রথমে স্পার্টাবাসিদিগের যুদ্ধোন্মত্ত কঠোর হৃদয় সুমধুর সঙ্গীতের আলোচনায় মৃদুল ও সভ্যতার নিয়মে সুশিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে থেলস্ নামে একজন কবিকে ক্রীট দ্বীপ হইতে স্পার্টায় পাঠাইয়া দেন। লাইকর্গসের ঈদৃশী ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলেও স্পার্টাবাসীরা আপনাদের চিরাচরিত কয়েকটী বিষয় ভিন্ন আর কিছুতেই তাদৃশ আসক্ত ছিল না। সুতরাং স্পার্টায় গ্রন্থাদির প্রচার সম্বন্ধে কোনরূপ নিয়ম ব্যবস্থাপনের আবশ্যকতা হয় নাই। স্পার্টার লোকেরা একবার আর্কিয়োলোকাস নামে একজন কবিকে আপনাদের দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করে। আর্কিয়োলোকাস যে সমস্ত কবিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় স্পার্টাবাসিদিগের সামরিক সঙ্গীত অপেক্ষা উচ্চভাবের উদ্দীপক হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন এই কারণে নির্ব্বাসন-দণ্ড বিহিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে, কবিতার অশ্লীলতাদোষই তাঁহার নির্ব্বাসনের কারণ। এই নির্দ্দেশ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু, স্পার্টার সমাজে ধর্ম্মনীতির বন্ধন তাদৃশ দৃঢ়তর ছিল না। ইউরিপিদেস্ নামে একজন কবি স্পার্টার মহিলাদিগকে লজ্জাহীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই *।

* ইউরিপিদেস্ স্বপ্রণীত কাব্যে এই ভাবে স্পার্টার মহিলাদিগের বর্ণনা করিয়াছেন :——

যে সমাজের শীলতা এমন শিথিল, সে সমাজে কোন কবির রচিত কবিতার কোন স্থলে দূষিত ভাব ছিল বলিয়া যে, তাঁহার নির্ব্বাসন রূপ গুরুতর দণ্ড হইবে, এরূপ বিশ্বাস হয় না।

যাহা হউক, গ্রীসদেশে যে প্রকারের লেখা আইনে নিষিদ্ধ ও দণ্ডার্হ ছিল, তাহা উল্লিখিত হইল। রোমে এই বিষয়ে কিরূপ প্রতিষেধ-বিধি ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যাইতেছে। কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত রোমেও বিদ্যাচর্চ্চার তাদৃশ প্রাদুর্ভাব ছিল না। বীররস প্রথম প্রথম স্পার্টা-বাসিদিগের ন্যায় রোমকদিগকেও উন্মাদিত করিয়া তুলিয়াছিল। স্পার্টা ও রোমের আভ্যন্তরীণ সমাজ প্রথমে এক উপাদানেই সংগঠিত হয়। এক দিকেই উভয়ের গতি হয়, উভয়েই অসীম সাহস, অসামান্য উৎসাহ ও অতুল অধ্যবসায় সহকারে প্রতিবেশবাসিদিগের সহিত সমরপ্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া রণকণ্ডূ বিনোদন করে। ক্রমে জ্ঞানের ক্ষীণালোক ধীরে ধীরে রোমে প্রবিষ্ট হয়, ধীরে ধীরে আপনার তেজ সংগ্রহ করে এবং শেষে এথেন্সের অনুকূলতায় সম্প্রসারিত হইয়া অপ্রতিহত বেগে সমস্ত রোমরাজ্য আলোকিত করিয়া তুলে। রোমকেরা প্রথমে

"দেখাতে সাহসবীর্য্য যুবকের দলে,
আলয় ছাড়িয়া তারা মিলিত সকলে,
বায়ুবেগে তনু বাস উড়িয়া যাইত,
ক্রীড়া-কালে চারু অঙ্গ উলঙ্গ হইত"

এই লজ্জাহীনতার বিবরণে প্রতিপন্ন হইতেছে, স্পার্টার মহিলাগণের মধ্যে তাদৃশ শীলতার গৌরব ছিল না।

গ্রোট সাহেব গ্রীসের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, স্পার্টাবাসিনীগণ পুরুষদিগের ন্যায় মল্ল-যুদ্ধে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিত। তাহারা একটী আলগা "টিউনিক" (গাত্রাবরণ বিশেষ) মাত্র পরিধান করিত। তজ্জন্য তাহাদের হস্ত পদাদি দেখা যাইত।

আপনাদের প্রসিদ্ধ "দ্বাদশ ধারা" নামক * আইন ও যাজক-সমাজ হইতে ব্যবহারশাস্ত্র ও রীতিপদ্ধতি শিক্ষা করে। এই দ্বাদশ ধারা ও যাজক-সমাজ ভিন্ন আর কেহই রোমের শিক্ষা-গুরু ছিল না। পরে খ্রীঃ পূঃ ১৫৫ অব্দে এথেন্স হইতে দুই জন রাজদূত রাজকার্য্য উপলক্ষে রোমে উপনীত হন। বিদ্যা ও নানা বিষয়ে ইহাদের বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। রোমের যুবকগণ এত দিন সঙ্কুচিত জ্ঞানের যে সঙ্কুচিত সীমায় আবদ্ধ ছিল তাহা অতি-ক্রম পূর্ব্বক প্রসারিত জ্ঞানের প্রসারিত ক্ষেত্রে উপনীত হইতে ইচ্ছা করিয়া ইঁহাদের নিকটে গমন করিল এবং অপূর্ব্ব আনন্দসহকারে ইঁহাদের নিকট বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। এই দূতদ্বয়ের অন্যতরের নাম কারনিদেস। কারনিদেস বিজ্ঞান শাস্ত্রের উপদেশ দিয়া রোমে অদৃষ্টচর বৈজ্ঞানিক বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। তাঁহার উর্জ্জস্বল বাগ্মিতা রোমক যুবকদিগের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় উৎসাহ সঞ্চা-রিত করিল। ইহা দেখিয়া কেতোর হৃদয়ে গভীর আশঙ্কার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, কারনিদেস বিজ্ঞানের উপদেশ দিয়া রোমক-দিগের হৃদয় যেরূপ তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে রোমক-দিগের সমরানুরাগ শীঘ্র কমিয়া আসিবে, এই দূতের খ্যাতি ও প্রতি-পত্তি যেমন দিন দিন বাড়িতে লাগিল, কেতোর হৃদয়ও তেমনি দিন দিন আতঙ্কের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। দূতের প্রথম বক্তৃতা যখন লাতিন ভাষায় অনুবাদিত হইল, তখন

---

* খ্রীঃ পূঃ ৪৫৪ অব্দে গ্রীসীয় আইন শিক্ষার জন্য তিন ব্যক্তি রোম হইতে গ্রীসদেশে প্রেরিত হন। খ্রীঃ পূঃ ৪৫২ অব্দে তাঁহারা রোমে প্রত্যাগত হইলে দশ ব্যক্তিকে লইয়া একটী সভা করা হয়। এই সভার সভ্যদিগকে 'দিসেম্বির" বলা হইত। ইঁহারাই আইন প্রণয়নে নিয়োজিত হন। ইহঁাদিগের বিধি-বদ্ধ আইন "দ্বাদশ ধারা" নামে প্রসিদ্ধ। এই আইনপ্রণয়ন খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে সম্পন্ন হয়।

রোম নগরে যাজকদিগের একটী সমাজ ছিল। এই সমাজ সমস্ত ধর্ম্ম-কার্য্যের উপর আধিপত্য করিতেন।

কেতো আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে সেনেট সভায় উপস্থিত হইয়া দূতকে রোম হইতে দূরীভূত করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সিপিও প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান সভ্য এবিষয়ে আপত্তি করাতে বিদ্যার সম্মান রক্ষা পাইল। শেষে কেতো স্বয়ংই বৃদ্ধাবস্থায় গ্রীক সাহিত্যের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে নেবিয়স এবং প্লতাস বহুবিধ নাটক রচনা করিয়া উহার তরঙ্গে রোম প্লাবিত করিয়া তুলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ইতালিতে সাহিত্যের চর্চ্চা আরম্ভ হয়। পরে নেবিয়স যখন তীব্র শ্লেষ-পূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন গ্লানির প্রতিষেধক আইন করিবার প্রয়োজন হইল। নেবিয়স স্বপ্রণীত কবিতায় অভিজাত সম্প্রদায়ের কোন কোন ব্যক্তির নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া এক সময়ে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

রোমের সম্রাট্ অগস্তসের সমক্ষেও নিন্দাপূর্ণ গ্রন্থ সকল দগ্ধ করা হইত, এবং গ্রন্থকারেরা রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতেন। ফলতঃ এথেন্সের ন্যায় রোমেও দেবদ্বেষী ও নরনিন্দক গ্রন্থকারদিগকে বিলক্ষণ রাজদণ্ড ভোগ করিতে হইত। এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন মাজিষ্ট্রেট অন্য কোন গ্রন্থের দোষগুণের বিচার করিতেন না। সুতরাং এথেন্সের ন্যায় রোমেও দুর্নীতির পরিপোষক ও উৎসাহদায়ক গ্রন্থ সকল বিনা বাধায় প্রণীত ও প্রচারিত হইত। রাজনীতি-বিষয়ক গ্রন্থের প্রচার সম্বন্ধে রোমের সাধারণতন্ত্র কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করেন নাই। লিবির ইতিহাস যদিও রোমের রাজসংসারের এক দলের বিরুদ্ধবাদী ছিল, তথাপি সেই দলের অধিনেতা অক্তবিয়স কাইসর উক্ত গ্রন্থের প্রচার রহিত করেন নাই। ইহার পর অক্তবিয়স কাইসর রাজপদে সমাসীন হইয়া ওবিদ নামক একজন কবিকে রোম হইতে নির্ব্বাসিত করেন। লোকে তখন মনে করিয়াছিল, ওবিদ এক খানি অশ্লীল কাব্য প্রণয়ন করাতে তাঁহার এই নির্ব্বাসন-দণ্ড

হয়। আর কেহ কেহ এই নির্ব্বাসনের অন্যান্য কারণ নির্দ্দেশ করেন। তন্মধ্যে একটী কারণ এই, অগস্তসের কন্যার সহিত ওবি-দের প্রণয় জন্মিয়াছিল, ইহাতে সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে দেশান্তরিত করিয়া দেন। ওবিদ স্বয়ং কহিয়া গিয়াছেন, তিনি ঘটনাক্রমে একখানি গোপনীয় সরকারী কাগজ দেখিয়াছিলেন, এজন্য সম্রাট তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। যাহা হউক, কালক্রমে রোমে সাধারণতন্ত্র বিলুপ্ত হইলে একনায়কতন্ত্রের সৃষ্টি হইল। এই সময়ে গ্রন্থকারেরা অনেক পরিমাণে নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইতে লাগিলেন। ইহাতে অসদ্ গ্রন্থের যত দমন হউক বা না হউক, সদ্‌গ্রন্থের বিলক্ষণ অনিষ্ট ও তন্মূলক রোমের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল।

ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলেও প্রথমে গ্রন্থকারদিগের উপরে অনেক প্রকার অত্যাচার হয়। প্রথম অবস্থায় ধর্ম্মান্ধতা অতিশয় বলবতী ছিল। তদানীন্তন খ্রীষ্টমতাবলম্বিদিগের হৃদয় কুসংস্কারে এমনি আছন্ন হইয়াছিল যে, গ্রন্থের প্রচারণ বিষয়ে বাধা দেওয়া যে, কেমন অনুদারতার কাজ, তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়-সময়ে প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরোধী গ্রন্থ সকল একটী নির্দ্দিষ্ট সভায় পরীক্ষিত হইয়া দণ্ডার্হ হইত। যাবৎ এই সভা পুস্তক পরীক্ষা না করিতেন, তাবৎ কোন সম্রাট্ কোন পুস্তক দগ্ধ বা তাহার প্রচার বন্ধ করিতে পারিতেন না। কেবল খ্রীষ্টীয় মতের বিরোধী গ্রন্থের বিষয়েই এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ সময়ে ধর্ম্মান্ধতা এত প্রবল হইয়াছিল যে, খ্রীঃ ৩৯৮ অব্দে কার্থেজে যখন সভা হয়, তখন ধর্ম্মযাজকগণকে প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় গ্রন্থ পাঠ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ পাদ্রী পল কহিয়া গিয়াছেন, অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত ধর্ম্মযাজকগণ ও মন্ত্রি-সভা কোন্ কোন্ গ্রন্থ অসৎ, কেবল তাহারই নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন; তাহার পর সেই সকল গ্রন্থের অনুশীলন পাঠকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর পর রোমের পোপেরা যখন রাজ-

নীতি-সংক্রান্ত বিষয়ে প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন, তখন যে সকল গ্রন্থ বা প্রবন্ধের প্রতি তাঁহারা কোন প্রকার আপত্তি করিতেন, তৎসমুদয় অগ্নিমুখে নিক্ষিপ্ত হইত। পঞ্চম মার্টিনের শাসন-কাল পর্য্যন্ত এই কঠোর নিয়ম প্রবল থাকিয়া উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল নিঃশেষিত প্রায় করিয়া তুলে। পঞ্চম মার্টিন যে ঘোষণা-পত্র প্রচারিত করেন, তাহাতে জানা যায়, কেবল যে খ্রীষ্টীয় মতের বিরোধী গ্রন্থের অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছিল এরূপ নয়, যে সকল ব্যক্তি এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিতেন, তাহাদিগকেও ধর্ম্ম-সম্প্রদায় হইতে নিষ্কাশিত করা হইত। স্পেনের গ্রন্থ-শাসনী সভার সহিত অস্ট্রিয়ার অংন্তপাতী ট্রেণ্ট নগরের বিখ্যাত সভার যে পর্য্যন্ত কোন সংশ্রব ছিল না, সে পর্য্যন্ত দশম লিও ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ পঞ্চম মার্টিনের প্রবর্ত্তিত নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ১৫৪৫ অব্দে ট্রেণ্টের সভার অধিবেশন। চতুর্থ পায়স এই সময়ে রোমে পোপের পদে সমাসীন ছিলেন। এই সভা পুস্তকাদির সম্বন্ধে দশটী নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। এই দশটী নিয়মই পোপ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সভায় স্থিরীকৃত হয় যে, নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষকগণ সমুদয় পুস্তকেরই পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। যে সকল পুস্তক পরীক্ষকদিগের অনুমোদিত হইবে, তৎসমুদয় মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে দেওয়া যাইবে। পরীক্ষক-সমাজ সে সকল গ্রন্থের অনুমোদন না করিবেন, তৎসমুদয় প্রকাশ করিতে দেওয়া যাইবে না। নিষিদ্ধ গ্রন্থ সকলের একটী তালিকা প্রস্তুত করা হইত। এই তালিকা দুই অংশে বিভক্ত ছিল। এক অংশে সার্ব্বাংশে দূষিত গ্রন্থাবলীর নাম, এবং অপর অংশে সংশোধনোপযোগী গ্রন্থের নাম লিখিত হইত। এই নিষিদ্ধ গ্রন্থের অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও প্রচারণের সম্বন্ধে গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ট্রেণ্টের সভার একটী তালিকা ছিল। খ্রীঃ ১৫৫৯ অব্দে চতুর্থ পল আর একটী তালিকা প্রস্তুত করেন। ৬১জন মুদ্রাকর এই তালিকায় লিখিত নিষিদ্ধ

পুস্তকের মুদ্রন-অপরাধে রাজদ্বারে দণ্ডিত হন এবং তাঁহাদের মুদ্রাযন্ত্রস্থ সমুদয় পুস্তকের প্রচার প্রতিষিদ্ধ হয়। পঞ্চম পায়সের শাসন-সময়েও এই কঠোর নিয়ম প্রবল থাকে। পঞ্চম পায়স নিষ্ঠুর-স্বভাব ও ধর্ম্মান্ধ ছিলেন। সুতরাং তিনি পুস্তকাদির প্রচার সম্বন্ধে তীব্রতর নিয়ম ব্যবস্থাপনে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় ব্যবস্থার তীব্রতা ও কঠোরতা কিয়দংশে তিরোহিত হইয়া আইসে।

এইরূপে রোমের ধর্ম্মান্ধ পোপেরা সাহিত্যের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তাঁহাদের অপরিসীম ক্ষমতা, অবিচলিত দৃঢ়তা ও প্রগাঢ় ধর্ম্মান্ধতা তাঁহাদের হৃদয়কে কঠোরতর করিয়া তুলে, বিচার-শক্তিকে কলুষিত করিয়া দেয়, বিবেক বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলে এবং উদারতাকে দূরপনেয় কলঙ্কসাগরে ডুবাইয়া রাখে। তাঁহারা ধর্ম্ম-জগতের অদ্বিতীয় বিধাতা হইয়াও অধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন এবং সারস্বতী শক্তির অপ্রতিহত প্রতিপোষক হইয়াও তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনায় উদ্যত হন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় অনোরিয়স, নবম গ্রেগরী এবং চতুর্থ ইনোসেণ্ট প্রচলিত ধর্ম্মানুশাসনের বিরুদ্ধবাদী গ্রন্থসমূহের বিচারার্থ যে সভা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ট্রেণ্টের সভা-কর্ত্তৃক যে নিয়মাবলী প্রণীত হয়, তাহা পোপের শাসিত সমস্ত রাজ্যে ভাষার উন্নতির মূলে আঘাত করে। পোপেরা প্রতিষিদ্ধ পুস্তক-সমূহের যে তালিকা প্রস্তুত তরেন, তাহাতে অনেক অসুবিধা ঘটিতে থাকে। তালিকাগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রস্তুত হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশের শব্দার্থ ও ভাবগত সাদৃশ্য না থাকাতে ভিন্ন দেশের তালিকাগুলি পরস্পর বিপরীত মতের পরিপোষক হইয়া উঠে। এইরূপে পরীক্ষক-সমাজের অব্যবস্থিততায় বিজ্ঞান ও সাহিত্যাদি গ্রন্থের নিতান্ত শোচনীয় দশা সঙ্ঘটিত হয়। রোমের এই কঠোর শাসনের মধ্যেও দুই একটী প্রদেশে পুস্তকাদির প্রচার সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত উদার ভাব লক্ষিত হইয়াছিল। ইহার উদাহরণ

স্থলে বিনিসের নাম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বিনিসে সকলেই অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ভাবে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতে পারিত, রোমের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা এ স্বাধীনতার বিলোপে সমর্থ হয় নাই।

ইঙ্গলণ্ডেও পুস্তকাদির প্রচার সম্বন্ধে নিতান্ত কঠোর ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন এথেন্‌স ও রোমের ন্যায় ইঙ্গলণ্ডও গ্রন্থসংহার বিষয়ে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। অষ্টম হেন্‌রির রাজত্ব-সময়ে সকল প্রকার গ্রন্থই অগ্নিমুখে নিক্ষিপ্ত হইত। এড্‌ওয়ার্ডের রাজত্ব-কালে কাথলিক গ্রন্থ-সমূহ, মেরির শাসন সময়ে প্রোটেষ্টাণ্ট গ্রন্থাবলী, এলিজাবেথের আধিপত্য-সময়ে রাজনীতি-সংক্রান্ত গ্রন্থ এবং প্রথম জেম্‌স ও তাঁহার পুত্রদিগের প্রভুত্ব-কালে ব্যক্তি-বিশেষের গ্লানিকর গ্রন্থসকলও এইরূপ করাল অনল-শিখায় আত্মবিসর্জ্জন করিত। এলিজাবেথ কেবল গ্রন্থ দগ্ধ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন নাই। তাঁহার সময়ে গ্রন্থকার ও গ্রন্থ-প্রকাশকের প্রতিও অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি এক জন গ্রন্থকার ও গ্রন্থ-প্রকাশকের দক্ষিণ হস্ত ছেদন করেন! (কারণ গ্রন্থকার ঐ হাত দিয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছিলেন) এবং অন্য এক জন গ্রন্থ-কর্ত্তার প্রাণ-দণ্ডের অনুমতি দেন।

প্রথম চার্লসের সময় ইঙ্গ্‌লণ্ডে পুস্তক মুদ্রণের অনুমোদন-বিধি প্রবর্ত্তিত হয়। এই বিধি অনুসারে পরীক্ষকগণ যে সকল পুস্তক দূষণীয় বিবেচনা করিতেন, তৎসমুদয় মুদ্রিত ও প্রচারিত হইত না। এই সময়ে ইঙ্গলণ্ডে ঘোরতর অন্তর্বিপ্লবের প্রচণ্ড তরঙ্গাভিঘাত আরম্ভ হয়, ঘাতকের কঠোর কুঠারাঘাতে প্রথম চার্লস মানব-লীলা সম্বরণ করেন, এবং ষ্টুয়ার্টবংশীয়ের রাজত্বের স্থলে সাধারণতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। সাধারণ-তন্ত্রের আধিপত্য কালে পুস্তকাদির প্রচার ও মুদ্রণ-কার্য্যে লোকের স্বাধীনতা হইল। কবিকেশরী মিল্‌টন এই স্বাধীনতার পরিপোষক হইলেন। তাঁহার উত্তেজনা, তাঁহার যুক্তি-প্রণালী, তাঁহার ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, তাঁহার লিপি-চাতুরী ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের হৃদয় আন্দোলিত করিয়া তুলিল। ইহাতে তদানীন্তন পুস্তক-পরীক্ষক মাবটের

হৃদয়ে এমন উদার ভাব সঞ্চারিত হইল, যে মাবট স্বকার্য্য-পরিত্যাগার্থী হইয়া সাধারণতন্ত্র-সমাজের অধিনায়ক ক্রমওয়েলের নিকট আবেদন করিলেন। এই জন্য কিছু কাল পুস্তকাদি পরীক্ষার সম্বন্ধে কঠোরতা কিয়ৎ পরিমাণে অন্তর্হিত হয়। কালক্রমে সাধারণতন্ত্রের বিলয় হইল, কাল ক্রমে ষ্টুয়ার্ট বংশ আবার ইঙ্গলণ্ডের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইল। দ্বিতীয় চার্লস ইঙ্গলণ্ডের রাজ-পদে সমাসীন হইলে এই পরীক্ষার সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম ব্যবস্থাপিত হয়। এই নিয়মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-সংক্রান্ত পুস্তকের পরীক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ২০ জনকে প্রধান মুদ্রাকর করা হয়। ইহারা যথানিয়মে জামিন দিয়া মুদ্রণ-কার্য্য সম্পাদন করিত। লণ্ডন, ইয়র্ক, অক্‌স্‌ফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন আর কোন স্থানে পুস্তক-মুদ্রণের অধিকার দেওয়া হয় নাই। অননুমোদিত পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইলে মুদ্রাকর প্রভৃতির উপর কঠোর দণ্ড প্রয়োজিত হইত। মুদ্রণ-সংক্রান্ত এই আইন তিন বৎসর কাল অপরিবর্ত্তিত থাকে। ইহার পর আবার দুইবার এই আইন অনুসারে কার্য্য হয়। আইন প্রচলিত হইলে স্যার রজর এষ্ট্রেঞ্জ নামে একজন বিখ্যাত পুস্তক-লেখক পুস্তক-পরীক্ষকের পদে নিয়োজিত হন। ইঁহার সূক্ষ্ম পরীক্ষার সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ইনি মিল্‌টনের সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গভ্রষ্ট কাব্যের দুই এক পংক্তিরও দোষোল্লেখ করিয়াছিলেন।

এই পরীক্ষা-প্রণালী তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তৃতীয় উইলিয়মের শাসন-কালেই খ্রীঃ ১৬৯৫ অব্দের ৩রা মে ইঙ্গ্‌লণ্ডের উদার শাসনপ্রণালীর গুণে ও উদার মতের প্রতিপোষক সম্প্রদায়ের চেষ্টায় উক্ত বিধি বিলুপ্ত হয় এবং মুদ্রণ-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠে। মুদ্রণ-স্বাধীনতা ইঙ্গলণ্ডের উদার রাজনীতির একটী প্রধান ফল। এই স্বাধীনতার গুণে সকল প্রকার পুস্তক, সকল প্রকার সংবাদপত্র ও সকল প্রকার সাময়িক পত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া ভাষাকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিতেছে।

এই স্বাধীনা না থাকিলে ইঙ্গলণ্ডের সংবাদপত্র এত অল্প সময়ে এত উন্নত হইয়া সমাজের বাগ্‌যন্ত্র রূপে পরিণত হইতে পারিত না।

চীন দেশের প্রাচীন ইতিহাসে আমরা এক খানি সংবাদপত্রের উল্লেখ দেখিতে পাই। ইহা রোম নগর নির্ম্মাণের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। এই পত্র খানিকে পৃথিবীর সমস্ত সংবাদ-পত্রের আদি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে অসঙ্গত হয় না। খ্রীষ্টের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে রোমে "একতাডায়রণা" নামে এক খানি সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। এই সংবাদপত্রে রোমের সাধারণ ঘটনা বর্ণিত হইত *। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বসাময়িক পত্রের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। খ্রীষ্টের পরে ইতালিতে যে সংবাদপত্র প্রচারিত হয়, তাহার নাম "নোটিজি স্কি টি"; ইহা প্রতিমাসে বেনিস নগর হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার পর বেনিসে মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে "গেজেট" † নামে আর একখানি সংবাদপত্র মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে গেজেটের বহুল প্রচার হইবে এই আশঙ্কা করিয়া, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উহার

---

* এই সংবাদপত্রস্থিত সংবাদের একটী নমুনা দেওয়া যাইতেছে। রোম নির্ম্মাণের ৫৮৫ বৎসর পরে "একতাডায়রণায়" এই সংবাদটী লিখিত হয়—"সন্ধ্যার প্রাক্কালে বোনতাইন পর্ব্বতের এক অংশে বজ্রপাত হওয়াতে একটী ওক-বৃক্ষ বিনষ্ট হইয়াছে। ব্যাঙ্কার ষ্ট্রীটের দক্ষিণ সীমায় যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে এক জন বিশ্রাম-গৃহ-রক্ষক সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়াছে। মাংস-বিক্রয়িগণ ওবারসিয়রের অপরীক্ষিত মাংস বিক্রয় করিয়াছিল বলিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেট, তার্দ্দিনিয়স তাহাদের জরিমানা করিয়াছেন। এই জরিমানার টাকা তেলাস দেবীর মন্দির-সংলগ্ন উপাসনা-গৃহ নির্ম্মাণে প্রদত্ত হইয়াছে।

† একরূপ মুদ্রার নাম "গেজেটা"। একটি "গেজেটা" দিলেই লোকে সংবাদ-পত্র পড়িতে পাইত। এজন্য 'গেজেটা' মুদ্রার নামানুসারে সংবাদপত্রের নাম "গেজেট" হয়।

মুদ্রণ-কার্য্য স্থগিত রাখেন। সুতরাং "গেজেট" নোটিফি স্ক্রিটির ন্যায় হস্ত-লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সকল সংবাদ-পত্রের অবস্থা তাদৃশ উন্নত ছিল না। ইঙ্গ্লণ্ডে মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থার আধিপত্য সময়ে "লণ্ডন গেজেট," "অবজারবেটর প্রভৃতি" নামে যে সমস্ত সংবাদপত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তৎসমুদয়ও বিনিসীয় গেজেটের অনুরূপ ছিল। ফলে মুদ্রণ-স্বাধীনতার অভাবে কোন সাময়িক পত্রই উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। পরে পরিবর্ত্তনশীল সময়ের প্রভাবে যখন মানব-সমাজে সভ্যতা ও উদারতা পরিপুষ্ট হইয়া মুদ্রণ-স্বাধীনতা স্থাপন করিল, তখন হইতেই সংবাদপত্রের উন্নতি ও তন্নিবন্ধন সামাজিক মঙ্গলের সূত্রপাত হইল।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ন্যায় ভারতে মুদ্রণ-স্বাধীনতার ইতিহাসেও প্রথমে অনেক স্বেচ্ছাচারিতা পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কি ইঙ্গরেজী, কি বাঙ্গালা কোন সংবাদপত্রেরই স্বাধীনতা ছিল না। প্রথম গবর্ণর জেনেরেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময়ে ভারতবর্ষে প্রথম ইঙ্গ্রেজী সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। এই সময়ে হিকি নামক এক জন সাহেব, হিকির বেঙ্গল গেজেট নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, এই হিকির গেজেটই ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম ইঙ্গ্রেজী সংবাদপত্র। ১৭৮০ অব্দে ইহা প্রচারিত হয়। হিকি সাহেবের এই গেজেটে সংবাদ-পত্রের উপযুক্ত ধীরতা বা গাম্ভীর্য্য ছিল না। সম্পাদক অনেক সময়ে ব্যক্তিবিশেষকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করিতেন। যাহা হউক, হেষ্টিংসের পর লর্ড করণ্ওয়ালিস্ ও স্যার জন শোরের শাসন-সময়ে সংবাদপত্র ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সময়ে সংবাদপত্র ব্যক্তিবিশেষের নিন্দা অনেকটা পরিত্যাগ করে, এবং যে যে বিষয়ের সহিত সাধারণের সংশ্রব আছে, তাহারই আন্দোলন করিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা ধীর ও গম্ভীর ভাবে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে থাকে। কিন্তু এসময়েও সংবাদপত্রের উপর গবর্ণ-মেণ্টের কিছুমাত্র অনুরাগ ছিলনা। সম্পাদকদিগকে অনেক সময়ে

রাজদ্বারে অপদস্থ হইতে হইত। ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে ইহার উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য নহে। ১৭৯৪ অব্দে ডুয়ানে নামক এক জন আমেরিকা-বাসী আইরিষ কলিকাতায় "ইণ্ডিয়ান্ ওয়ার্লড" নামে এক খানি সংবাদপত্র বাহির করেন। ১৭৯৫ অব্দের ১লা জানুয়ারি ডুয়ানে আপনার সংবাদপত্র বিক্রয় করিবার সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। "ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লডে" যদিও গবর্ণমেণ্ট তীব্রভাবে তিরস্কৃত বা অবমানিত হন নাই, সম্পাদক যদিও গবর্ণমেণ্টের সম্মান রক্ষা করিয়াই প্রবন্ধসমূহ প্রকাশ করিতেন, তথাপি ডুয়ানে কর্তৃপক্ষের বিষদৃষ্টিতে প'ড়িলেন। এই সময়ে স্যার জন শোর (পরে লড টেনমাউথ) ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭৯৪ অব্দের ২৭এ ডিসেম্বর গবর্ণরজেনেরলের প্রাইবেট্ সেক্রেটরী কাপ্তেন কলিন্স ডুয়ানেকে গবর্ণমেণ্ট হাউসে আসিতে অনুরোধ করিলেন। ডুয়ানে নিজের কোন অপরাধ জানিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার হৃদয়ে কোনরূপ আশঙ্কার আবির্ভাব হইল না। তিনি ভাবিলেন, বোধ হয় গবর্ণরজেনেরল তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। ডুয়ানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রফুল্লচিত্তে গবর্ণরজেনেরলের বাটীতে উপনীত হইলেন। কাপ্তেন কলিন্স তাঁহাকে একটী ঘরে লইয়া গিয়া কহিলেন,

"আপনি যে, এমন নিয়মিত সময়ে নিয়মিত রূপে সমুদয় কাজ করেন, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি',

ডুয়ানে পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্ল চিত্তে কহিলেন,

"আমি সকল কাজই যথাসময়ে করিয়া থাকি। ভরসা করি, গবর্ণরজেনেরল মহোদয় ভাল আছেন।"

এই কথায় কাপ্তেন কলিন্স বলিলেন,

"তাঁহার দেখা পাইবেন না এবং——————"

ডুয়ানে কিছু সন্দিগ্ধ হইলেন; কাপ্তেনের কথা শেষ না হইতে হইতেই তাঁহাকে কহিলেন,

"আমি বুঝিয়াছিলাম, তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।" কাপ্তেন কলিন্স গম্ভীরভাবে কহিলেন,

"হাঁ। কিন্তু আমি গবর্ণরজেনেরলের আদেশে আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনি এখন কয়েদীর মধ্যে পরিগণিত হইলেন।"

সম্মুখ ভাগে অকস্মাৎ বজ্রপাত হইলে পথিক যেরূপ স্তম্ভিত হয়, কাপ্তেন কলিন্সের কথায় ডুয়ানে সেইরূপ স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার ললাটদেশ আকুঞ্চিত ও নয়ন-যুগল বিস্ফারিত হইল। অসময়ে অতর্কিত ভাবে এইরূপ অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া তিনি মর্ম্মপীড়ায় কাতর হইলেন। এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র কতিপয় সঙ্গীন-ধারী সৈন্য আসিয়া ডুয়ানেকে বেষ্টন করিল। এই সময়ে ডুয়ানে মুক্ত দ্বার-পথে দেখিলেন, গবর্ণরজেনেরল স্যার জন শোর ব্যবস্থাপক সমাজের দুই জন সদস্যের সহিত একখানি সোফায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ডুয়ানে কাপুরুষ ছিলেন না, সাহসের সহিত কহিলেন,

"স্যার জন শোর এবং (কাপ্তেন কলিন্সের দিকে মুখ ফিরাইয়া) আপনি যে, এরূপ নীচপ্রকৃতি ও এরূপ বিশ্বাস-ঘাতক হইবেন, তাহা আমি কখনও ভাবিনাই।"

"চুপ" গম্ভীর রবে কাপ্তেন কলিন্সের মুখ হইতে এই কথাটী বাহির হইল। পরে কাপ্তেন সৈন্যদিগকে কহিলেন, "ইহাকে লইয়া যাও"

"বন্ধুগণ! আমি ধীরে ধীরে তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি," ডুয়ানে সৈন্যদিগকে ইহা কহিয়া, কাপ্তেন কলিন্স্‌কে ঘৃণা ও বিদ্রূপের সহিত বলিলেন,

"কলিন্স্‌! ইহার পর আর কিসের আবির্ভাব হইবে? ধনুক না তরবারি?

কাপ্তেন কলিন্স্ঃ—"আপনি বড় দুর্ম্মুখ। (সৈন্যদিগের প্রতি) শীঘ্র ইহাকে লইয়া যা।"

ডুয়ানে পরিশেষে পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভীক চিত্তে কহিলেন,

"আপনি তুরুস্কের প্রধান উজীরের কার্য্য সুন্দর রূপে সম্পন্ন করিলেন। গবর্ণরজেনেরল তুরুস্কের সুলতান হইলেন, আর কলিকাতা তাঁহার কনস্তান্তিনোপল হইল।"

অস্ত্রধারী সৈন্যকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া, ডুয়ানে তিন দিন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে থাকেন। পরে তাঁহাকে ইঙ্গ্লণ্ডে লইয়া যাওয়া হয়। এইখানে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ভারতবর্ষে তাঁহার প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল, ইহার এক পয়সাও তাঁহার হাতে আইসে নাই। ডুয়ানে অতঃপর ফিলাডেলফিয়া নগরে যাইয়া "অরোরা" নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক হন। এই সংবাদপত্র সর্ব্বদা ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইত।

পরবর্ত্তী গবর্ণরজেনেরল লর্ড করণ্‌ওয়ালিসের উপর সংবাদপত্রের কোনরূপ আক্রোশ বা অশ্রদ্ধা ছিল না। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশ পাইত,তাহা করণ্‌ওয়ালিসের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াই লেখা হইত। অধিকন্তু ইহাতে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপের রীতিমত সমালোচনা থাকিত না। গবর্ণমেণ্ট যদি কোন বিষয়ে কোনরূপ কঠোরতার পরিচয় দিতেন, তাহা হইলেও ইহা বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিত না। সুতরাং তখন সাধারণকে যে যে সংবাদ দেওয়া হইত, অথবা সাধারণের সমক্ষে যে যে বিষয় লইয়া আন্দোলন হইত, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের ততটা অসুবিধা বা বিরক্তি জন্মিত না। কিন্তু লর্ড ওয়েলেস্‌লি যখন ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরল হইয়া আইসেন, তখন ইঙ্গ্‌রেজদের সহিত, ফরাসীদের ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল। ফরাসীগণ এই সময়ে ভারতবর্ষে ইঙ্গ্‌রেজদের ক্ষমতা লোপ করিয়া, আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিতে উৎসুক ছিল। এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে, ইঙ্গ্‌রেজ গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ সাবধানে ও ধীরভাবে কার্য্য করিতে হইত। এই সময়ে সংবাদপত্র যদি যুদ্ধের সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রকাশ করে, অথবা না বুঝিয়া ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন কথা রটাইয়া দেয়, এই আশঙ্কায় লর্ড ওয়ে-

লেস্‌লি সংবাদপত্রের সম্বন্ধে একটী নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। এই নিয়ম অনুসারে সংবাদপত্রের এক জন পরীক্ষক নিযুক্ত হন, এবং সম্পাদক ও পত্রাধিকারীর জন্য কতকগুলি বিধি প্রস্তুত হয়। এই বিধি লঙ্ঘন করিলেই ইঙ্গরেজ সম্পাদক ও পত্রাধিকারিদিগকে * ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে হইত, এবং ভারতবর্ষে বাস করিবার জন্য তাঁহাদের যে সমস্ত অনুমতি-পত্র † থাকিত, তৎসমুদয় রদ করা হইত। সুতরাং যে সকল সম্পাদক বা সংবাদপত্রের অধিকারী সংবাদ-পত্রে লেখার দোষে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতেন, তাঁহারা বিলাতে উপস্থিত হইয়াই, এবিষয়ে তুমুল গণ্ডগোল বাধাইতেন, ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজদের যথেচ্ছাচার ও দৌরাত্ম্যের উল্লেখ করিয়া, মহা আন্দোলন করিতেন, এবং যাহাতে মুদ্রণ-স্বাধীনতা স্থাপিত হয়, যাহাতে সংবাদপত্র-সমূহ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে পারে, তাহার জন্য স্থানে স্থানে তীব্র বক্তৃতা করিয়া, স্বদেশীয়দিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেন, অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া, স্বদেশীয়দের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন।

লর্ড মিণ্টোর শাসন-সময়েও (১৮০৭-১৮১৩ খ্রীঃ অব্দ) সংবাদপত্র সকল এইরূপ অবস্থায় থাকে। তখনও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ সংবাদপত্র হইতে নানারূপ আশঙ্কা করিতেন, সুতরাং তখন সংবাদ-পত্রের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হয় নাই। সে সময়ে ভারতবর্ষীয়-

---

* এ সময়ে দেশীয় ভাষায় কোন সংবাদপত্র ছিল না। সুতরাং কেবল ইঙ্গরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রভৃতির জন্যই এই বিধি প্রস্তুত হয়।

† ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-সময়ে, শাসন-সংক্রান্ত কর্ম্মচারী ভিন্ন, অপর যে সমস্ত ইঙ্গরেজ বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আসিত, তাহাদিগকে এ দেশে বাস করিবার জন্য এক একখানি অনুমতি-পত্র দেওয়া হইত। বৃটীষ গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে এই অনুমতি-পত্র রদ করিতে পারিতেন।

দিগকে অজ্ঞানে ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই, ইঙ্গ্রেজ গবর্ণমেণ্টের এক মাত্র নীতি ছিল। যদি স্বাধীন রাজ্যে অথবা সাধারণ-প্রজাদের মধ্যে জ্ঞানের কোনরূপ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে কোন উৎসাহ দিতেন না *। সংবাদপত্র হইতে কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানোন্নতির সম্ভাবনা আছে দেখিয়াই, মিণ্টোর গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রের অবস্থা উন্নত করিতে কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই; সুতরাং ওয়েলেস্‌লি যে পরীক্ষা-প্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, তাহাই সে সময়ে প্রবল থাকে। সম্পাদকদিগের প্রুফ (ছাপাইবার পূর্ব্বে, যে সকল কাগজে ভুল সংশোধন করা হয়) দেখিবার ভার, এক জন গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর হস্তে সমর্পিত হয়। এই প্রণালীর অধীনে সংবাদপত্র সকল লর্ড মিণ্টোর শাসন-কাল ও লর্ড হেষ্টিংসের শাসন-সময়ের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত, নিতান্ত দুরবস্থায় থাকে। কিন্তু এই শেষোক্ত গবর্ণরজেনেরল লর্ড মিণ্টো অপেক্ষা উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। সুতরাং তিনি কাল-বিলম্ব বা কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া, সাধারণকে জানাইলেন যে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্য, প্রকাশ্য সংবাদপত্রে সমালোচিত হওয়া উচিত। শাসনকর্ত্তা

* এ বিষয়ে একটী কৌতুকাবহ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। কাপ্তেন সিডেনহাম এই সময়ে হয়দরাবাদের ব্রিটীষ রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সম্বন্ধে নিজামের কৌতূহল-তৃপ্তির জন্য একটী বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্র, একটী মুদ্রাযন্ত্র ও একখানি যুদ্ধ-জাহাজের নমুনা আনয়ন করেন। সিডেনহাম এই বিষয় গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরীকে জানাইলে সেক্রেটরী মুদ্রাযন্ত্রের ন্যায় একটী ভয়ানক বিপত্তি-জনক অস্ত্র এক জন দেশীয় রাজার হস্তে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, রেসিডেণ্টকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। রেসিডেণ্ট তিরস্কৃত হইয়া লিখিয়া পাঠান এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কোন রূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। মুদ্রাযন্ত্রের প্রতি নিজাম কিছুই মনোযোগ দেন না। এক্ষণে উহা বিশৃঙ্খল ভাবে তোষাখানায় পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং সভ্যতার এই ভয়ানক অস্ত্র সুব্যবস্থিত হইয়া কোনও অনিষ্টের উৎপত্তি করিতে পারিবেন না। যদি গবর্ণমেণ্ট ইহাতেও ভীত হন, তাহা হইলে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইবে।

যতই সদভিপ্রায়ে ও পবিত্রভাবে কার্য্য করেন, ততই তিনি সাধারণকে তাঁহার কার্য্যের সমালোচনা করিতে দিতে সম্মত হইবেন।

গবর্ণরজেনেরলের এই অভিপ্রায় প্রকাশের পর, সংবাদপত্রে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের যে ব্যাঘাত ছিল, তাহা ক্রমে শিথিল হইয়া আইসে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে "কলিকাতা জর্ণল" নামে আর একখানি ইঙ্গ্‌রেজী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতে থাকে, এবং ইহার মত সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিবেচনার সহিত প্রকাশ পাইতে থাকে। গবর্ণমেণ্টের কার্য্য এই প্রথমে, সমান তেজে ও সমান সুবিচারে আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং গবর্ণমেণ্টের দুষ্টবুদ্ধি কর্ম্মচারিগণ এই প্রথমে সাধারণের সমক্ষে সমান তিরস্কৃত ও সমান নিন্দিত হইয়া উঠেন। ১৮১৮ অব্দে মিশনারিদিগের যত্নে শ্রীরামপুর হইতে "সমাচার দর্পণ" নামক প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। আমরা এ স্থলে যে হেষ্টিংসের উদার প্রকৃতির প্রশংসা করিতেছি, সেই হেষ্টিংসই এই প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্রের উৎসাহ দাতা। হেষ্টিংস যেমন সাধারণকে সংবাদপত্রে স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের ক্ষমতা দিয়া, ইঙ্গ্‌রেজ গবর্ণমেণ্টের গৌরব বাড়াইয়াছিলেন, তেমনি বাঙ্গালা সংবাদপত্রকেও যথোচিত উৎসাহ দিয়া, আপনাদের প্রকৃত মহত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। আক্ষেপের বিষয় এই, হেষ্টিংসের যে সকল মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রাচীন দলের লোক। সুতরাং সংবাদপত্রের প্রতি তাঁহাদের অনেকের সমবেদনা ছিল না। তাঁহারা সংবাদপত্র সকল পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থাতেই রাখিতে ভাল বাসিতেন। জন আডাম এই দলের প্রধান ছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস ইহাতেও অবিচলিত থাকেন। আডামের পরামর্শে তিনি স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের পথে কোন কণ্টক দেন নাই, অথবা আডামের মন্ত্রণায় তিনি সংবাদপত্রের স্কন্ধে কোন রূপ গুরুতর ভার চাপাইয়া রাখেন নাই।

কিন্তু হেষ্টিংসের কার্য্য-কাল শেষ হইল। তিনি ভারতবর্ষ পরি-

ত্যাগ করিলেন। এই অবসরে জন আডাম আবার জাগিয়া উঠিলেন। আডাম ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের এক জন পরিশ্রমী ও কার্য্য-কুশল কর্ম্মচারী ছিলেন। কিন্তু পুরাতন রাজনীতির প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা ও মমতা ছিল। এ জন্য তিনি লর্ড ওয়েলেস্‌লির প্রতিষ্ঠিত নিয়ম সর্ব্বাংশে রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে, গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের সংবাদপত্র সকল দমনে রাখাই ভাল। হেষ্টিংস চলিয়া গেলে ১৮২৩ অব্দে, জন আডাম কিছু কালের জন্য, ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরল হইলেন। সুতরাং নিজের বিশ্বাস অনুসারে কাজ করিতে তাঁহার কোন রূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল না। অবিলম্বে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আবার সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র উত্তোলিত হইল। আডাম এত কাল বৃথা যাহার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন, বৃথা যাহার জন্য গবর্ণর-জেনেরলকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, বৃথা যাহার জন্য নানা রূপ মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, এখন স্বয়ং তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলেন। অকস্মাৎ উত্তোলিত অস্ত্র লক্ষ্যে পতিত হইল, কলিকাতা জর্ণালের সম্পাদক বাকিংহাম সাহেব ভারতবর্ষ হইতে নিষ্কাশিত হইলেন। তাঁহার সৌভাগ্য চিরকালের মত নষ্ট হইয়া গেল, এবং তিনি কয়েক বৎসর কাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও পার্লিয়ামেণ্ট মহা-সভার হাড় জ্বালাতন করিয়া তুলিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের এই-রূপ যথেচ্ছাচার ও অত্যাচারেও ভারতবর্ষের সংবাদপত্র সকল একবারে নীরবে রহিল না। লোকে যখন জানিতে পারিল যে, গবর্ণরজেনেরল লেখনীর এক আঘাতে একজন ইংরেজ সম্পাদককে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া ইঙ্গ্‌লণ্ডে পাঠাইতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় সম্পাদক-দিগকে নিষ্কাশিত করিতে পারেন না; কারণ ভারতবর্ষীয়দিগের আদি বাসস্থানই ভারতবর্ষ, সুতরাং গবর্ণরজেনেরলের নিয়ম তাঁহাদের নিকট পরাস্ত হয়; তখন ডিসোজা অথবা ডিরোজরিওর ন্যায় কোন ফিরিঙ্গি-শ্রেষ্ঠের নামে বিরক্তিকর সংবাদপত্র সকল চলিতে লাগিল। কিন্তু

আডাম সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিবার জন্য কঠোর নিয়ম প্রস্তুত করিতে ক্ষান্ত থাকিলেন না। ১৮২৩ অব্দের ১৪ই মার্চ্চ * ও ৫ই এপ্রেল এই সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল। এই আইনে সংবাদপত্র সকল পদার্থ-শূন্য হইল এবং তাহাদের জীবনী-শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল॥

লর্ড আমহর্ষ্ট বোধ হয়, আডামের এই কঠোর বিধির পরিপোষক ছিলেন না, এবং এই অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিও বোধ হয় তাঁহার ততটা অনুরাগ বা আস্থা ছিল না। কিন্তু আডামের আইন অল্প সময়ের মধ্যে, প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীতে প্রত্যেক শাসন-সংক্রান্ত কর্ম্মচারীর অনুমোদিত হইয়াছিল, সুতরাং আমহর্ষ্ট প্রথমে এদেশে আসিয়া, বাধ্য হইয়া, এই আইন অনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সংবাদপত্রের প্রতি যে অত্যাচারের সূত্র-পাত হইয়াছিল, তাহা কিছু কাল অটল হইয়া রহিল। পরে আমহর্ষ্ট যথন সূক্ষ্ম রূপে বিচার করিতে লাগিলেন, তথন তিনি এই অত্যাচারের নিতান্ত বিরোধী হইয়া উঠিলেন। এই জন্য স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের সম্বন্ধে যে সমস্ত বাধা ছিল, তাহা আবার ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। আমহর্ষ্টের রাজ্য-শাসনের শেষ দুই বৎসর কোনরূপ গোলযোগের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিল না; মুদ্রাযন্ত্রের সম্বন্ধে

* ১৮২৩ অব্দের ১৪ই মার্চ্চ জন আডাম কর্ত্তৃক মুদ্রাযন্ত্রের শাসন-সম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রণীত হয়, আর ১৮৭৮ অব্দের ১৪ই মার্চ্চ গবর্ণরজেনেরল লর্ড লীটন দেশীয় সংবাদ-পত্রাদির স্বাধীনতা হরণ করেন। প্রথম ১৪ মার্চ্চের ব্যবস্থা ইঙ্গরেজী, বাঙ্গালা প্রভৃতি বিট্রীষাধিকৃত ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষার সংবাদপত্রের জন্য নিরূপিত হয়, আর শেষ ১৪ই মার্চ্চের ব্যবস্থা কেবল দেশীয় সংবাদপত্রাদির জন্য বিধিবদ্ধ হইয়া উঠে। প্রথম ১৪ই মার্চ্চের ব্যবস্থা অপেক্ষা শেষ ১৪ই মার্চ্চের ব্যবস্থা অধিক কঠোর, অধিক তীব্র ও অধিক অবনতি-কর। ১৮২৩ অব্দের ১৪ই মার্চ্চের ব্যবস্থার সহিত ১৮৭৮ অব্দের ১৪ই মার্চের ব্যবস্থার এইরূপ প্রভেদ। জন আডাম যাহা করিতে পারেন নাই, লর্ড লীটন অবলীলায় তাহা সম্পন্ন করেন।

সমস্ত অত্যাচার তিরোহিত হইল, এবং সংবাদপত্র সকল শান্ত ভাবে ও নীরবে আপনাদের কার্য্য সাধন করিতে লাগিল।

ইহার পর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ ভারতবর্ষের গবর্ণরজেনেরল হইয়া আসিলেন। উদারতা তাঁহার হৃদয়ে নিয়ত বিরাজ করিত। তিনি এখানে আসিয়াই সংবাদপত্র সকলকে হৃদয়ঙ্গম বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন। বেণ্টিঙ্ক্ সংবাদপত্র হইতে কোন রূপ আশঙ্কা করিতেন না, প্রত্যুত উহাকে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য-কারী সুহৃদ্ বলিয়া জ্ঞান করিতেন; তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছেন, "ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর থাকিয়া, আমি সংবাদপত্র হইতে যত বিষয় জানিতে পারিয়াছি, এত আর কিছুতেই নহে।" অথচ কেহই এই বেণ্টিঙ্কের ন্যায় সংবাদপত্রে অধিক তিরস্কৃত বা অধিক নিন্দিত হন নাই।

এক সময় বেণ্টিঙ্ক্‌কে একটী অসন্তোষকর কার্য্যে হাত দিতে হয়। বিলাতের ডিরেক্টর সভা, সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের বাটা কমাইবার প্রস্তাব করেন। বেণ্টিঙ্ক্ এই প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হন। ইহাতে চারিদিকে মহা গোলযোগ বাধিয়া যায়। সংবাদ-পত্রের সম্পাদকের স্তম্ভে, পত্র-প্রেরকের স্তম্ভে নানা প্রকার কুৎসা-পূর্ণ প্রবন্ধ ও পত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। কিন্তু বেণ্টিঙ্ক ইহাতে কিছু মাত্র দৃক্‌পাত করেন নাই, কিংবা বিরক্ত হইয়া, সংবাদপত্রে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের কোন রূপ বিঘ্ন জন্মান নাই। ক্রমে এই বাটার সম্বন্ধে সাধারণের যে বিরাগ ছিল, তাহা কটুতর প্রবন্ধাদি লিখিতে লিখিতেই শেষ হইয়া যায়। সংবাদপত্র অসন্তোষ নিবারণের একটী প্রধান উপায়। কোন বিষয়ে অসন্তোষ জন্মিলে, সাধারণে সংবাদপত্রে আপ-নাদের মতামত প্রকাশ করিয়া, সেই অসন্তোষের অনেক লাঘব করিয়া থাকে। সুতরাং হৃদয় যে অসন্তোষে পূর্ণ থাকে, কালীর সহিতই ক্রমে তাহা বাহির হইয়া, হৃদয়কে শান্ত ও সন্তুষ্ট করিয়া তুলে। এই অস-ন্তোষ আর সবেগে বা সতেজে প্রকাশ পাইয়া, কোন রূপ হাঙ্গামার কারণ হয় না। এই জন্য সংবাদপত্রের স্তম্ভে কোনরূপ অসন্তোষকর

লেখা দেখিলেই, একবারে এক আঘাতে সমস্ত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নষ্ট করা অবিবেচনার কাজ। বেণ্টিঙ্ক নীরবে ধীরভাবে সংবাদপত্রের কার্য্য দেখিতে লাগিলেন, নীরবে ধীরভাবে তাহার মতামত শুনিতে লাগিলেন, এবং নীরবে ধীরভাবে আপনার কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি অডামের ন্যায় কোন রূপ কঠোর-বিধি অবলম্বন করিয়া স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের ব্যাঘাত জন্মাইলেন না। ইহার পর ১৮৩০ অব্দে যখন বিলাতের ডিরেক্টর সভার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আসিয়া পহুঁছিল, সভা যখন অর্দ্ধ বাটার বিরুদ্ধে সমস্ত আপিল রহিত করিয়া, আপনাদের রায় বহাল রাখিলেন এবং সাধারণকে জানাইবার নিমিত্ত যখন এই সমস্ত কাগজপত্র প্রকাশ করিবার সময় হইল, তখন বেণ্টিঙ্ক একটী গভীর ভাবনায় নিমগ্ন হইলেন। এই সমস্ত কাগজ প্রকাশিত হইলে সংবাদপত্র সকল পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলবেগে গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিবে, এবং ডিরেক্টরদিগের সভাকে সাধারণের নিকট অপদস্থ ও অসম্মানিত করিয়া তুলিবে; সুতরাং সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা উচিত কি না, বেণ্টিঙ্ক তাহা ভাবিতে লাগিলেন। অনেক ভাবনা ও চিন্তার পর শেষ সিদ্ধান্ত স্থির হইল। বেণ্টিঙ্ক আডামের ন্যায় সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

এই সময়ে স্যার চার্লস্ মেটকাফ্ ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মেটকাফ্ তাঁহার একজন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "আমি যদি রাজ্যের অধিপতি, প্রভু বা কর্ত্তা হই, তাহাহইলে নিশ্চয়ই সংবাদপত্র সমুদয়কে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দিব।" এক্ষণে সেই পাঁচ বৎসরের সিদ্ধান্ত মেটকাফের হৃদয় হইতে দূর হইল না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হইবে জানিয়া, মেটকাফ্ স্থির থাকিতে পারিলেন না তিনি বেণ্টিঙ্কের মতের বিরুদ্ধে, নিম্নলিখিত ভাবে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন:—

"সৈনিক কর্ম্মচারিগণ ডিরেক্টর সভায় অর্দ্ধ বাটার সম্বন্ধে যে

আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন, সেই বিষয়ে উক্ত সভার সমুদয় কাগজপত্র প্রকাশ করার সময়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, আমি নিতান্ত দুঃখিত হইলাম।

'আমার বিবেচনায় ইহাতে সাধারণের মনে একটী নূতন বিরাগ উপস্থিত হইবে। এরূপ বিরাগ উপস্থিত করা নিতান্ত অনাবশ্যক।

'অনেক দিন হইতে সাধারণকে গবর্ণমেণ্টের সমুদয় বিষয়ই সমালোচনা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে ডিরেক্টরদিগের পূর্ব্বকার আদেশ হইতে এক্ষণকার আদেশে এমন কিছুই প্রভেদ দেখিতে পাইলাম না যে, প্রথমটীতে যেমন আন্দোলন করিতে দেওয়া হইয়াছে, অপরটীতে তেমন দেওয়া হইতে পারে না।

'আমার মতে অর্দ্ধ বাটার সম্বন্ধে যে আন্দোলন করিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহার ফল ভালই হইয়াছে। তাহাতে একটী নিতান্ত অসন্তোষকর কার্য্যের উপর সাধারণের মত প্রকাশ পাইয়াছে, এবং যাহারা ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহারা মনে মনে ইহাই বুঝিয়াছে যে, তাহাদের অসন্তোষের কারণ সকলেই জানিতে পারিয়াছে। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ হইতে এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইবে।

'আমার বিবেচনায় অন্য একটী নূতন অসন্তোষের সূত্রপাত করা অপেক্ষা যাহার যে মত তাহা প্রকাশ করিতে দেওয়াই উচিত।

'উপস্থিত বিষয়ে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, আমার মতে তাহা অপেক্ষা আর অধিক কিছু ক্ষতি-কারক প্রকাশিত হইতে পারে না। সৈনিকদিগের মধ্যে যে অসন্তোষ দেখা গিয়াছিল, এক্ষণে তাহার হ্রাস হইয়াছে। তাহাদের অভিযোগ শুনা হইয়াছে, তাহাদের যুক্তি ক্ষয় হইয়াছে, এবং তাহাদের মূল বিষয় পুরাতন হইয়া গিয়াছে। ডিরেক্টরগণ যে এরূপ আদেশ দিবেন, তাহা বোধ হয় সকলেই জানিত। এক্ষণে ঐ আদেশপত্র প্রচার করিলে সংবাদপত্রে যে সকল পত্র বাহির হইবে, তাহাতে যে কোন ক্ষতি হইবে, এমন বোধ হয় না। কিন্তু

এবিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে না দিলে আর একটী নূতন অসন্তোষ উপস্থিত হইবে, এবং একটী নূতন অভিযোগ বর্ত্তমান থাকিবে।

* * * * *

'অপকার অপেক্ষা উপকারের পরিমাণ অধিক দেখিয়া, আমি সর্ব্বদাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অনুমোদন করিয়া আসিয়াছি, এবং এক্ষণেও উহার অনুমোদন করিতেছি।

'আমি স্বীকার করি, প্রজাগণের অন্যান্য স্বাধীনতার ন্যায় মুদ্রণ-স্বাধীনতাতেও সময়-বিশেষে হস্তক্ষেপ করা উচিত। কিন্তু উপস্থিত বিষয়ে ওরূপ হাত দেওয়া আমার মতে উচিত বোধ হয় না। যখন দুই দিকেই গবর্ণমেণ্টের বিপদের সম্ভাবনা, তখন স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করিতে দেওয়া অপেক্ষা না দেওয়াতেই অধিকতর বিপদ ঘটিতে পারে; যেহেতু, স্বাধীনতার স্রোত প্রবাহিত থাকিলে দূষিত পদার্থ গুলি সহজেই নির্গত হইয়া যায়। সাধারণের চিন্তা ও সমবেদনার গতি রোধ করা অসম্ভব। আমার বিবেচনায় সাধারণের অসন্তোষ সংবাদপত্রে প্রকাশ করিতে দেওয়াই উচিত, না দিলে, ঐ অসন্তোষ একরূপ স্থায়ী হইয়া উঠে, এবং সময়বিশেষে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

'মুদ্রণ-স্বাধীনতায় যে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করেন, মুদ্রাযন্ত্র হইতে যাহা বাহির হয়, তাহার জন্য সেই গবর্ণমেণ্টই দায়ী থাকেন। কলিকাতার সংবাদপত্র-সমূহে রাজপুরুষদের অনেক নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহাদের কেহ এই বিষয়ে অভিযোগ করাতে তাঁহাকে আমরা এই ভাবে উত্তর দিয়াছি যে, গবর্ণমেণ্ট সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। ভারতবর্ষের কোন বিদেশীয় অধিকারের শাসন-কর্ত্তাকে পত্র লিখিবার সময়েও বোধ হয়, আমরা এই ভাব প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে আমরা কি প্রকারে, এক সময়ে এই রূপ বলিয়া অন্য সময়ে মুদ্রণ-স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মাইব?"

এই লিপির ভাষা প্রাঞ্জল, ভাব সরল এবং যুক্তি সুশৃঙ্খল। পাঁচ

বৎসর পূর্ব্বে যে তেজস্বিনী লেখনী হইতে যে সরল ভাবে যে সরল ভাষা নির্গত হইয়াছিল, পাঁচ বৎসর পরেও সেই তেজস্বিনী লেখনী হইতে সেই সরল ভাবে সেই সরল ভাষা নির্গত হইল—"আমি সর্ব্বদাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অনুমোদন করিয়া আসিয়াছি, এবং এক্ষণেও উহার অনুমোদন করিতেছি।"

মেটকাফ্ বিশেষ দক্ষতার সহিত আপনার এই উদার ও সরল মত রক্ষা করিয়া আসিতে লাগিলেন। ১৮৩২ অব্দের বসন্ত কালে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি সভাপতি হন। এই সময়ে কলিকাতার একখানি সংবাদপত্র বোম্বাইর গবর্ণরের কোপ-দৃষ্টিতে পড়ে। গবর্ণর এজন্য সেই কাগজের সম্পাদককে বল পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করাইতে নচেৎ তাঁহার সম্পাদিত পত্রের স্বাধীনতা লোপ করিতে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের নিকট এক খানি পত্র লিখেন। সার চার্লস মেটকাফ্ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টর অধ্যক্ষ থাকাতে এই পত্রের একখানি প্রতিলিপি তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। সুতরাং বোম্বাই গবর্ণরের প্রার্থনা-পূরণের ভার মেট্‌কাফের উপরেই পড়ে। কিন্তু মেটকাফ্ এতদিন যে মত পোষণ করিয়া আসিতে ছিলেন, সে মত পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার হৃদয় কোন রূপ কাতরোক্তিতে কোনরূপ বিনয়-বাক্যে অবনত হইয়া পড়িল না, বোম্বাইর গবর্ণরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল। মেট্‌কাফ্ অটল পর্ব্বতের ন্যায় অটল হইয়া রহিলেন।

ইহার পরেও দুই বৎসর কাল, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারত-বর্ষের গবর্ণরজেনেরলের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এ সময়েও সংবাদ-পত্র সকল স্বাধীন ভাবে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে থাকে। কোন রূপ নূতন আইন বিধিবদ্ধ হইয়া এই স্বাধীনতার ব্যাঘাত জন্মায় নাই। মন্ত্রিসভা আডামের প্রবর্ত্তিত আইন রদ করিবার জন্য তখন কতিপয় নিয়ম প্রস্তুত করিবার আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। যাহাহউক, এই সময়ে

কলিকাতার লোকে মুদ্রাযন্ত্রের সুব্যবস্থা করিতে বিশেষ উৎসুক হন, এবং ১৮৩৪-৩৫ অব্দের শীতকালে যখন স্যার চার্লস মেটকাফ্ এলাহাবাদে যাত্রা করেন, তখন সকলে, জন আডাম মুদ্রাযন্ত্রের সম্বন্ধে যে সমস্ত আইন করিয়া গিয়াছেন, তাহা রদ করিবার জন্য গবর্ণরজেনেরলের নিকট এক খানি আবেদন সমর্পণ করেন। ১৮৩৫ অব্দের ২৭ জানুয়ারি এই আবেদন গবর্ণরজেনেরলের নিকট পহুঁছে। গবর্ণরজেনেরল আবেদনকারিদিগকে উত্তর দেন, "মুদ্রা-যন্ত্রের সম্বন্ধে পূর্ব্বকার অসন্তোষ-কর আইন মন্ত্রিসভার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। গবর্ণরজেনেরলের বিশ্বাস এই যে, অল্প সময়ের মধ্যেই এ বিষয়ে একটী স্বতন্ত্র নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে সকলেই গম্ভীর ভাবে সাধারণ বিষয়ে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবেন, এবং তাহা সকল রকম অন্যায় দোষারোপ ও বিদ্রোহ-সূচক ভাব হইতে গবর্ণমেণ্ট্‌কে রক্ষা করিবে।" কিন্তু এই "অল্প সময়ের মধ্যে"ই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ স্বদেশে যাত্রা করেন, এবং স্যার চার্লস মেট্‌কাফ্ তাঁহার স্থলে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের অধ্যক্ষ হন।

মেট্‌কাফ্ এক্ষণে "অধিপতি, প্রভু ও কর্ত্তা" হইলেন। সুতরাং এত কাল তিনি যে সুযোগ দেখিতেছিলেন, তাহা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। মেট্‌কাফ্ কাল বিলম্ব করিলেন না। লেখক-চূড়ামণি মেকলে এই সময়ে মন্ত্রিসভার সভ্য ছিলেন, তিনিও মেট্‌কাফের মতের অনুমোদন করিলেন। সুসময় সম্মুখবর্ত্তী হইল, অধিপতি প্রভু ও কর্ত্তা প্রস্তুত হইলেন। এপ্রেল মাসে মুদ্রাযন্ত্রের সম্বন্ধে আইন লিপি-বদ্ধ ও প্রকাশিত হইল। ১৮২৩ অব্দে বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীতে এবং ১৮২৫ ও ১৮২৭ অব্দে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে মুদ্রাযন্ত্রের সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম করা হয়, তাহা এই আইনে রদ হইয়া গেল। এই আইনের স্থূল মর্ম্ম এইঃ—ব্রিটীষ রাজ্যে যে সমস্ত সংবাদপত্র আছে বা হইবে, তাহার মুদ্রাকর ও প্রকাশকদিগকে, যে যে বিভাগে ঐ সমস্ত সংবাদপত্র বাহির হইবে, সেই সেই বিভাগের মাজিষ্ট্রেটের

নিকট উপস্থিত হইয়া, আপনাদের নাম, ধাম প্রকাশ করিতে হইবে। এই অবধি সমস্ত মুদ্রিত পুস্তক, পত্রিকা ও কাগজাদিতেই মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম থাকিবে। যাহার মুদ্রাযন্ত্র থাকিবে তাহাকেই যথানিয়মে এ বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। যে এই আইনের কোন ধারার বিরুদ্ধে কাজ করিবে, তাহারা জরিমানা ও কারাবাস-দণ্ড পাইবে। সংবাদপত্রাদির প্রকাশক ও মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারীর নাম ধাম প্রকাশ করা ব্যতীত নূতন আইন মুদ্রণ-স্বাধীনতায় অন্য কোন রূপে হস্তক্ষেপ করিবে না।

প্রস্তাবিত আইন প্রচলিত হওয়াতে এই একটী মহৎ ফল হইল যে, যিনি যাহা কিছু ছাপাইবেন, সে বিষয়ের দায়িত্ব তাঁহারই রহিল; অর্থাৎ একজনেই মুদ্রণ-সংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ের দায়ী না হইয়া সকলেই আপন আপন বিষয়ের জন্য দায়ী রহিলেন; সুতরাং সকলেই আপনার দায়িত্ব বুঝিয়া পুস্তক ও সংবাদপত্রাদিতে স্বাধীন ভাবে আপন আপন মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

এই আইন সকলেরই বিশেষ সন্তোষ জন্মাইল, সকলেই এই আইনে সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল হইয়া মেট্‌কাফের নিকট আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতে অগ্রসর হইল। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ভারতবর্ষীয় ও ইউ-রোপীয় সকলেই এই উপলক্ষে একটী প্রকাশ্য সভায় সমবেত হই-লেন। বিশেষ যত্ন ও বিশেষ মনোযোগের সহিত একখানি অভি-নন্দন-পত্র প্রস্তুত হইল। সকলেই একমত হইয়া এই পত্র মুদ্রণ-স্বাধীনতা-দাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মেট্‌কাফ্ এই অভিনন্দন-পত্র পাইয়া, কোন আড়ম্বর করিলেন না, তিনি ধীরতা, উদারতা ও যুক্তির সহিত অভিনন্দন-পত্রের উত্তর দিলেন। অতিবিস্তৃতিপ্রযুক্ত আমরা এই উত্তরের সমুদয় অংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। আব-শ্যক বোধে এক অংশ মাত্র এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যাঁহারা ভারতবর্ষকে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিতে সম্মত, তাঁহাদের মতের সম্বন্ধে মেট্‌-কাফ্ এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেনঃ—

"তাঁহারা যদি বলেন, ভারতবর্ষীয়েরা জ্ঞানলাভ করিলে আমাদের রাজত্ব নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইলে আমি তাঁহাদিগকে ইহাই বলিতে চাই যে, পরিণামে যাহাই হউক না কেন, ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ভারতবর্ষকে ব্রিটীষ সম্রাজ্যের একটী স্থায়ী অংশ করিতে হইলেই যদি ইহার অধিবাসীদিগকে অজ্ঞানাবস্থায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের রাজত্ব ভারতবর্ষের পক্ষে অভিসম্পাত হইবে। এরূপ রাজত্বের শেষ হওয়াই উচিত।

'কিন্তু আমি অজ্ঞানাবস্থাতেই অধিক ভয়ের কারণ দেখিতে পাই। ভারতবর্ষীয়েরা জ্ঞান লাভ করিলে আমাদের রাজত্ব আরও দৃঢ় হইবে, কুসংস্কার দূর হইবে, পরস্পরের শত্রুতা বিনষ্ট হইবে, এবং আমাদের শাসনের উপকারিতা সকলেই বুঝিতে পারিবে। অধিকন্তু ইহাতে ভারতবাসী ও ইঙ্গরেজ সকলেই পরস্পর নিকটতম সম্বন্ধে আবদ্ধ হইবে, এবং পরস্পরের মধ্যে যে অনৈক্য আছে, তাহার হ্রাস হইয়া যাইবে। ভারতের ভবিষ্যৎ রাজত্ব-সম্বন্ধে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহাই হউক না কেন, যত দিন শাসন-কার্য্য আমাদের হস্তে ন্যস্ত আছে, তত দিন প্রজাদের মঙ্গল সাধন করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানোন্নতি করাই এই কর্ত্তব্য কর্ম্মের সার অংশ এবং মুদ্রণ-স্বাধীনতা-দানই কর্ত্তব্য কর্ম্মের সার অংশ সম্পাদনের প্রধান উপায়। কেবল রাজস্ব আদায় করিতে, সেই রাজস্ব আদায়ের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে, এবং যখন অনাটন পড়িবে, তখনই ধার করিতে, ভারতবর্ষে আমাদের থাকা, কখনই জগদীশ্বরের অনুমোদিত হইতে পারে না। আমরা ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কার্য্যসাধনের জন্য এখানে রহিয়াছি। ভারত-ক্ষেত্রে ইউরোপের জ্ঞান ও সভ্যতা, বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রচার করা এবং তদ্দ্বারা প্রজাদের অবস্থার উন্নতি করাই এই উচ্চতর কার্য্যের একটী। মুদ্রন-স্বাধীনতা থাকিলে যেমন এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, তেমন আর কিছুতেই নহে।"

এই রূপ উদার মত পোষণ করিয়া স্যার চার্লস্ মেটকাফ্ সংবাদ-পত্র সমুদয়কে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে দেন। বসন্তকালে এই স্বাধীনতার পক্ষে নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়, এবং শরৎকালে তদনুসারে কার্য্য হইতে থাকে। মুদ্রণ-স্বাধীনতা, ১৮৩৫ অব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর হইতে আরম্ভ হয়। ভারতের ইতিহাসে ইহা একটী প্রধান দিন, এবং ভারতে ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্টের উচ্চতর কার্য্য-সাধনের ইহা একটী প্রধান সাক্ষী। কলিকাতা-বাসিগণ এই প্রধান ঘটনার সাক্ষীভূত প্রধান দিনের কোন স্মরণ-চিহ্ন স্থাপনের জন্য উদ্যত হইলেন। অবিলম্বে চাঁদা করিয়া অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল, এবং সংগৃহীত অর্থে ভাগীরথীর তীরে একটী সুপ্রশস্ত সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। সাধারণের ব্যবহারার্থ ইহাতে একটী পুস্তকালয় করা গেল। মেটকাফের প্রস্তরময়ী অর্দ্ধ প্রতিমূর্ত্তি এই পুস্তকালয় শোভিত করিল; "১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বরে স্যার চার্লস মেটকাফ্ মুদ্রণ-স্বাধীনতা দিয়াছেন," এই মর্ম্মে একখানি খোদিত লিপি এই সাধারণ পুস্তকালয়ে রহিল, এবং মেটকাফের চিরস্মরণীয় নামে এই অট্টালিকার নাম "মেটকাফ্ হল" হইল। এক্ষণে এই মেটকাফ্ হলের প্রবেশ-পথে স্যার চার্লস মেটকাফের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে, এবং এক্ষণে মেটকাফ্ হলের অনন্ত পুস্তক ও পত্রিকারাশি সাধারণের মধ্যে জ্ঞানালোক প্রসারিত করিয়া, স্যার চার্লস্ মেটকাফের অনন্ত কীর্ত্তি উজ্জ্বলতর করিতেছে।

এই রূপে বহু বিতর্ক ও বহু চেষ্টার পর ভারতে মুদ্রণ-স্বাধীনতা স্থাপিত হইল; এই রূপে বহু কাল বহু নিগ্রহ সহ্য করিয়া, সংবাদ-পত্র-সমূহ স্বাধীন ভাবে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে লাগিল। এই স্বাধীনতা ব্রিটীষ অধিকারস্থ বাঙ্গালা, ইঙ্গরেজী প্রভৃতি সমুদয় ভাষার সমুদয় পুস্তক ও পত্রিকার উপরই প্রবর্ত্তিত হয়। মুদ্রণ-স্বাধীনতায় আমাদের দেশের অনেক উপকার হইয়াছে। ইহাতে সংবাদপত্র সকল ক্রমেই পরিপুষ্ট ও উন্নত হইয়া সমাজের প্রকৃত

মঙ্গল সাধন করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার যে এতদূর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের যে এতদূর উন্নতি হইতেছে, মুদ্রণ-স্বাধীনতাই তাহার প্রধানতম কারণ। মুদ্রণ-স্বাধীনতা না থাকিলে, সংবাদপত্রসমূহকে অনেক সময়ে নীরবে ও নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিতে হইত। ইহা কখনও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিয়া সমাজের উপকার কি গবর্ণমেণ্টের মনোযোগের আকর্ষণ করিতে পারিত না।

এই জন্য পরিণামদর্শী বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই মুদ্রণ-স্বাধীনতায় কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না, অথবা স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মান না। ১৮৩৫ অব্দে স্যার চার্লস মেটকাফ যে স্বাধীনতার সূত্রপাত করেন, তাহা দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতে থাকে। মধ্যে সিপাহি-যুদ্ধের সময়ে লর্ড ক্যানিং কিছুকাল সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ রাখেন। সেই সঙ্কটাপন্ন সময়ে—যখন ব্রিটীষ-শাসনের মূল ভিত্তি কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, অনন্ত-প্রবাহ শোণিত-স্রোতে ভারতবর্ষ প্লাবিত হইয়াছিল, আতঙ্ক, ভয় সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছিল—সেই বিঘ্ন বিপত্তির অন্ধকারময় ভীষণ কালে ধীর-প্রকৃতি ও উদারমতি লর্ড ক্যানিং রাজশক্তি নিরাপদ ও রাজনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য একবৎসর কাল সংবাদপত্র সমুদয়কে একটী বিশেষ আইনের অধীনে রাখেন। ইহার পর ১৮৭৭ অব্দ পর্য্যন্ত আর কোন রূপ আইন বিধিবদ্ধ হইয়া, সংবাদপত্র সমুদয়কে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে নাই।

১৮৭৮ অব্দে এই চিরবাঞ্ছনীয় মুদ্রণ-স্বাধীনতার গতিরোধ হয়। এই সময়ে লর্ড লীটন গবর্ণরজেনেরলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। উক্ত অব্দের ১৪ই মার্চ্চ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশনেই যে মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা বিধি বদ্ধ হয়, তাহা ১৮৭৮ অব্দের ৯ আইন নামে প্রসিদ্ধ। জন আডাম যেরূপ বাঙ্গালা, ইঙ্গরেজী প্রভৃতি ব্রিটীষ কোম্পানীর অধিকারস্থ সকল ভাষার সংবাদপত্রের জন্যই কঠোর বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, লর্ড লীটনের প্রবর্ত্তিত ৯ আইন

সে রূপ সমুদয় ভাষার উপর আধিপত্য স্থাপন করে নাই। ইহা রাজ-ভাষা ইঙ্গরেজীকে বাদ দিয়া বাঙ্গালা, হিন্দি, প্রভৃতি ব্রিটীষ ভারত-বর্ষের অন্যান্য ভাষার নিয়ামক হইয়াছিল, অর্থাৎ ইঙ্গরেজীতে যাহা লিখিত হইত, তাহার উপর এই আইন প্রবর্ত্তিত হইত না; বাঙ্গালা প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় ভাষায় যাহা লিখিত হইত, তাহার উপরই এই আইন আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিত। এই ৯ আইনের মর্ম্ম এই—

"ব্রিটীষ ভারতবর্ষে ভারতবর্ষীয় ভাষার কোন সংবাদপত্র পুস্তক বা কাগজাদিতে, গবর্ণমেণ্টের প্রতি সাধারণের অভক্তি জন্মাইবার, সাধারণ শান্তি নষ্ট করিবার কিংবা গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারীর কোন কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত কোন কথা, দৃশ্য বা ছবি থাকিলে যে ছাপাখানায় ঐ সংবাদপত্র, পুস্তক ও কাগজাদি ছাপা হয়, তাহার সমস্ত সরঞ্জাম গবর্ণমেণ্টের পক্ষে জব্দ হইবে। সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্রের মুদ্রাকর (প্রিণ্টর) ও প্রকাশককে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কিংবা রাজধানীর পুলিষ কমিশনরের নিকট উপস্থিত হইয়া, নিয়মিত টাকা গচ্ছিত রাখিয়া, এক একখানি প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে। ঐ সকল সংবাদপত্রের কোন খানিতে রাজ-ভক্তির বিরুদ্ধে, সাধারণ শান্তির বিরুদ্ধে অথবা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম-চারিগণের শাসন-কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন কথা লেখা হইলে, সেই সংবাদপত্রের মুদ্রাকর (প্রিণ্টর) ও প্রকাশক, জেলার ম্যাজি-ষ্ট্রেট অথবা পুলিষের কমিশনরের নিকট যে টাকা গচ্ছিত রাখি-য়াছেন, তাহা বাজেয়াপ্ত হইবে।"

এই আইন আমাদের উপর একটী গভীর কলঙ্কের আরোপ করিয়াছিল। সুখ ও শান্তির মঙ্গলময় রাজ্যে, সন্তোষ ও সমৃদ্ধির সুধাময় শাসনে লর্ড লীটনের গবর্ণমেণ্ট যখন ভারতবাসীর চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিয়া, এই আইন বিধিবদ্ধ করেন, তখন ইহাই বুঝা গিয়াছিল, ভারতবাসী রাজভক্তি-শূন্য, ভারতবাসী রাজার প্রতি অবিশ্বাসী

এবং ভারতবাসী সাধারণ শান্তির বিরোধী। এক শত বৎসরেরও অধিক কাল ব্রিটীষ শাসনের অসীম প্রতাপের আশ্রয়ে থাকিয়া, এবং ব্রিটীষ সভ্যতার ও ব্রিটীষ নীতির নিকট মস্তক অবনত রাখিয়া, ভারতবর্ষ রাজভক্তিশূন্য বলিয়া কলঙ্কিত হইয়াছিল, ভারতবর্ষ রাজার প্রতি অবিশ্বাসী বলিয়া দূষিত হইয়াছিল, হায়! ভারতবর্ষ সাধারণের নিকট আপনার রাজভক্তি সপ্রমাণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। যে জাতির আদি কাব্য রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, যে জাতির জ্ঞানকাণ্ড শান্তির মহিমা ঘোষণা করিয়াছে, যে জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র রাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, যে জাতি পিণ্ডারী-যুদ্ধের সময়ে উপাস্য দেবতার নিকট ভক্তিভাবে যোড় করে ব্রিটীষ রাজের বিজয়-প্রার্থনা করিয়াছে, প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময়ে তাঁহার আরোগ্য কামনা করিয়াছে, ডিউক্ অব্ এডেনবরা এবং প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের শুভাগমনে ভক্তির এক শেষ দেখাইয়াছে, এবং সে দিন ভারতের ললাটমণি বিক্টোরিয়ার 'ভারতের অধীশ্বরী' উপাধি-গ্রহণ-সময়ে একই উৎসব, একই আহ্লাদের স্রোতে হিমালয় হইতে কুমারিকা, সিন্ধু হইতে চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সমস্তই ভাসাইয়া দিয়াছে, সেই জাতি রাজভক্তি-শূন্য, সেই জাতি রাজার প্রতি অবিশ্বাসী! যে জাতি "নাড়িলেও নড়ে না, শত আঘাতে ও বেদনা বোধ করে না, শীত, গ্রীষ্ম, কিছুতেই স্পন্দিত হয় না, সেই জাতি সাধারণ শান্তির বিরোধী! হা জগদীশ্বর! ইহা অপেক্ষা মিথ্যা অপবাদ আর কি হইতে পারে? ইহা অপেক্ষা অনুচিত কলঙ্ক আর কি সম্ভবে? কে ভাবিয়াছিল "ভারতের দুঃখ-দগ্ধ হৃদয়ে" সহসা এমন অভূতপূর্ব্ব তীব্র কুঠারাঘাত হইবে? কে ভাবিয়াছিল এই গুণ-গ্রাহী সুসভ্য যুগে এমন অভাবনীয় ঘটনা ঘটিয়া নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ে পাপ ও কলঙ্কের মূর্ত্তি প্রতিফলিত করিবে?

কিন্তু এই অযোগ্য আইনের জন্য ভারতবর্ষকে দীর্ঘকাল মর্ম্মপীড়ায়

কাতর থাকিতে হয় নাই, দীর্ঘকাল ভারতের হৃদয়ে নিদারুণ তুষানল আপনার গতি প্রসারিত করে নাই। লর্ড লীটনের পর মহামতি লর্ড রিপন গবর্ণরজেনেরলের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার উদার নীতির গুণে এই আইন উঠিয়া যায়, ভারতে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় মুদ্রণ-স্বাধীনতা স্থাপিত হয়।

পরিশিষ্ট।

লর্ড লীটনের প্রবর্ত্তিত মুদ্রণ-শাসনী বিধির সম্বন্ধে ভারতবর্ষের ষ্টেট্ সেক্রেটরীর মন্ত্রি-সভার তদানীন্তন সদস্য স্যার এরস্কিন পেরি, স্যার উইলিয়ম মুইর, কর্ণেল ইয়ুল, মাদ্রাজের গবর্ণর ডিউক অব বাকিংহাম এবং ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য স্যার আর্থর হবহাউস্ যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ এই স্থলে প্রকাশিত হইল।

স্যার এরস্কিন্ পেরির মতের সারাংশ।

স্যার এরস্কিন্ পেরি মুদ্রণশাসনী ব্যবস্থা নিরতিশয় অবনতির চিহ্ন বলিয়া মনে করেন। তিনি কহেন, "আমরা পঞ্চাশ বৎসরকাল ভারতবর্ষে যে উদার নীতি অনুসারে চলিয়া আসিয়াছি, এই ব্যবস্থা সেই নীতির এত বিরোধী, এবং ইহা জাতিগত পার্থক্য দেখাইয়া ভারতবর্ষীয়দিগকে সম্ভবতঃ এত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে যে, এই ব্যবস্থা আমাদের আইনের পুস্তক হইতে একবারে তুলিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য।"

পেরি সাহেব ইহার পর কহিয়াছেনঃ—"ব্যবস্থাপক সভার কোন সভ্যই গত ১৪ই মার্চ্চ এমন কোন বিপদ দেখিতে পান নাই, যাহাতে এই আইন সভার এক অধিবেশনে এত তাড়াতাড়ি বিধিবদ্ধ হইতে পারে। ১৮ মাসকাল ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র সমূহে যাহা যাহা বাহির হইয়াছে, তাহারই কোন কোন অংশের অনুবাদ দেখিয়া এই আইন করা হইয়াছে। এই সকল অংশের বিদ্রোহসূচক ভাবে বিপদের আশঙ্কা করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন সংবাদপত্রই কোন আকস্মিক বিপদ ঘোষণা করে নাই। এমন একটী গুরুতর নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে, ব্যবস্থাপক সভার যে সমস্ত সভ্য গবর্ণমেণ্টের বেতন-ভোগী নহেন, তাঁহাদিগকে সমুদয় বিষয় বিশেষরূপে বিবে-

সার এরস্কিন্ পেরির মতের সারাংশ।

চনা করিবার অবসর দেওয়া উচিত ছিল। বিশেষতঃ ১৮৭৪ অব্দে লর্ড সালিসবারি যে অভিপ্রায় (ব্যবস্থাপক সভাকে সমস্ত প্রয়োজনীয় বিবরণ হোম গবর্ণমেণ্টে পাঠাইতে হইবে) প্রকাশ করেন, সেই অভিপ্রায় অনুসারেও কাজ করা উচিত ছিল। যেহেতু, মুদ্রণ-শাসন-সংক্রান্ত ব্যবস্থা ভারতবর্ষের অপেক্ষা ইউরোপের শাসন-প্রণালীর সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা-সূত্রে আবদ্ধ, এবং রাজপুরুষদের কার্য্যকলাপের স্বাধীনভাবে সমালোচন সম্বন্ধে কোনরূপ প্রতিষেধক নিয়ম করা উচিত কি না, অপক্ষপাতে তাহার বিচার করিতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা অপেক্ষা ইণ্ডিয়া কাউন্সিলই অধিকতর সমর্থ।

'যে দুইজন প্রধান কর্ম্মচারী ইঙ্গলণ্ডে রাজনীতি শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়েই এবিষয়ে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। ডিউক অব্ বাকিংহাম্ ও স্যার্ আর্থার হবহাউস্ উপস্থিত আইনের অনুমোদন করেন নাই।

'১৪ই মার্চ্চ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার যে অধিবেশন হয়, তাহাতে ষোল জন মেম্বর উপস্থিত থাকেন, তন্মধ্যে বার জন গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী, এবং একজন মাত্র ভারতবর্ষীয় ছিলেন, সুতরাং সেই সমুদয় সভ্যগণের সম্মতির কোনও গুরুত্ব নাই।"

'ফ্রান্সের দুই নেপোলিয়ান সংবাদপত্রের সম্বন্ধে যে আইন প্রচার করেন, এবং ১৮৭০ অব্দে আয়র্লণ্ডে যে আইন প্রচারিত হয়, তাহার সহিত উপস্থিত আইনের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু আয়র্লণ্ডের আইন অল্পদিনের জন্যই জারি হইয়াছিল, ১৮৭৪ অব্দে উহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। এই ভারতবর্ষীয় আইনে আয়র্লণ্ডের আইনের ন্যায় এমন কোন বিধি নাই, যদ্দ্বারা কর্ম্মচারিগণের অত্যাচার নিবারিত হইতে পারে। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সংবাদপত্রের উচ্ছেদের জন্য এই আইনের ন্যায় আর কোন দেশে কোন আইন প্রবর্ত্তিত হয় নাই।'

'যখন বর্ত্তমানে কোনরূপ আশঙ্কা নাই, তখন ভবিষ্যতের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা কখনই যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর-কাল যে নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে, তাহা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠাইয়া দিবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইয়াছি। ভারতবর্ষে মুদ্রণ-স্বাধীনতা স্থাপনের ন্যায় অন্য কোন বিষয়ই প্রধান প্রধান রাজনীতিজ্ঞ লোক কর্ত্তৃক বহু বিবেচনার পর স্থিরীকৃত হয় নাই। বর্ত্তমান ব্যবস্থার স্বপক্ষে যে সমুদয় যুক্তি দেখান হয়, ১৮৩৫ অব্দেও তাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে তাহা উপেক্ষিত হয়।

'মুদ্রণ-স্বাধীনতা দেওয়াতে এই ৩৫ বৎসরের মধ্যে অপকার অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উপকার হইয়াছে। যে আশঙ্কা করিয়া বর্ত্তমান আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, ১৮৩৫ অব্দেও সেই আশঙ্কা করা হইয়াছিল। উপস্থিত সময়ে সংবাদপত্র হইতে যদি কোন বিপদের আশঙ্কা করা যায়, তাহা হইলে স্যার চার্লস্ মেট্‌কাফ ও লর্ড মেকলে যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, আমিও তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছি। সিপাহি-যুদ্ধের সময় লর্ড ক্যানিংও এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার জন্য একটী স্থায়ী আইন বিধিবদ্ধ করা আমার সম্পূর্ণ অমত।

লর্ড লীটনের উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। তাঁহা দ্বারা যে কোন রূপ অযথা অত্যাচার হইবে, তাহা আমি মনে করি না। কিন্তু তাঁহার পরে কে গবর্ণরজেনেরল হইবেন, বলিতে পারি না। কোন গবর্ণরজেনেরল কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা পাইলে তিনি কি করিতে পারেন, তাহা আমি সবিশেষ জানি। এক সময় একজন গবর্ণরজেনেরল কোন একটি সামান্য বিষয়ের জন্য একজন মুদ্রাকর ও সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারীর তিন মাস কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন। এই সংবাদপত্র, "মর্ণিংক্রনিকল", এবং ইহার সম্পাদক, আমার পিতা।

'এই আইন কেবল ভারতবর্ষীয়দিগের অসন্তোষ-জনক নহে,

আমরা রাজ্য-শাসনের সম্বন্ধে যে উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছি, তাহারও সম্পূর্ণ বিরোধী। আমরা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যেরূপ অনভিজ্ঞ, তাহাতে ভারতবর্ষীয় স্বাধীন সংবাদপত্র হইতে অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

"আমরা পৃথিবীর মধ্যে একটী সর্ব্বপ্রধান নিয়মানুরক্ত জাতিকে শাসন করিতেছি, তথাপি নিত্য নিত্য নূতন নূতন আইন করিয়া তাহাদিগকে ক্রমাগত উত্তেজিত করিতে ক্ষান্ত থাকিতেছি না।"

স্যার উইলিয়ম মুইরের মতের সারাংশ।

ষ্টেট সেক্রেটরী ৯ আইনের অনুমোদন করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করেন; সার উইলিয়ম মুইর তাঁহার সহিত একমত হন নাই। মুইর সাহেব কহেন, "১৮৫৭ সালের ন্যায় কোন ঘোরতর বিপদের সময় কিছু কালের জন্য এইরূপ আইন জারি করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রগাঢ় শান্তি বিরাজ করিতেছে। ভারতবর্ষকে কথন এমন শান্ত ও সুনিয়মিত দেখা যায় নাই; নূতন নূতন কর ভার বহন করিয়াও ভারতবর্ষ কথন এমন বশবর্ত্তী রহে নাই। মধ্য এশিয়া সংক্রান্ত আন্দোলনে ভারতবর্ষ রুষিয়ার প্রতি ঘৃণাই প্রকাশ করিয়াছে, কাবুলের আমীরের প্রতি আমাদের অন্যায়াচরণেও ভারতবর্ষ আমীরের প্রতি সমবেদনা দেখায় নাই। দেশের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছিল। নির্ম্মল ও মেঘশূন্য আকাশ হইতে সংবাদপত্রের উপর অকস্মাৎ বজ্র পতিত হইয়া সকলকে চমকিত করিয়া তুলিল।"

মুইর সাহেবের মতে সংবাদপত্র হইতে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা করা অনেক দূরের কথা। তিনি কহেন, স্যার আসলি ইডেন প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান রাজপুরুষ দেশীয় সংবাদপত্রকে ক্ষমতাশূন্য বলিয়া

নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। যে সকল সংবাদপত্র অন্যায়রূপে গবর্ণমেণ্টের দোষ দেখায়, সমাজে যদি তাহাদের ক্ষমতা বা সম্মান না থাকে, তাহা হইলে হঠাৎ একটা কাল্পনিক আশঙ্কা করিয়া চল্লিশ বৎসরের পদ্ধতি উঠাইয়া দিবার প্রয়োজন কি ?

সংবাদপত্র কখন কখন অন্যায় ক্ষমতা লইতে চায়, এবং অসত্যকে সত্য বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করে। ইহার নিবারণ জন্য জামিন লওয়াই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সরঞ্জম জব্দ করা, ও মুদ্রাযন্ত্র বন্ধ করার ক্ষমতা কখনও স্বেচ্ছাচারী মাজিষ্ট্রেটের হস্তে রাখা উচিত নহে। এ ক্ষমতা স্বাধীন বিচারকের হাতেই রাখা বিধেয়। গবর্ণমেণ্টের নিজের বিষয়ে নিজেরই বিচারক হওয়ার কোনও হেতুবাদ দেখা যায় না।

"জ্ঞান ও উন্নতির উৎকর্ষ সাধন করা, যুক্তিযুক্ত সাধারণ মত

---

* কল্‌বিন সাহেব উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের দেশীয় সংবাদপত্রের সম্বন্ধে কহেনঃ—

"এ প্রদেশের (উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের) ন্যায় কোথাও সংবাদপত্র এত স্বাধীন ভাব গ্রহণ করে নাই। কোন কোন পত্র এক্ষণকার গবর্ণমেণ্টের উপর ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মাইবার জন্য, পরস্পরের মধ্যে অনৈক্যের স্থাপন জন্য, এবং সাধারণ ও সামান্য ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাহাদের এই কুঅভিসন্ধি সিদ্ধ হইতেছে না, কারণ এ প্রদেশে সংবাদপত্র-পাঠকের সংখ্যা আজও অতি অল্প রহিয়াছে।"

স্যার উইলিয়ম মুইর এ সম্বন্ধে এই মত প্রকাশ করিয়াছেনঃ—"আমি যখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেপ্‌টেনেণ্টগবর্ণর ছিলাম, তখন ঐ সকল সংবাদপত্র পড়িয়া আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তাহার সহিত এই মতের সম্পূর্ণ অনৈক্য দেখা যায়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের শাসনসংক্রান্ত রিপোর্ট ইহার সাক্ষী। আমি ১৮৭১ সালের রিপোর্টের এক স্থল উদ্ধৃত করিতেছিঃ—"এই সকল সংবাদপত্র পড়িয়া যে পরিমাণে লোকের মানসিক উন্নতি হইতেছে তাহা কম নহে। দেশীয় সংবাদপত্রের একটি নিয়ম এই যে তাহারা সুরুচির বিরুদ্ধে কিছুই লিখে না, এবং নূতনই হউক কি ইঙ্গরেজী কাগজ হইতেই গৃহীত হউক, এই সকল কাগজের অধিকাংশ বিষয়ই পাঠকদিগের উন্নতি ও অভিজ্ঞতা বর্দ্ধিত করে।"

সংগঠিত করা, প্রজাদিগকে আভ্যন্তরীণ শাসনে লিপ্ত করা এবং তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে আত্মশাসন-ক্ষম করা, যখন আমাদের উদ্দেশ্য, তখন মুদ্রণ-স্বাধীনতা রাখা কেবল প্রজাসাধারণের উপকারের জন্য নয়, ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ উপকারের জন্য কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়া সেই বহুমূল্য সহায়তা এবং জাতীয় উন্নতির সেই প্রধান উপায় নষ্ট করিয়াছেন।

'উপস্থিত আইন ইঙ্গরেজী সংবাদপত্র সমুদয়কে বাদ দিয়া কেবল দেশীয় সংবাদপত্র সমুদয়কেই নিগড়বদ্ধ করিয়াছে। ইহা ব্রিটীষ শাসন-প্রণালী যে, পক্ষপাতে দূষিত, এই পুরাতন জনপ্রবাদই পরিপোষণ করিবে। দেশীয় সংবাদ পত্রের সম্বন্ধে যদি কোন আইন বিধিবদ্ধ করা উচিত বোধ হয়, তাহা হইলে ইঙ্গরেজী সংবাদপত্রের সম্বন্ধেও তদ্রূপ কোন আইন করা বিধেয়। ব্যবস্থাপক সভার কাগজপত্রে যেমন দেখা যায়, তাহাতে দেশীয় সংবাদপত্র সকল লোকের নিকট আদরণীয় নহে। কেহ তাহাদের কথায় বিশ্বাস করে না। কিন্তু ইঙ্গরেজী সংবাদপত্র সকল সকলের শ্রদ্ধাস্পদ ও বিশ্বাসযোগ্য। এই সকল কাগজে যদি কোন বিষয়ে অসাবধানতা দেখা যায়, তাহা হইলে দ্বিগুণ বিপদ সম্ভবে। সমুদয় দেশীয় সংবাদপত্র অপেক্ষা এক খানি ইঙ্গরেজী সংবাদ পত্রের অসাবধান লেখা ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যে ও সীমাস্থিত প্রদেশে অধিকতর সন্দেহ, অধিকতর বিদ্বেষ ও অধিকতর ঘৃণা জন্মাইতে পারে, এবং ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের অধিকতর হানি ঘটাইতে পারে।"

১৮৭৩ অব্দের বিজ্ঞাপনী—"দেশীয় সংবাদপত্রের প্রণালী সুন্দর ও রাজভক্তি-প্রদর্শক। প্রথম অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে, অবশেষে ইহা একটি সুন্দর সাধারণ মত বলিয় গণ্য হইবে।

"১৮৭? সালে প্রকাশিত স্যার জন ষ্ট্রাচির সঙ্কলিত ১৮৭৩-৭৪ সালের রিপোর্টে সংবাদপত্রের অনুকূলে আমরা এই প্রমাণ পাইতেছি:—'সাধারণতঃ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দেশীয় সংবাদপত্র দ্বারা অনেক মঙ্গল সাধিত হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট আপনাদের ত্রুটী এবং দোষ সংশোধন করিতে কিরূপ সাহায্য পাইয়াছেন, তাহা স্যার উইলিয়ম মুইর স্বীকার করিয়াছেন। ইহাও অবশ্য বলিতে হইবে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দেশীয় সংবাদপত্র সকল প্রায় সর্ব্বদাই রাজভক্তি ও সুনীতির পক্ষপাতী।, ইহার

মুইর স্বীয় মন্তব্যলিপির এইরূপ উপসংহার করিয়াছেনঃ—“এক্ষণে ইঙ্গরেজী শিক্ষার বহুল প্রচার হইতেছে। স্বল্পবিদ্য লোকে দেশীয় সংবাদপত্র পড়িয়া যে অনিষ্ট ঘটাইতে পারে, যাহারা অল্প মাত্রায় ইঙ্গরেজী লেখা পড়া শিখিয়াছে, তাহারা ইংরেজী সংবাদপত্র পড়িয়াও সেই অনিষ্টের উৎপত্তি করিতে পারে। তবে কি অনিষ্টের নিবারণ জন্য ইঙ্গরেজী শিক্ষার মূলোচ্ছেদন করা বিধেয়? ইহার উত্তরস্থলে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের এরূপ নীতি নয়। তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কেমন করিয়া এক হাতে আলোক বিস্তার করিবেন এবং আর এক হাতে সেই আলোকের পথ রুদ্ধ করিবেন? যখন রাজনৈতিক আন্দোলনে ইঙ্গরেজী ভাষা কথিত ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন দেশীয় সংবাদপত্রের সম্বন্ধে যাহা করা আবশ্যক, ইঙ্গরেজী সংবাদপত্রের সম্বন্ধেও তাহা করা আবশ্যক।

‘মধ্যএশিয়ার শাসন-সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণের সহিত যে যে ব্যক্তির কথোপকথন হয়, তাঁহাদের এক জনের মুখে শুনা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে মুদ্রণ-স্বাধীনতা থাকাতে মধ্যএশিয়ার শাসন-সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ নিতান্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট যে, প্রজাদিগকে বিশ্বাস করেন, স্বাধীন সংবাদপত্রই তাহার একটী প্রধান প্রমাণ। যে সময়ে অপক্ষপাত নীতি ও প্রজাসাধারণের উপর বিশ্বাস, আমাদের গৌরবের কারণ হইতেছিল, সেই সময়ে আমরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া আমাদের রাজনীতি ঘৃণিত ও প্রজাসাধারণের উপর বিশ্বাস নষ্ট করিলাম, এবং যে সময়ে আমরা মধ্যএশিয়ায় মহারাণীর প্রাধান্য রক্ষার জন্য আমাদের নিজের

পর বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত বাৎসরিক বিজ্ঞাপনী সকলেও সংবাদপত্রের সম্বন্ধে এইরূপ অনুকূল মতের বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দেশীয় সংবাদপত্র হইতে আমি ৬ বৎসর অনেক সাহায্য পাইয়াছি। নূতন প্রণালী অনুসারে এই সাহায্যের আশা বৃথা। বদ্ধমুখ সংবাদপত্র কখনও পরিষ্কার রূপে সত্য কথা কহিতে পারে না।,,

সৈন্যের সহিত দেশীয় সৈন্য এক শ্রেণীতে নিবেশিত করিয়া রাজ-ভক্তির সম্মান করিতেছিলাম, সেই সময়ে আমরা মধ্যএসিয়ার যথেচ্ছা-চারিতা বিকাশ করিলাম।"

কর্ণেল ইয়ুলের মতের সারাংশ।

কর্ণেল ইয়ুল মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থার অনুমোদন করেন নাই। তিনি কহিয়াছেন, কোন বিখ্যাত পণ্ডিত যেমন সামরিক আইনকে সেনা-পতির ইচ্ছা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; উপস্থিত আইনও সেইরূপ গবর্ণরজেনেরলের ইচ্ছা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইবে। গবর্ণরজেনেরল নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই আইনের উদ্দেশ্য শাস্তি প্রদান নহে, অনিষ্টের নিবারণ। গবর্ণরজেনেরলের এই মতানুসারে ফাঁসি দেওয়াও কেবল শাস্তি প্রদানের জন্য হয়. অনিষ্টের নিবারণ জন্য নয়।

গবর্ণরজেনেরল অন্য স্থানে বলিয়াছেন, এই আইন মুদ্রণ-স্বাধী-নতায় হাত দেয় নাই, স্বাধীনতার অপব্যবহারের উপর হাত দিয়াছে। কর্ণেল ইয়ুল এই সম্বন্ধে বলেন; গবর্ণরজেনেরলের এই কথা লইয়া ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল বক্তৃতা হয়, তাহা কেবল অস্ট্রিয়ার নিয়ো-জিত লম্বার্ডির শাসন-কর্ত্তার মুখেই শোভা পায়।

ইয়ুল কহেন, রাজ্য শাসনের রীতি দ্বিবিধ, ওলন্দাজী ও ইঙ্গরেজী। ওলন্দাজী রীতিতে প্রজাদের কোন রূপ উন্নতি হয় না। কেবল অর্থোপার্জ্জনই এই রীতির প্রধান লক্ষ্য। এক্ষণে আর ওলন্দাজী রীতি-অনুসারে ভারতবর্ষ শাসন করিবার সময় নাই। ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজী রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আবার ওলন্দাজী রীতি আনিয়া ফেলিলে বিপদ হইতে পারে।

ডিউক অব্ বাকিংহাম্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দেশীয় সংবাদপত্র-সমূহের একমাত্র দোষ এই যে, তৎসমুদয় আমাদের ত্রুটী কঠোর ভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকে। ইয়ুল ইহাতে কহিয়াছেন যে, "আমরা দেশীয়

সংবাদপত্র হইতেই আমাদের ত্রুটী জানিতে পারি। সুতরাং তাহাদের মুখ বন্ধ করা কর্ত্তব্য নয়। অধিকন্তু ব্যবস্থাপক-সভায় তর্ক বিতর্ক সময়ে এইরূপ নির্দ্দেশ করা হয় যে, পার্লিয়ামেণ্ট ও স্বাধীন সংবাদপত্র পরস্পর ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ; ইহাদের উভয়ই একমূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই নির্দ্দেশ যদি সমীচীন হয়, তাহা হইলে আমি বলিতেছি, যে দেশে পার্লিয়ামেণ্ট নাই, সেই দেশের স্বাধীন সংবাদপত্র দ্বারাই পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্য হইয়া থাকে।”

সংবাদপত্রের কোন্ লেখা দূষণীয় এবং কোন্ লেখা নির্দ্দোষ কর্ণেল ইয়ুলের মতে তাহার মীমাংসা স্বাধীন বিচারক দ্বারা হওয়া উচিত। মাজিষ্ট্রেটের হস্তে ইহার মীমাংসার ভার রাখা বিধেয় নহে। যদি বর্ত্তমান আইন এই মীমাংসায় সমর্থ না হয়, তাহা হইলে সেই আইনের সংশোধন আবশ্যক। অন্য একটী নূতন আইনের আবশ্যকতা নাই।

যে ভাবে এই আইনটী বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা নিরতিশয় বিস্ময়জনক। এরূপ গুরুতর বিষয়ে কেহ কোন রূপ আন্দোলন উপস্থিত করেন নাই। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল যে নীতি চলিয়া আসিয়াছে, সকলেই একমত হইয়া অসঙ্কুচিত ভাবে তাহার উচ্ছেদ করিয়াছেন।

আইনের প্রস্তাব-কর্ত্তা উল্লেখ করিয়াছেন, এই আইন বিধিবদ্ধ করিতে যদি বিলম্ব করা হয়, তাহা হইলে গুরুতর আন্দোলনে কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত হইতে পারে, গবর্ণরজেনেরল স্বীয় মন্তব্য-লিপিতে প্রকাশ করিয়াছেন তুরুস্কে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে বাজারে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া গিয়াছে। অধিকন্তু গবর্ণরজেনেরল ষ্টেট সেক্রেটারীকে এই ভাবে টেলিগ্রাম করেন, তাঁহাকে ১৮ই মার্চ্চ সিমলায় যাইতে হইবে, এই সময়ের মধ্যে আইনটী বিধিবদ্ধ না করিলে এবৎসর আর উহা বিধিবদ্ধ হইবে না। সুতরাং ব্যবস্থাপক-সভার এক অধিবেশনেই এই আইন জারি করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহার পর এবিষয়ের সমস্ত বিবরণ জানান যাইবে।

এই কয়েকটী কারণে বর্ত্তমান আইন বিধিবদ্ধ হয়। কর্ণেল ইয়ুল এস্থলে ক্‌হিয়াছেন, যে বিষয় আজ দুই বৎসরকাল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীনে আছে, সেই গুরুতর বিষয়ে ষ্টেট্ সেক্রেটরীকে ধীর ভাবে বিচার করিতে না দেওয়া যুক্তি-সিদ্ধ হয় নাই।

ইয়ুল স্থলান্তরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "যখন গবর্ণর জেনেরলের মন্তব্যলিপি ও অন্যান্য কাগজপত্র প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তখন হবহাউসের যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য-লিপি পাঠান হয় নাই, যেহেতু উহা উপস্থিত আইনের বিরুদ্ধে লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে লোকের মনে এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণের হৃদয়ের উত্তেজনা নিবারণ কবিতে প্রয়াস পান নাই, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের নিবারণ করিতেই প্রয়াস পাইয়াছেন।"

ডিউক অব বাকিংহামের মতের সারাংশ।

গবর্ণরজেনরল দেশীয় সংবাদপত্র সমূহের শাসন-সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, ডিউক অব্ বাকিংহাম তাহাতে এই মত প্রকাশ করিয়াছেনঃ—

"গবর্ণরজেনেরলের মন্তব্য-লিপির সঙ্গে অনেকগুলি দেশীয় সংবাদপত্রের অংশ-বিশেষের অনুবাদ আছে। এই সকল অংশের কোন কোনটী বিদ্বেষভাবের পরিচয় দিয়াছে এবং অবশিষ্ট গুলি অসন্তোষকর সত্য কঠোর ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে।"

'কিছু টাকা জামানতি রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছে। আমার মতে অধিক টাকার জামিন না লইলে কোনও ফলের সম্ভাবনা নাই। আবার যদি জামানতি টাকা অধিক অর্থাৎ অন্যূন ২০০০৲ পর্য্যন্ত হয়, তাহা হইলে উহা নিরীহ সংবাদপত্র-ব্যবসায়ীদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুতর হইবে। পক্ষান্তরে উহা দ্বারা বিপদ নিবারণও হইবে না। যেহেতু যাহারা সংবাদপত্রে নিয়ত বিদ্বেষ ভাব প্রদর্শন করে, তাহারা আপনাদের অভ্যস্ত রীতি অনুসারে এই টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবে।

'বাজেয়াপ্ত করা প্রভৃতি শাস্তি প্রদানেরস মস্ত ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে, স্বাধীন বিচারকের হাতে দেওয়া-হয় নাই। সুতরাং এক মাজিষ্ট্রেট যাহা করিবেন, সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে তাহাতেই অবনত-মস্তক হইতে হইবে। এরূপ নিয়ম আমার সম্পূর্ণ অননুমোদিত।

'উপস্থিত আইনে প্রকাশ পাইতেছে যে, ইঙ্গরেজী সংবাদত্রে যে সমস্ত বিদ্বেষ-জনক কথা থাকিবে, তাহার জন্য সেই সংবাদপত্র দণ্ডার্হ হইবে না, কিন্তু সেই কথা দেশীয় সংবাদপত্রে বাহির হইলে দেশীয় সংবাদপত্র দণ্ডার্হ হইবে। ইঙ্গরেজী ও দেশীয় সংবাদপত্রের সম্বন্ধে এইরূপ ইতরবিশেষ করিলে ইহাই বুঝা যাইবে যে, আমরা ইঙ্গরেজদের জন্য এক আইন করি,এবং দেশীয়দের জন্য আর এক আইন করিয়া থাকি। আমার বিবেচনায় এরূপ পার্থক্য রাজনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং ইহা অব্যাহত রাখিয়া কার্য্য করা অসাধ্য।

'গবর্ণর জেনেরলের মন্তব্যে এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে যে, কেবল দেশীয় সংবাদপত্র সমূহই গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্বেষভাব দেখায়। যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে লর্ড ক্যানিং কিছুকালের জন্য মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থা প্রচার করিয়া, প্রথমেই ইঙ্গরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন কেন ?

'দেশীয় সংবাদপত্র ভারতবর্ষীয় প্রজা-সাধারণের মনের ভাব প্রকাশ করে। এই প্রজা সাধারণের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের উপর বিদ্বেষ বা শত্রুতা জন্মিলে দেশীয় সংবাদপত্র সমূহেই তাহার চিহ্ন লক্ষিত হইবে। যে সকল সংবাদপত্র এইরূপ বিদ্বেষ ভাবের উত্তেজনা করে, প্রচলিত দণ্ডবিধি দ্বারাই তাহাদের শাস্তি বিধান হইতে পারে।

ব্যক্তিবিশেষকে অন্যায়রূপে আক্রমণ করা অথবা তাহার অযথা নিন্দা করা আমার বিবেচনায় মুদ্রণ-স্বাধীনতার অপব্যবহারের অপকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ইহাতে কেবল উৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালীর মূল নষ্ট হয় না, সমাজেরও ক্ষতি হইয়া থাকে। প্রচলিত আইন দ্বারা এই অনিষ্টের

নিবারণ হইতে পারে। আমার বিশ্বাস, অনিষ্টের নিবারণ জন্য এই উপায় অবলম্বনই প্রকৃত রাজনীতি।”

স্যার আর্থার হব্‌হাউসের মতের সারাংশ।

স্যার আর্থর হবহাউস মুদ্রণ-শাসনী ব্যবস্থার অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার মতে কোন সংবাদপত্রে বিদ্রোহ-সূচক ভাব লক্ষিত হইলে তাহা দণ্ড-বিধির শাসনাধীন করাই কর্ত্তব্য। উপস্থিত সময় ইহার জন্য স্বতন্ত্র একটী আইন করিবার প্রয়োজন নাই।

হব্‌হাউস কহেন, মাজিষ্ট্রেটের হস্তে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিলে ভারতবর্ষীয়গণ নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠে। প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেট্‌ বিল প্রভৃতি ইহার প্রমাণ।

হব্‌হাউসের মতে ইঙ্গরেজী ও দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে কোন রূপ ইতরবিশেষ রাখা উচিত নয়। ইঙ্গরেজী সংবাদপত্রের সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেনঃ—“সূক্ষ্মরূপে দেখিলে জানা যাইবে যে, আমাদের দেশীয়গণ গবর্ণমেণ্টের অধিক নিন্দা করিয়া থাকেন। ষ্টেট্‌স্‌মানের যে সমস্ত প্রবন্ধ ‘ফ্রেণ্ড অব্‌ ইণ্ডিয়ায়’ প্রকাশিত হয়, তাহার কোন কোনটীতে আমাদের প্রতি এই দোষ দেওয়া হইয়াছে যে, আমরা ইঙ্গ্‌লণ্ডের জন্য ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিতেছি; এই অপরাধের জন্য আমরা ঈশ্বর ও মানবের কোপানলে পতিত হইব। সংবাদপত্রে কোন লেখাতে যদি বিদ্রোহ-বুদ্ধির উত্তেজনা হয়, তাহা হইলে এরূপ লেখাতে নিশ্চয়ই তাহা হইবে। এক্ষণে যদি ইঙ্গরেজী সংবাদপত্রের এইরূপ দূষণীয় প্রবন্ধ দণ্ডার্হ না হয়, তাহা হইলে সেই প্রবন্ধ কোন দেশীয় সংবাদপত্রে অনুবাদিত হইলে কেন দণ্ডার্হ হইবে? এক ভাষায় কোন ভাব ব্যক্ত করিলে বিপদের আশঙ্কা আছে, অন্য ভাষায় ব্যক্ত করিলে সেই আশঙ্কা নাই, আমার বিশ্বাস এরূপ নয়।

‘ভারতবর্ষীয় ভাষার সংবাদপত্র যে সকল বিষয় কঠোর ভাবে আন্দোলন করে, তাহা এই,—ইউরোপীয়দিগের অধিক অধিকার;

এক অপরাধে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় অপরাধিদিগের দণ্ডের প্রভেদ; ইউরোপীয়দিগের ঔদ্ধত্য ও অসদ্ব্যবহার; ইঙ্গরেজী সংবাদপত্রের বিদ্বেষ ভাব; এবং দেশীয় রাজ-দরবারে রেসিডেণ্টদিগের অনিষ্ট-জনক অসদ্ব্যবহার।

‘উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইঙ্গরেজ ও এতদ্দেশীয়তে কোন প্রভেদ নাই। কেননা উভয়েরই উদ্দেশ্য, ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট এদেশে থাকে। বিশেষতঃ এতদ্দেশের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বাঙ্গালীই অধিক পরিমাণে ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব কামনা করে। ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র যে, বিদ্রোহের উত্তেজনা করে, সংবাদপত্রের লেখাতে যে, লোকের মন বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন হয়, তাহার প্রমাণ কোথায়? ইঙ্গরেজী সংবাদপত্রের উগ্র ও বিরক্তিকর লেখা যদি বিদ্বেষের প্রমাণ না হয়, তবে তাহার ছন্দানুবর্ত্তী দেশীয় ভাষার লেখা প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হইবে কেন?

‘ইঙ্গরেজী ও দেশীয় সংবাদপত্রে জাতিগত পার্থক্য আছে। গবর্ণমেণ্ট স্বজাতির প্রতি অধিক অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। ইঙ্গরেজী পত্রকে ইহা লিখিতে হয় না; যেহেতু তাহারা জেতৃজাতীয়। কিন্তু সচরাচর যে প্রকার হইয়া থাকে, তাহা না করিয়া তুল্য ভাবে ও ন্যায়ানুসারে উভয় জাতির বিচার করিতে উদ্যত হও, দেখিতে পাইবে, কি ঘটনা উপস্থিত হয়। এই ঘটনার সহিত তুলনা করিলে দেশীয় সংবাদপত্রের চীৎকার মৃদু ধ্বনি বলিয়া বোধ হইবে। মিয়ার্স সাহেবের মোকদ্দমায় কোন ইঙ্গরেজী সংবাদপত্র অথবা ইঙ্গরেজ বক্তা বলিয়াছিলেন, মিয়ার্সকে দণ্ড দিলে কলিকাতার সমুদয় ইউরোপীয় সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। যশোহরের মাজিষ্ট্রেট, বিচারপতি ফিয়ার ও রিচার্ড কৌচকে সমুদয় ইঙ্গরেজীপত্র কেমন ভয়ানক ভাবে তিরস্কার করিয়াছিল, এবং হাইকোর্টের আদেশ বহাল রাখিলে গবর্ণমেণ্টের কত বিপদ ঘটিবে বলিয়াইবা ভয় দেখাইয়াছিল। ফুলার সাহেবের মোকদ্দমার মন্তব্য-লিপিতেও সেই প্রচণ্ড ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা একটু মৃদু ভাবে বিকাশ পায়। ইঙ্গরেজী সংবাদপত্রের মতে

আমদের কার্য্য আইন-বহির্ভূত, দৌরাত্ম্য-জনক এবং নির্ব্বুদ্ধিতা-প্রকাশক; ইহা কেবল অজ্ঞতা ও কুঅভিসন্ধিতে উৎপন্ন হয়।

'আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, সংবাদপত্র অনেক পরিমাণে প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। এদেশীয় সংবাদপত্র ইউরোপীয় ও দেশীয়দিগের তুল্য অপরাধে পৃথক দণ্ডের উল্লেখ করে; ফুলার-মোকদ্দমার মন্তব্য-লিপিতে আমরা ঠিক তাহাই বলিয়াছি। তাহারা ইউরোপীয়দিগকে উচ্চপদ প্রদানের জন্য বিরক্ত হয়; এই ক্রটী দূর করিতে পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক বিশেষ আইন প্রণীত হইয়াছে; এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য উপায়-চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহারা ইউরোপীয়দিগের ঔদ্ধত্য ও অসদ্ব্যবহারের উল্লেখ করে; অনেক সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় একথা স্বীকার করেন। রেসিডেণ্টগণ অসদ্ব্যবহার করেন, অথবা টাকা কর্জ্জ করেন কি না, তাহা আমি জানি না। যাহা হউক, আমার বিবেচনায় এই সকল বিষয়ে সাধারণকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে দেওয়া উচিত।

'জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন ও মুদ্রণ-স্বাধীনতা দান করিলে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াই থাকে। আমরা উদার ও বিচক্ষণ নীতি অনুসারে এই দুই বিষয়েই উৎসাহ দিয়া আসিয়াছি। কিছু বাড়াবাড়ি দেখিলেই আমাদের ভীত হওয়া উচিত নহে। অধিক শিক্ষা পাইলে যদি ক্ষমতা না বাড়ে, তাহা হইলে লোকে অসন্তুষ্ট হইয়াই থাকে, এবং সেই ক্ষমতা পাইবার জন্য অধীর হয়। এইরূপ বাগ্-যন্ত্রের স্বাধীনতা থাকিলে লোকে না বুঝিয়া দুই একটী কথা বলিয়া ফেলে। ভারতবর্ষের প্রজা-সাধারণকে সুশিক্ষিত ও সজীব করিলে আমাদের যে উপকার হয়, এই সকল ভাব তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। আমরা উহা এড়াইতে পারিব না। আমার বিশ্বাস, দৃঢ়, সাধু ও অটল ভাবে রাজ্য শাসন করিলে সংবাদপত্রের অন্যায় ও অকারণ দোষারোপে কিছুমাত্র ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না।'